





উৎসর্গ।

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বড়দাদা মহাশয়ের

শ্রীচরণ কমলে—

---

প্রকাশক,  
শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ চৌধুরী।  
২০ নং মে-কেয়ার,  
বালিগঞ্জ।

কলিকাতা  
উইক্লী নোট্‌স প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্,  
• ৩ নং হেষ্টিংস্ স্ট্রীট  
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।  
১৩৩০ সাল।  
মূল্য ২ টাকা।



## বিজ্ঞাপন ।

এই গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্তিত আকারে পাঠকদের হস্তে সমর্পিত হইল। ইহার গুণদোষ পরীক্ষা তাঁহাদের উপরেই ন্যস্ত। এই অগ্নিপৰীক্ষায় আমি যদি উদ্ধীর্ণ হইতে পারি, তাহা হইলেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব। যেমন কবি কালিদাস বলিয়াছেন, লেখক যতই শিক্ষিত হউক না কেন, সূধীগণের সম্ভ্রাম হওয়া পর্যাস্ত আপনার প্রতি অবিশ্বাস তাহার মন হইতে কখনই অপনীত হইবার নাহ—

অপরিতোষাদ্বিছুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্ ।

বলবদপি শিক্ষিতগণামানু্যপ্রত্যয়ক্ষেতঃ ।

শকুন্তলা ।

কমলালয় ।  
বালিগঞ্জ, কলিকাতা ।  
১৫-৭-১৯২২ ।

শ্রীমতেন্দ্র নাথ ঠাকুর ।







সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর



# বৌদ্ধধর্ম ।

---

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিবিবসং  
গহকারকং গবেসন্তো দুঃখাজাতি পুনপ্পুনং  
গহকারক ! দিট্‌ঠোহসি, পুন গেহং নকাহসি  
সব্বাতে ফাস্সকা ভগ্গা গহকূটং বিসংখিতং ।  
বিসম্ভারগতং চিত্তং তণ্‌হানং থয়মজ্জ্বাগা ।

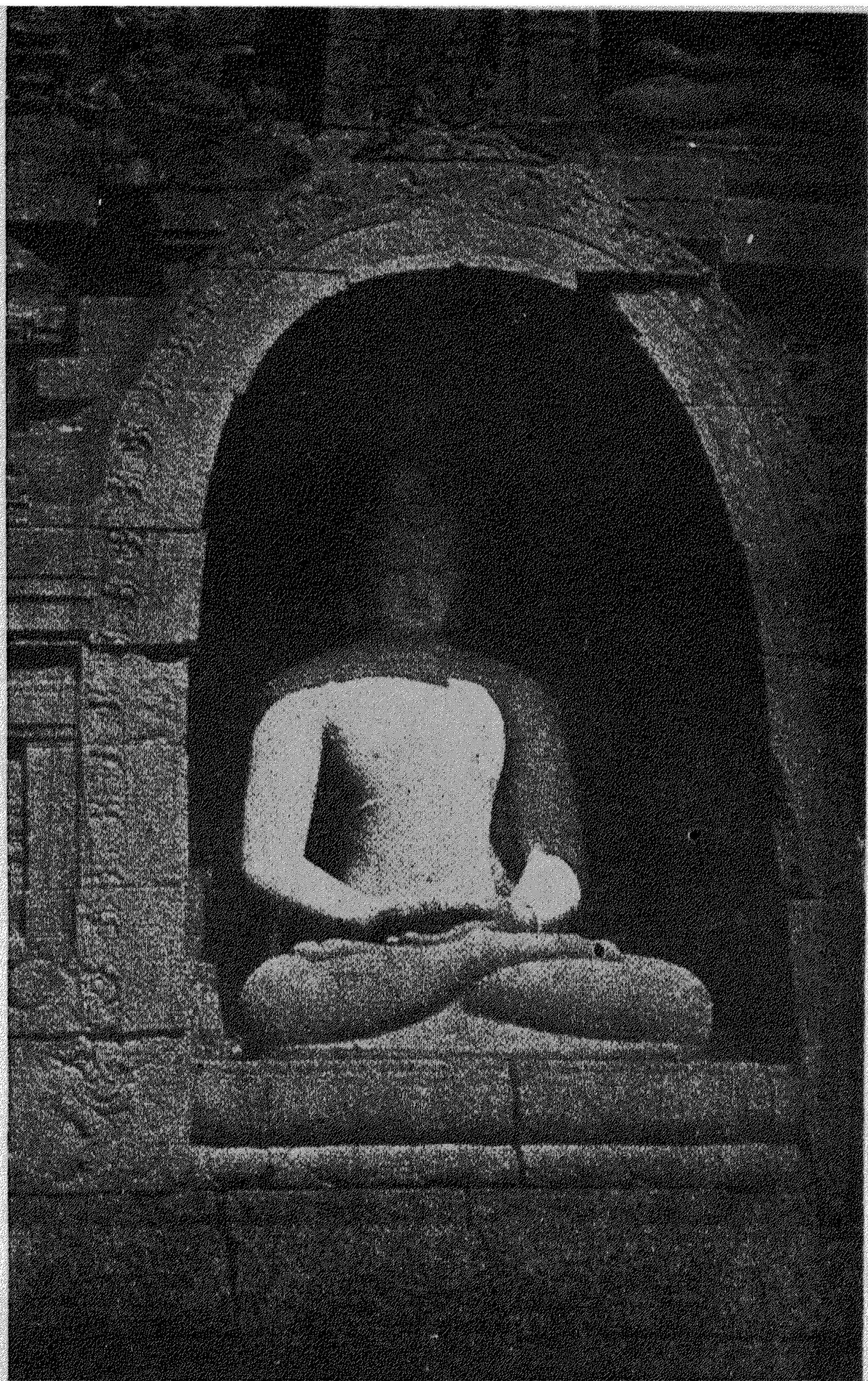
•

জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি পাইনি সন্ধান  
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ,  
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,  
হে গৃহকারক ! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর ।  
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহ-ভিত্তিচয়,  
সংস্কার-বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয় ।

---







বুদ্ধদেব ।







# সূচী ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ ।

পৃষ্ঠা ।

১ । বৌদ্ধধর্ম কি ?

২ । বুদ্ধচরিত ।—

মহাভিনিষ্ক্রমণ—বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি—ধর্মপ্রচার—  
শেষকথা—পরিনির্বাণ—

১—৫০

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

বৌদ্ধ ইতিহাসের কালনির্ণয় ।—

বুদ্ধের পরিনির্বাণ—অশোকের অনুশাসন  
লিপি—গ্রীকদূত মেগাস্থিনীস্—চীন পরিব্রাজক  
ফাহিয়ান, হুয়েন সাং—কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য—

৫১—৫৬

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

বৌদ্ধধর্মের মত ও বিশ্বাস ।—

দর্শন—নীতি—দশানুশাসন—কর্মফল—জাতক-  
মালা—আত্মতত্ত্ব—পঞ্চস্কন্ধ—পরক্যাল ও নির্বাণ—

৫৭—৯৮

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

পৃষ্ঠা ।

বৌদ্ধ সঙ্ঘ ।—

মধ্যপথ—সঙ্ঘের গঠন—দলাদলি—বৈদিক  
ক্রিয়াকাণ্ড—পৌরোহিত্য—জাতিবিচার— ৯৯—১২২

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

সঙ্ঘের নিয়মাবলী ।—

প্রবেশ—আহার—পরিচ্ছদ—বাসস্থান—  
দারিদ্র্যব্রত—পূজা—ভাবনা, ধ্যান, সমাধি—তীর্থ-  
দর্শন—প্রায়শ্চিত্ত বিধান—পঞ্চায়ৎ—শিলাদিত্যের  
দানোৎসব—ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ—বৌদ্ধ-গৃহস্থ— ১২৩—১৭৯

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ।—

ত্রিপিটক—ধর্মপদ—মিলিন্দ-প্রশ্ন—দ্বীপ-  
বংশ—মহাবংশ—ললিত বিস্তর—পালিভাষা—  
আর্যভাষা লতিকা— ১৮০—২০৬

## সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ও বিকৃতি ।—

মহাযান হীনযান—ত্রাঙ্কণ্য ও বৌদ্ধধর্ম—সেন্ট্  
জোসাকৎ—বুদ্ধতত্ত্ব, হীনযান মত—বুদ্ধতত্ত্ব, মহাযান  
মত—বোধিসত্ত্ব—খ্যানীবুদ্ধ—আদিবুদ্ধ—তান্ত্রিকতা  
—তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম—প্রার্থনা-চক্র—ওঁ মণিপদমে  
হঁ—লামাধর্ম—লামার সহিত শরৎচন্দ্র দাসের  
সাক্ষাৎকার—স্বর্গ নরক—দার্শনিক শাখা—সম্প্র-  
দায় ভেদ—

২০৭—২৩৮

## অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

বৌদ্ধধর্মের উন্নতি, অবনতি ও পতন ।—

শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ মণ্ডলী—ধর্মপ্রচার—  
জীবক—

২৩৯—২৬৫

## নবম পরিচ্ছেদ ।

অশোক—সিংহলে বৌদ্ধধর্ম—রাজা কনিষ্ক—  
চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম—মার্কিন দেশে বৌদ্ধধর্ম—  
উপসংহার—বৌদ্ধধর্ম লোপের কারণ নির্ণয়—  
বৌদ্ধধর্মের প্রভাব—জগন্নাথ ক্ষেত্র—

২৬৬—৩০৭

# পরিশিষ্ট ।

পৃষ্ঠা ।

১ । ধনিয়া সূত্র ।—

গোপাল ধনিয়া ও বুদ্ধদেবের কথোপকথন—

২ । তেবিজ্জ সূত্র ।—

ব্রাহ্মণ যুবকের প্রতি বুদ্ধদেবের উপদেশ—

ব্রহ্মলাভের উপায়—ব্রহ্ম, ব্রহ্মা ।—

৩০৮—৩২৭



## যুখপত্র ।

( ১ )

“বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সজ্জং শরণং গচ্ছামি”—পুরাকালে ভারতবর্ষে কোটি কোটি লোক এই মন্ত্র উচ্চারণ করে’ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হত । কিন্তু এই ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম কালক্রমে ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় । অর্ধ শতাব্দী পূর্বে বুদ্ধ কে, তাঁর ধর্ম্ম কি, বৌদ্ধ-সজ্জই বা কি, এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের মধ্যে কোটিতে একজনও দিতে পারতেন না ; কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের এই ত্রিরত্নের স্মৃতি পর্য্যন্ত এদেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । “বৌদ্ধ” এই শব্দটি অবশ্য আমাদের ভাষায় ছিল, এবং বৌদ্ধ অর্থে আমরা বুঝতুম—একটি পাষণ্ড ধর্ম্ম মত ; কিন্তু উক্ত পাষণ্ড মতটি যে কি, সে সম্বন্ধে আমাদের মনে কোনরূপ ধারণা ছিল না ।

সংস্কৃত সাহিত্যে অবশ্য বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ আছে ; কিন্তু তার কোন বিবরণ নেই । আছে শুধু সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্রে এ মতের খণ্ডন । সে খণ্ডন হচ্ছে বৌদ্ধ-দর্শনের । কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, বাঙলা দেশে যারা দর্শন-শাস্ত্রের চর্চা করতেন, সেই পণ্ডিতমণ্ডলীও বৌদ্ধ-দর্শন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতেন । সর্ব্বাস্তিবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ, অথবা ভাষান্তরে সৌতান্ট্রিক মত, বৈভাষিক মত, যোগাচার মত ও

মাধ্যমিক মতগুলি যে কি, সে সম্বন্ধে অজ্ঞাবধি এ দেশের পণ্ডিত সমাজের কোনও স্পর্শ ধারণা নেই। শঙ্করাচার্য্য প্রচুর বৌদ্ধ বলে' বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধ। কিন্তু যিনি হিন্দুধর্মের পুনর্জন্ম-দাতা এবং ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদকর্তা বলে জগৎ-বিখ্যাত, তাঁর বিরুদ্ধে এ অপবাদ যে কেন দেওয়া হয়েছে, তা জানতে হলে, শঙ্করের জ্ঞানবাদের সঙ্গে বৌদ্ধদের বিজ্ঞানবাদের সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ, তা জানা চাই; যা এ দেশের অধিকাংশ দর্শন-শাস্ত্রীরা জানেন না। এখন এই বৌদ্ধ-দর্শন বুদ্ধের দর্শন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং বৌদ্ধ-দর্শনের বিচার থেকে বুদ্ধদেবের, তাঁর প্রচারিত ধর্মের এবং তাঁর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের কোনই পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই দুদিন আগে আমরা বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসঙ্ঘ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম।

আর আজ আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে প্রধানত বৌদ্ধযুগের ইতিহাসই বুঝি—আর হিন্দু কলাবিজ্ঞা বলতে বৌদ্ধ-কলাবিজ্ঞাই বুঝি। আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করেছি যে, ভারতবর্ষের বৌদ্ধযুগ হচ্ছে এ দেশের সত্যতার সর্বাপেক্ষা গৌরব-মণ্ডিত যুগ। তাই বৌদ্ধ-সম্রাট অশোক এবং তাঁর অমর কীর্তির দিকে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তার পর আমরা সম্প্রতি এও আবিষ্কার করেছি যে, আমাদের পূর্ব পুরুষরা সব বৌদ্ধ ছিলেন; বাঙলা বৌদ্ধধর্মের একটি অগ্রগণ্য

ধর্মক্ষেত্র ছিল। বাঙলা ভাষার আদি পদাবলী নাকি বৌদ্ধ-দৌহা ও আদি ধর্মগ্রন্থ “শৃঙ্গপুরাণ”। এ যুগের পণ্ডিতদের মতে বাঙলা ভাষার ধর্মশব্দের অর্থ বৌদ্ধধর্ম, এবং ধর্মপূজা মানে বুদ্ধপূজা। বাঙলা ভাষায় যে সকল ধর্মমঙ্গল আছে, সে সবই নাকি বৌদ্ধ-গ্রন্থ। এবং ময়নামতীর উপাখ্যান বৌদ্ধ-উপাখ্যান। কবিকঙ্কন চণ্ডীতেও বুদ্ধের স্তব আছে। তারপর আমাদের অধিকাংশ দেবদেবীও নাকি ছদ্মবেশী বৌদ্ধ দেব দেবী। “তারা” যে বৌদ্ধ-দেবতা—তা ত নিঃসন্দেহ। শীতলাও শুনতে পাই তাই! চণ্ডীদাসের ইস্টদেবতা বাশুলিও নাকি বৌদ্ধ-দেবতা, আর বাঙলার পাষণের পিণ্ডাকার গ্রাম্য-মঙ্গলচণ্ডী ছিল আদিত্তে বৌদ্ধস্তুপ। এ অনুমান সম্ভবত সত্য, কেননা, এ সকল দেবদেবী যে ইস্ত্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণের স্বগোত্র নয়—অর্থাৎ বৈদিক নয়, তাঁদের বংশধরও যে নয়, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

বাঙালী সভ্যতার বুনিয়াদ যে বৌদ্ধ, হিন্দু স্তরের দু-হাত নীচেই যে বাঙলার বৌদ্ধ-স্তর পাওয়া যায়, আজকের দিনে তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। বাঙলা দেশের মাটি দু-হাত খুঁড়লেই আমরা অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি ও বৌদ্ধ-মন্দিরের ভগ্নাবশেষের স্বাক্ষর পাই। সুতরাং যদি কেউ বলে—মুসলমান যুগে বাঙালী হিন্দু হয়েছে, তাহলে সে কথা সত্যের খুব কাছ ঘেঁসে যাবে। যে বৌদ্ধধর্মের নাম পর্যাস্ত এদেশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই ধর্মই যে আজকাল আমাদের সকল গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে, তারই স্মরণ-চিহ্ন উদ্ধার করাই যে আমাদের পাণ্ডিত্যের

প্রধান কৰ্ম হয়ে উঠেছে, এটি সত্য সত্যই একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। এ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটল কি করে ?—ঘটেছে এই কারণে যে, ভারতবর্ষের এই প্রাচীন ধর্মের সঙ্গে বর্তমান ইউরোপ, ভারতবাসীর নূতন করে আবার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমিতে তার মৃত্যু হলেও, আজও তা কোটি কোটি এশিয়াবাসীর ধর্ম। শ্যাম, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশের লোকে আজও বুদ্ধদেবের পূজা করে, ও নিজেদের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলেই পরিচয় দেয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা হয় সমুদ্রের, নয় হিমালয়ের অপর পারের দেশসকল থেকেই এ দেশের এই লুপ্ত ধর্মের শাস্ত্র-গ্রন্থসকল উদ্ধার করেছেন, এবং তাঁদের বই পড়েই আমরা বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধসম্রাজ্য সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান লাভ করেছি।

সিংহলেই সর্বপ্রথম বৌদ্ধশাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়, আর পণ্ডিত-সমাজে অধ্যাবধি এই সিংহলী বৌদ্ধধর্মই স্বয়ং বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম বলেই গ্রাহ্য।

সিংহলের মঠে মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত বৌদ্ধধর্মের আদি গ্রন্থগুলি সিংহলী ভাষায় নয়, পালি ভাষায় লিখিত। এই পালি ভাষা যে ভারতবর্ষের একটি প্রাকৃত—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই; যদিচ সেটি যে ভারতবর্ষের কোন্



প্রদেশের ভাষা, উত্তরাপথের না দক্ষিণাপথের, বঙ্গের না কলিঙ্গের, মগধের না মালবের—সে বিষয়ে পণ্ডিতের দল আতও একমত হতে পারেন নি।

সিংহলে যে শুধু বৌদ্ধধর্ম রক্ষিত হয়েছে, তাই নয়—উক্ত ধর্মের জন্ম-বৃক্ষান্ত ও তার সিংহলে প্রচারের ইতিহাসও রক্ষিত হয়েছে। সুতরাং এই সিংহলী শাস্ত্রই হচ্ছে এ যুগের ইউরোপীয় বৌদ্ধ-শাস্ত্রীদের মতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, অতএব সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য দলিল। এবং এই শাস্ত্র থেকে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা যে সকল তথ্য উদ্ধার করেছেন—বর্তমান যুগে তাই আমরা বৌদ্ধমত বলে জানি ও মানি।

পালি গ্রন্থসকল আবিষ্কৃত হবার কিছুকাল পরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত খানকতক বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থের সন্ধান নেপালে পাওয়া গেল। সে সব গ্রন্থ আলোচনা করে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ দেখতে পেলেন যে, সিংহলী বৌদ্ধধর্ম ও নেপালী বৌদ্ধধর্ম এক নয়। এবং বহুকাল পূর্বে বৌদ্ধমত যে দু-ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, তার প্রমাণ এই দুটি ধারার দুটি বিভিন্ন নাম থেকেই পাওয়া যায়। যে বৌদ্ধমত সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে প্রচলিত, তা “হীনযান” নামে প্রসিদ্ধ; আর যে বৌদ্ধমত নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া ও মঙ্গোলিয়াতে প্রচলিত, তার নাম হচ্ছে “মহাযান”। ইউরোপীয় পণ্ডিতরা এই দুটি বিভিন্ন মতের নাম দিয়েছেন—Northern

School ও Southern School । অনেক দিন ধরে এক দলের ইউরোপীয় পণ্ডিতরা “হীনযান”কেই মূল বৌদ্ধমত ও মহাযানকে তার অপভ্রংশ বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন । ফলে আর একদল পণ্ডিত তার বিরুদ্ধ মত প্রচার করেন । অবশেষে এই পণ্ডিতের তর্কের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে,—উভয় দলই এখন এ বিষয়ে একমত যে, হীনযান ও মহাযান, এ দুয়ের ভিতর বৌদ্ধধর্মের একই মূলতত্ত্ব পাওয়া যায় । এবং অশ্রাণ্য বিষয়ে উভয় মতের এতটা সাদৃশ্য আছে যে, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, একই আদি-মত থেকে এই দুটি বিভিন্ন শাখা বিনির্গত হয়েছে ।

“মহাযান” মূল বৌদ্ধমতই হোক, কিম্বা তার অপভ্রংশই হোক, সে মত আমাদের কাছে মোটেই উপেক্ষণীয় হতে পারে না । প্রথমতঃ এ শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত । তারপর চীনে এবং তিব্বতী ভাষায় লিখিত অধিকাংশ বৌদ্ধ-গ্রন্থই সংস্কৃত-গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র । উপরন্তু মহাযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বর্তমান হিন্দুধর্মের যোগ এত ঘনিষ্ঠ যে, প্রচলিত হিন্দুধর্মকে উক্ত ধর্মের রূপান্তর বললেও অত্যাুক্তি হয় না । সুতরাং মহাযান বৌদ্ধধর্মের সম্যক জ্ঞান লাভ করলে, আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের ও জাতীয়-মনের ইতিহাসের জ্ঞানও লাভ করব । আর তখন হয়ত আবিষ্কার করব যে, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের মৃত্যু হয় নি । ও ধর্মমত উপনিষদ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বর্তমান হিন্দুধর্মে পরিণত হয়েছে—জ্ঞানের ধর্ম কালক্রমে তন্ত্রের ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে । দুঃখের বিষয় এই যে, এই •

মহাযান-মতের সঙ্গেই অষ্টাবধি আমাদের পরিচয় শুধু নাম মাত্র।

আমরা অতীতের যে ইতিহাস উদ্ধার করবার জন্য আজ উঠে পড়ে লেগেছি, সে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস নয়, বৌদ্ধযুগের ইতিহাস—এক কথায় জাতীয় জীবনের বাহ্য ইতিহাস। আমরা যে কাজ হাতে নিয়েছি তার নাম archaeology এবং antiquarianism। বৌদ্ধধর্ম এদেশে তার কি নিদর্শন, কি স্মৃতি-চিহ্ন বেখে গিয়েছে, আমরা নিচ্ছি তারই সন্ধান এবং করছি তারই অনুসন্ধান। আমাদের দৃষ্টি বৌদ্ধযুগের স্তূপ, স্তম্ভ, মন্দির ও মূর্তির উপরেই আনন্দ হয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষের বিশাল ক্ষেত্রে মৃত-বৌদ্ধধর্মের বিক্ষিপ্ত অস্থিসকলই আমরা সংগ্রহ করতে সচেষ্ট হয়েছি। আর নানা স্থান থেকে সংগৃহীত অস্থিসকল একত্র জুড়ে যদি আমরা কিছু খাড়া করতে পারি, তাহলে তা হবে শুধু বৌদ্ধধর্মের কঙ্কালমাত্র। বৌদ্ধধর্মের আত্মার সন্ধান না নিয়ে তার মৃতদেহের সন্ধান নেওয়ার, বলা বাহুল্য আমাদের আত্মজ্ঞান এক চুলও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে না। আর বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ষাঁর পরিচয় নেই, তিনি তার দেহের সাক্ষাৎ লাভ করলেও তার রূপের পরিচয় লাভ করবেন না। বৌদ্ধ-স্তূপ তাঁর কাছে একটা পাবাণ স্তূপমাত্রই রয়ে যাবে। ইট কাঠ পাথরে গড়া মূর্তিসকল মুক। তারা নিজের পরিচয় নিজ-মুখে দিতে পারে না, তাদের পরিচয় লাভ করতে হয়, তাবায় বা লিপিবদ্ধ আছে তারই কাছে। সুতরাং বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম ও

তাঁর সজ্জের অস্তিত্বের উপর নৌকযুগের বাহ্য ইতিহাসও গড়া  
 যাবে না। আমরা বৌদ্ধ স্তূপ স্তম্ভ মন্দির মূর্তির মুখে যে কথা  
 সব দিই, সে কথা আমরা বৌদ্ধশাস্ত্র থেকেই সংগ্ৰহ করি।  
 Sanchi এবং Barhut স্তূপের ভিত্তিগাত্রে সংলগ্ন মূর্তিগুলির  
 অর্থ ও সার্থকতা তাঁর পক্ষে জানা অসম্ভব, যাঁর বৌদ্ধ জাতকের  
 সঙ্গে সম্যক পরিচয় নেই। অতএব বৌদ্ধশাস্ত্রেরও কিঞ্চিৎ  
 পরিচয় লাভ করা আমাদের নব-ঐতিহাসিকদের পক্ষে  
 অত্যাবশ্যক।

পূজ্যপাদ ৬সত্যোজ্জ নাথ ঠাকুর মহাশয়ের “বৌদ্ধধর্ম”  
 ব্যতীত বাঙলা ভাষায় আর একখানিও এমন বই নেই, যাঁর  
 থেকে বুদ্ধের জীবন-চরিত, তাঁর প্রবর্তিত ধর্মচক্র এবং তাঁর  
 প্রতিষ্ঠিত সজ্জের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজি  
 ভাষায় ইউরোপীয় পণ্ডিতদের লিখিত বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে  
 যে সকল গ্রন্থ আছে, সেই সকল গ্রন্থের আলোচনা  
 করেই পূজ্যপাদ ঠাকুর মহাশয় এ গ্রন্থ রচনা করেছেন।  
 এই “বৌদ্ধধর্মের” দ্বিতীয় সংস্করণ প্রস্তুত করতে তিনি  
 ৮০ বৎসর বয়সে এক বৎসর কাল বেরূপ অগাধ পরিশ্রম  
 করেছেন, তা বথার্থই অপূর্ব। দিনের পর দিন, সকাল  
 আটটা থেকে রাত আটটা ন’টা পর্য্যন্ত তাঁকে আমি  
 এ বিষয়ে একাগ্রচিত্তে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতে দেখেছি।  
 শেষটা বখন তাঁর শরীর নিভাস্ত দুর্বল হয়ে পড়ে, তখনও  
 তিনি হর আরাম চৌকীতে নর বিহানায় শুয়ে শুয়ে সমস্ত দিন

এই বইয়ের প্রকৃৎ সংশোধন করতেন। এ সংশোধন শুধু ছাপার তুলের সংশোধন নয়। বৌদ্ধধর্ম সঙ্ঘকে নতুন নতুন বই পড়ে, তাঁর লেখার ঘেখানে সংশোধন বা পরিবর্তন করা আবশ্যিক মনে করতেন, তা করতে তিনি একদিনও বিরত হন নি। তাঁর মৃত্যুর চারদিন আগেও তাঁকে আমি “বৌদ্ধধর্মের” প্রকৃৎ সংশোধন করতে দেখেছি।

এই একাগ্র এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, আমার বিশ্বাস, এই গ্রন্থখানি যতদূর সম্ভব নির্ভুল হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম ও তার ইতিহাস সম্বন্ধে পণ্ডিতে পণ্ডিতে এতদূর মতভেদ আছে, এ বিষয়ে এত সন্দেহের এত তর্কের অবসর আছে যে, এ বিষয়ে এমন কথা কেউ বলতে পারবেন না, যা চূড়ান্ত বলে পণ্ডিতসমাজে গ্রাহ্য হবে। যে ধর্মের ইতিহাস আট দশ ভাষার বিপুল সাহিত্য থেকে সংগ্রহ করতে হয়, বলাবাহুল্য সে ইতিহাসের খুঁটিনাটি নিয়ে বিচার তর্ক বহুকাল চলবে, এবং সম্ভবত তা কোন কালেই শেষ হবে না। তবে সে ইতিহাসের একটা ধরবার হৌবার মত চেহারা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আর এ গ্রন্থে পাঠক সেই চেহারারই সাক্ষাৎ পাবেন।

আমি পূর্বে যা বলেছি তাই থেকে পাঠক অনুমান করতে পারেন যে—

আমি শুধু পণ্ডিত-সমাজের নয়, দেশশুদ্ধ লোকের পক্ষে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের জ্ঞান লাভ করা নিতান্ত আবশ্যিক মনে

করি। আর আমার বিশ্বাস সাধারণ পাঠক-সমাজ এই গ্রন্থ থেকে অনায়াসে বিনাক্রমে সে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।

এ গ্রন্থ সাধু ভাষায় লিখিত। কিন্তু এ সাধু-ভাষা আজকের দিনে যাকে সাধুভাষা বলে—সে ভাষা নয়। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যরা যে ভাষার সৃষ্টি করেন, এ সেই ভাষা। এ ভাষা যেমন সরল তেমনি প্রাঞ্জল, যেমন শুদ্ধ তেমনি ভদ্র। এতে সমাস নেই, সন্ধি নেই, সংস্কৃত শব্দের অতি-প্রয়োগ নেই, অপ-প্রয়োগ নেই, দুর্ভ-প্রয়োগ নেই, কষ্ট-প্রয়োগ নেই, বাগাড়ম্বর নেই, বৃথা অলঙ্কার নেই! ফলে এ ভাষা যেমন সুখপাঠ্য, তেমনি সহজবোধ্য।

আমার শেষ বক্তব্য এই যে, বুদ্ধ-চরিতের তুল্য চমৎকার ও সুন্দর গল্প পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। জনৈক জার্মান পাণ্ডিত Oldenburg বিদ্রূপ করে বলেছেন যে, বুদ্ধচরিত ইতিহাস নয়, কাব্য। এ কথা সত্য। কিন্তু এ কাব্যের মূল্য যে তথাকথিত ইতিহাসের চাইতে শতগুণে বেশী, তা বোঝবার ক্ষমতা জার্মান পাণ্ডিত্যের দেহে নেই। এ কাব্য মানুষের চির-আনন্দের সামগ্রী। অতীতে যে বুদ্ধ-চরিত কোটি কোটি মানবকে মুগ্ধ করেছে, ভবিষ্যতেও তা কোটি কোটি মানবকে মুগ্ধ করবে। এ কাব্যের মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করবার জন্ম পাণ্ডিত্যের কোনও প্রয়োজন নেই, যার হৃদয় আছে ও মন আছে, এর সৌন্দর্য্য তার হৃদয় মনকে স্পর্শ করবেই করবে। যে দেশে ভগবান বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর যে দেশের লোকে তাঁর জীবন-চরিত অবলম্বন করে বুদ্ধচরিত নামক মহাকাব্য রচনা করেছে—সে দেশও ধন্য,

( ২১ )

সে জাতিও ধন্য । আমি আশা করি, বাঙলার আবাল-বৃদ্ধ-  
বনিতা এই গ্রন্থ থেকে বুদ্ধ-চরিতের পরিচয় লাভ করে'  
নিজেদের ধন্য মনে করবেন ।

১৯৬২৩

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ।







# বৌদ্ধধর্ম ।

## প্রথম পরিচ্ছেদ ।

### ১। বৌদ্ধধর্ম কি ?

ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাস মানবধর্মের ভিত্তিভূমি বলিয়া সামান্যতঃ নির্দেশ করা হইয়া থাকে ।) ব্রাহ্মণ্য, খৃষ্টান, মুসলমান ধর্ম, পৃথিবীর প্রধান এই তিন ধর্ম ঐ ভিত্তির উপরে স্থাপিত । কিন্তু ইহা কি আশ্চর্য্য নহে যে, অনাত্মবাদী নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম দেশ বিদেশে প্রবেশ লাভ করিয়া, কোটি কোটি মনুষ্যের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে? আমি এই প্রসঙ্গে বুদ্ধোপদিষ্ট আদিম বৌদ্ধধর্মের কথা বলিতেছি, পরবর্তী কালে সে ধর্মের আকার প্রকার পরিবর্তনের কথা স্বতন্ত্র । বুদ্ধদেব যে প্রকাশ্যভাবে আপনাকে নাস্তিক বলিয়া পরিচয় দিতেন তাহা নহে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে তাঁহার ধর্মকে নিরীশ্বর বলা অসঙ্গত বোধ হয় না ।) বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত স্বরূপ লক্ষণ জানিতে হইলে, “ধর্মচক্রের” উপর স্বভাবতঃ আমাদের দৃষ্টি পড়ে, কেমনা বুদ্ধত্ব লাভের পরস্বর্গেই প্রকাশ্য সভায় তাহা বুদ্ধের প্রথম উপদেশ । ইহাতে ঈশ্বর-বিষয়ক প্রশ্নের কোন নিদর্শন নাই । ইহা হইতে আমরা যে বিষয়ে শিক্ষা লাভ করি, তাহার নাম দুঃখতত্ত্ব ।

দুঃখ কি ?

দুঃখের উৎপত্তি কোথায় ?

দুঃখের নিবৃত্তি কিসে হয় ?

বুদ্ধদেব এই দুঃখ-নিবৃত্তির যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আষ্টাঙ্গিক আর্ধ্যমার্গ । সে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ, আপনার যত্ন চেষ্টায় সে পথে চলিতে হইবে । সেই পথের যাত্রী বাঁহারা, তাঁহাদের নির্ভর-দণ্ড অসুপ্রভাব; ইহাতে দেব-প্রসাদের কোন কথা নাই । এই ধর্মচক্রে হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পরিনির্বাণ পর্য্যন্ত বুদ্ধদেব সহস্র সহস্র উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি সূত্র-পিটক প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু দু' একটি বাদে তাহাতে ত্র্যক্ষবিষয়ক কোন উপদেশ নাই; তাঁহার সজ্জের নিয়মাবলীর মধ্যেও দেবার্চনার কোন বিধিব্যবস্থা দেখা যায় না । একটীমাত্র সূত্র আছে, তাহাতে ত্র্যক্ষবিষয়ক আলোচনা লক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা হইতে তাঁহাকে ত্র্যক্ষবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করা ঠিক হয় না; সে সূত্রটির নাম “তেবিজ্জ সূত্র” ( ত্রিবিজ্জা সূত্র ) ।\* এই সূত্রে আমরা দেখিতে পাই, প্রচলিত ত্র্যক্ষবিজ্জা সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মনোভাব কিরূপ ছিল, কি ভাবে তিনি আর্ধ্যদেবতা ত্র্যক্ষে বৌদ্ধ-মন্দিরে স্থান দান করিতে প্রস্তুত ছিলেন । এই সূত্র মনোনিবেশ পূর্বক পাঠ করিলে দেখা যায় যে, তিনি ত্র্যক্ষে নিমিত্তমাত্র করিয়া, প্রকৃতপক্ষে নীতিশাস্ত্রের উপদেশ

\* পরিশিষ্টে এই সূত্র সমালোচিত হইয়াছে ।

দিত্তেছেন। ব্রহ্মজ্ঞান গৌণ, নীতিশাস্ত্র উহার মুখ্য বিষয় বলিয়া মনে হয়। তিনি জ্ঞান ধ্যান কিস্তি ভক্তিব্যোগে ব্রহ্ম পৌছিতে যত্নশীল নহেন। ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার নিজের কি ধারণা, ঐ সূত্রে তাহার স্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই। উহাতে যে দুই ব্রাহ্মণ যুবক বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা ব্রহ্মসম্মিলনের প্রয়াসী, কিন্তু ব্রহ্মের সহবাস লাভ বৌদ্ধধর্মের মোক্ষপদ নহে। সে ধর্মের চরম লক্ষ্য যে নির্বাণমুক্তি,—ব্রহ্মতে বিলীন হওয়া তাহার অর্থ নহে। নির্বাণ কি?—নির্বাণ শব্দের অনেক প্রকার ব্যাখ্যা দেখা যায়, কিন্তু মোটামুটি ধরিয়া লওয়া বাইতে পারে যে, নির্বাণের অর্থ দুঃখনির্বাণ, অর্থাৎ দুঃখক্লেশের ঐকান্তিক পরিসমাপ্তি। এ অবস্থায় জীব দুঃখবন্ত্রণা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করে। বৌদ্ধধর্মের সার উপদেশ এই যে, প্রত্যেক মনুষ্য নিজ কর্মগুণে, নিজ পুণ্যবলে, আত্ম-প্রভাবে, স্বার্থ বিসর্জনে, সত্যোপার্জনে, প্রেম দয়া মৈত্রী বন্ধনে, ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলনিদান নির্বাণরূপ মুক্তি লাভের অধিকারী। যে পথে চলিতে হইবে, তাহা বুদ্ধপ্রদর্শিত আষ্টাঙ্গিক ধর্মপথ। গম্যস্থান নির্বাণমুক্তি—সারথী আত্মশক্তি। অতএব দেখা বাইতেছে যে, বৌদ্ধধর্ম নৈতিক জীবনের মধ্যেই বিচরণ করে—তাহার শেষ সীমা দুঃখনির্বাণ। সুতরাং তেবিজ্ঞ সূত্র হইতে আলোচ্য বিষয়ের কোন অকাট্য সীমাংসা করা সম্ভব নহে।

জীবাত্মা, পরমাত্মা, সৃষ্টি, পরকাল সম্বন্ধে যে-সকল প্রহেলিকা মানব-হৃদয়ে স্বভাবতঃ উদয় হয়, বৌদ্ধ-ধর্মশাস্ত্রে তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। তাহার

কারণ এই যে, বুদ্ধদেব এই সকল গুঢ় প্রশ্নের উত্তরদানে বিমুখ ছিলেন । তাঁহার কোন শিষ্য তাঁহার নিকট এই সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, তিনি কোন উচ্চবাচ্য করিতেন না, মৌনভাব ধারণ করিতেন ।

মালুঙখ্যপুত্র যখন এই সকল তত্ত্বের জ্ঞানলাভ মানসে বুদ্ধের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করেন, তখন বুদ্ধদেব কহিলেন :—

—হে মালুঙখ্যপুত্র, আমি কি কখন তোমাকে বলিয়াছি, তুমি আমার শিষ্য হও, আমি তোমাকে বলিয়া দিব জগৎ সৃষ্ট কি অনাদি, দেহ আত্মা এক কি বিভিন্ন, মৃত্যুর পর তথাগত নবজীবন ধারণ করিবেন কি না ? এই সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া আমি উপদেশ দিব, আমি কি এমন কোন বচন দিয়াছি ?

—না, গুরুদেব, তাহা দেন নাই ।

—হে মালুঙখ্যপুত্র, তুমি আহত হইয়া চিকিৎসার জন্য আমার নিকট আসিয়াছ, তোমার আরোগ্যের উপযোগী যে ঔষধ, তাহা আমি বলিয়া দিয়াছি । আমি স্নান প্রকাশ করি নাই, তাহা অপ্রকাশিত থাকুক ; যাহা ব্যক্ত করিয়াছি, তাহা প্রকাশিত হউক ।”

মিলিন্দ-প্রশ্নে যবনরাজ মিলিন্দ এবং বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী নাগসেনের যে কথোপকথন আছে, তাহাতে বুদ্ধদেবের এই মৌম ভাবের কারণ সমালোচিত হইয়াছে ।

নাগসেন কহিতেছেন, “এমন সকল প্রশ্ন আছে, নিরুত্তর থাকাই বাহার উত্তর;—সে সকল প্রশ্ন কি?—না,

জগৎ নিত্য কি অনিত্য ?

দেহ আত্মা এক, কি পৃথক ?

মরণোত্তর তথাগত জীবিত থাকিবেন কি না ?

এই সমস্ত প্রহেলিকা এক পাশে ফেলিয়া রাখা কর্তব্য । ইহাদের কোন উত্তর নাই—উত্তরে কোন লাভ নাই । এই সকল প্রশ্নের উত্তর দানে তথাগত বাক্যব্যয় করিতে উৎসুক ছিলেন না ।”

এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি জন্মে যে, বুদ্ধোপদিষ্ট ধর্ম ঈশ্বরবাদ নহে—উহা নীতিমূলক ধর্ম । উপনিষদ যেমন জ্ঞানপ্রধান, আদিম বৌদ্ধধর্ম সেইরূপ নীতিপ্রধান ধর্ম । তবে কি এই নীতিশাস্ত্র বুদ্ধদেবের স্বকপোলকল্পিত কোন অভূতপূর্ব নূতন ব্যাপার ? তাহাই বা কি করিয়া বলিব ? ইহাতে এমন কিছু নূতন তত্ত্ব লক্ষিত হয় না, যাহা বুদ্ধযুগের পূর্বে অবিদিত ছিল । বৌদ্ধশাস্ত্রবিশারদ Rhys Davids যথার্থই বলিয়াছেন—

“বুদ্ধযুগের বহুপূর্বে যে ব্রাহ্মণগণ তত্ত্ববিদ্যা ও নীতিশাস্ত্রের গূঢ়তম প্রশ্নের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়াছিলেন ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন, এবং তাহার মধ্যে কোন না কোন সম্প্রদায়ে যে গৌতমের তত্ত্ব সম্বন্ধীয় অধিকাংশ মত ইতিপূর্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । তাঁহার বিশেষত্ব এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তিনি কঠোর তপশ্চরণ, যজ্ঞানুষ্ঠান অথবা তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা নীতিশিক্ষাকে উচ্চতর আসন দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পূর্ববর্তী আচার্য্যদের উপদিষ্ট

মতগুলিকে বিধিবদ্ধ আকার দান করিয়াছিলেন । অশ্বাশ্ব ধর্মবীরের ম্য তিনিও তাঁহার সমসাময়িক প্রভাবের বশবর্তী ছিেন, এবং তাঁহার দার্শনিক মতবাদ যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার নিজস্ব, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই ।”

এক্কে জিজ্ঞাস্য এই, তবে ব্রাহ্মণ সমাজে বুদ্ধের এত প্রতিপত্তি কেন হইল ? তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা স্বধর্ম—বৈদিকধর্ম ত্যাগ করিয়া কি কারণে এই নৈতিক ধর্ম গ্রহণ করিতে বুদ্ধ-পতাকার তলে দলে দলে ছুটিয়া আসিলেন ? তাহার অনেকগুলি কারণ আছে—কয়েকটি এই স্থলে সূচিত হইতেছে ।

প্রথম, তাঁহার ধর্মের সার্বভৌম উদারতা ।

‘অকোথেন জিনে কোধঃ

অসাধুং সাধুনা জিনে—

এই যাঁহার গুরুমন্ত্র, যাঁহার নীতিশৈলোপরি ‘বিশ্বমৈত্রী’ প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার ধর্ম যে জগন্মাশ্ব হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?

দ্বিতীয়, যে আকারে ও যে প্রকারে সেই ধর্ম প্রচারিত হয়, তাহাও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । সহজ প্রাঞ্জল গ্রাম্য ভাষা, সময়োপযোগী প্রসঙ্গ, সুবৌদ্ধিক, সুবোধ্য, প্রাণস্পর্শী, মধুর ভাষণ,—এই সব ছিল তাঁহার সম্বল । তিনি বাহা বলিতেন লোকেরা তাহা আগ্রহপূর্বক শ্রবণ করিত, এবং অন্তরের সহিত গ্রহণ করিত ।

তৃতীয়, যাহা প্রচার-কার্যে বিশিষ্টরূপে ফলদায়ী হইত, তাহা বুদ্ধদেবের নিজস্ব, তাঁহার ধর্মপ্রাণতা ও অকৃত্রিম সরলতা, তাঁহার চরিত্রমাধুরী, ও মনোমুগ্ধকারী মোহিনী শক্তি । বুদ্ধদেব আপনাতে কোন ঐন্দ্রজালিক দৈবশক্তি আরোপ করেন নাই, অথচ তাঁহার কি এক অপূর্ব আকর্ষণী শক্তি ছিল, যাহার গুণে এই ধর্ম এত অল্পকালমধ্যে এত অধিকসংখ্যক লোকের মধ্যে প্রচারিত হইল !

শাক্যমুনি যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, সে সময়ে বৈদিক পূজার্চনা কতকগুলি জটিল কর্মকাণ্ডে পরিণত হইয়াছে । এই ক্রিয়াকাণ্ডের উপদেশদাতা যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত, তাহাদের আধিপত্যের সীমা নাই । তিনি ব্রাহ্মণাধিপত্যের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণদিগের জাত্যভিমানের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মণদিগের বাহ্যডম্বরময় ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে, তাঁহার সরল ধর্ম—সত্য, অহিংসা, ক্রমা, দয়া, মৈত্রী, আত্মসংযম, সদাচার,—প্রচলিত সহজ গ্রাম্য ভাষায়, জাতিকুলনির্বিশেষে আপামরসাধারণ সকল শ্রেণীর মধ্যেই প্রচারকার্যে জীবন উৎসর্গ করিলেন ।\* তিনি এইরূপ উৎসাহ এবং ওজস্বিতা সহকারে প্রায় ৪৫ বৎসর কাল অযোধ্যা, মিথিলা, বারাণসী, এই সমস্ত রাজ্যে অবস্থিতিপূর্বক স্বমতানুযায়ী

---

\* আমি একথা বলিতে চাহি না যে, বুদ্ধদেব প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মণাধর্মের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি যে ভাবে ধর্মপ্রচার করিতেন, তাহাতে কলে তাহাই দাঁড়াইয়াছিল সন্দেহ নাই । শুধু ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান কেন, তিনি সকল প্রকার অভিমানেরই বিরোধী ছিলেন ।

ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত থাকেন, এবং অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমের পর দেহত্যাগ করেন । তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার হস্তের বীজ লইয়া দেশদেশান্তরে ছড়াইবার জন্য বাহির হইলেন ।

তাঁহার জীবনরহস্যে, তাঁহার হৃদয়স্পর্শী মধুর ভাষণে যে কি অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাহা তাঁহার জীবনবৃত্তে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায় ।

---



## ২। বুদ্ধ-চরিত।

বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্ত “ললিত বিস্তর”, অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিত, মহাবঙ্গ, জাতক ও অগ্গাণ্ড পালী, সিংহলী, তিব্বতী গ্রন্থে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত দেখা যায়। এই সকল গ্রন্থে বুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা বিবৃত আছে, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে বুদ্ধজীবনী বিষয়ে যেমন কতক কতক ঐক্য আছে, তেমনি বিস্তর পার্থক্যও লক্ষিত হয়। ঐক্যমূলক ঘটনাগুলি প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই সকল গ্রন্থ পরস্পর তুলনা করিয়া বাছিয়া বাছিয়া বুদ্ধের ধারাবাহিক জীবন-কাহিনী যতদূর সংগ্রহ করা সম্ভব, যুরোপীয় পণ্ডিতগণ অতীব যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তাহা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত বিবরণী তাঁহাদের রচিত চিত্রেরই প্রতিলিপি। \*

বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়কালে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের নূনাধিক পাঁচ-শত বৎসর পূর্বে নেপাল ও উত্তরবিহারের মধ্যস্থিত খণ্ড খণ্ড রাজ্যের মধ্যে শাক্যজাতির নিবাসভূমি একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, তাহার রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন, তাহার রাজধানী কপিলবস্তু

---

\* ৬মতীশ চন্দ্র বিদ্যাবূষণ প্রণীত “বুদ্ধদেব” হইতে আমি এই ভাগ সকলনে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। বুল সংস্কৃত ও পালী লোকসকল ইহাতে উচ্চ, এই এক মহৎ লাভ।

রোহিণী নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত। নদীর এক পারে শাক্যজাতি, অপর পারে কোলজাতি—এই দুই জাতি একই বংশবৃক্ষের শাখা প্রশাখা বলিয়া অনুমিত হয়। কোল-রাজ্যের রাজধানী দেবদহ। এই দুই জাতি নদীর জল লইয়া ও অন্যান্য কারণে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে ছিন্নভিন্ন হইয়া থাকিত, কিন্তু বুদ্ধযুগের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই, তাহারা অপেক্ষাকৃত শান্তি সম্ভাবে বাস করিতেছে—বিবাহসূত্রে তাহাদের আদান প্রদান চলিতেছে। অশ্বন, যিনি দেবদহের রাজকুমার, তাঁহার কন্যাদ্বয় মায়া ও মহাপ্রজাপতি রাজা শুক্কোদনের দুই রাণী। মায়া দেবীর গর্ভে, কপিলবস্তু ও দেবদহের মধ্যবর্তী লুম্বিনী উচ্চানে\* বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। শুক্কোদন পুত্রের নাম সিদ্ধার্থ রাখিলেন, গৌতম-গোত্রজ বলিয়া সিদ্ধার্থের অপর নাম গৌতম,—প্রথম বয়সে এই তাঁর ডাকনাম ছিল। তা ছাড়া বোধিসত্ত্ব, তথাগত, শাক্যমুনি প্রভৃতি তাঁর উপাধির অস্তিত্ব নাই। কালক্রমে আর সব নাম এক “বুদ্ধ” নামে বিলীন হইয়া গেল।

গৌতমের জন্মগ্রহণের সাতদিন পরে মায়া দেবীর মৃত্যু হয়। তখন কুমারের প্রতিপালনের ভার উহার বিমাতা মহাপ্রজাপতির প্রতি অর্পিত হয়।

কিয়ৎকাল পরে সিদ্ধার্থ গুরুগৃহে প্রেরিত হইলেন, সেখানে তিনি বিশ্বামিত্র নামক উপাধ্যায়ের নিকট চতুঃষষ্ঠি কলা ও অনেকপ্রকার লিপি-রচনা শিক্ষা করেন। সিদ্ধার্থের পাঠ

---

\* বুদ্ধের জন্মভূমি লুম্বিনীর স্থিতি-চিহ্নস্বরূপ অশোক-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সমাপন হইলে, তিনি কপিলবস্তু নগরে প্রত্যাহীত হন । কতিপয় বৎসর পরে পুত্রের যৌবনকাল উপস্থিত দেখিয়া, শুদ্ধোদন উঁহার বিবাহের আয়োজন করেন । তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে যত রূপবতী, গুণবতী বিবাহ-যোগ্যা কন্যা আছে, সিদ্ধার্থের বিবাহ-সভায় তাহাদের নিমন্ত্রণ করা হোক ।

তদনুসারে অনেকানেক মনোরমা সুরূপা কন্যকা সিদ্ধার্থের হস্তপ্রার্থী হইয়া আসে । তাহাদের একটা মেলা বসিয়া গেল । কথা হইল তাহাদের রূপ গুণ অনুসারে কুমার প্রত্যেক কুমারীকে এক একটা পুরস্কার দিবেন । সুন্দরীগণ কুমারের সমক্ষে আনীত হইলে তাঁহারা ক্ষণকালের তরে দাঁড়াইয়া একে একে চলিয়া গেলেন, কুমারও প্রত্যেকের হাতে হাতে তাঁহার যোগ্যতানুসারে এক একটি পুরস্কার দিলেন, কিন্তু কাহারও মুখপানে সতৃষ্ণভাবে চাহিয়া দেখিলেন না । সব শেষে সুপ্রবুদ্ধের কোল-কন্যা যশোধরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন । আসিয়া কুমারের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার জন্য কি কোন পুরস্কার নাই” ? কুমার একটু হাসিয়া আপন কণ্ঠ হইতে একটি মুক্তার মালা খুলিয়া যশোধরার গলায় পরাইয়া দিলেন । অমনি সভাস্থ সকলে জয়জয়কার করিয়া উঠিল । প্রাচীন প্রথা অনুসারে বরকে অশ্ব চালনা ও অপরাপর ব্যায়াম ক্রীড়ার পরীক্ষা দিতে হইল ; সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যশোধরাকে পত্নীরূপে বরণ করেন, পরে কন্যাকর্তার সম্মতিক্রমে রাজা মহা সমারোহে এই উদ্ভাহক্রিয়া সম্পন্ন

করিলেন। এই বিবাহের কালে সিদ্ধার্থের রাহুল নামে একটি পুত্র জন্মে।

সিদ্ধার্থ দয়ার অবতার হইয়া জন্মিয়াছিলেন। আহারের জন্যই হউক আর আমোদের জন্যই হউক, পশুमारण কর্ণে তাঁহার ঘোরতর বিতৃষ্ণা ছিল। দেবদত্ত প্রভৃতি তাঁহার বাল্য সহচরগণ যুগয়ার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল, কিন্তু জীবহত্যা নিতান্ত নৃশংসের কার্য বলিয়া তিনি তাহাতে কিছুতেই যোগ দিতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি গল্প আছে যে, একদা সিদ্ধার্থ তাঁহার আত্মীয় দেবদত্তের সহিত গ্রামান্তরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। দেবদত্ত ধনুর্বাণ-হস্তে শিকারের সন্ধানে ফিরিতেছিলেন; তিনি একটি উড়ন্ত হংসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক বাণ ছুঁড়িলেন আর পাখীটি বাণবিন্দু হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। অমনি সিদ্ধার্থ দৌড়িয়া গিয়া পাখীটাকে ধরিয়া সেই বাণ আস্তে আস্তে টানিয়া বাহির করিলেন, নানা গাছ গাছালী ঔষধ প্রয়োগে রক্তস্রাব বন্ধ হইল। দেবদত্ত বলিলেন “আমি পাখী মারিয়াছি, ওটা আমারই প্রাণ্য”—সিদ্ধার্থ তাহাতে সন্মত নহেন। এই পাখী লইয়া দুজনার কাড়াকাড়ি হইতে লাগিল, শেষে ধার্য হইল এই বিবাদ ভঙ্গনের জন্য এক বিচার-সভা ডাকা হোক। বিচারকর্তারা কেহ সিদ্ধার্থের পক্ষে কেহ দেবদত্তের পক্ষে মত দিলেন, পরিশেষে প্রধান বিচারপতি বলিলেন যে, “পাখীটিকে যিনি প্রাণদান করিয়াছেন উহা তাঁহারই প্রাণ্য, যিনি বধ করিতে উচ্চত তিনি কখনই তাহা পাইবার যোগ্য নন, অতএব উহা সিদ্ধার্থকে দেওয়া

বিধেয়”। সর্বসম্মতিক্রমে বিচারে তাহাই নিষ্পত্তি হইল। সিদ্ধার্থ অনেক ঔষধপত্র দিয়া, অনেক যত্নে পাখীটির প্রাণ রক্ষা করিলেন, তাহার ক্ষতস্থান প্রকৃতিস্থ হইল, পরে সে গাহিতে গাহিতে মুক্ত আকাশে উড়িয়া গেল।

বাল্যকাল হইতেই সিদ্ধার্থের বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার মনে সেই বৈরাগ্যের ভাব বলবত্তর হইয়া উঠে। শুদ্ধোদন পুত্রের এইরূপ মনোভাব জানিতে পারিয়া তার প্রতিবিধান কল্পে অনেক চেষ্টা করিলেন। তাঁহার জন্ম বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দিলেন—নৃত্য গীত বাদ্য প্রমোদ হিল্লোলে তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। যুবরাজ কিছুতেই পোষ মানেন না। এই সময় এমন কতকগুলি ঘটনা সংঘটিত হইল, বাহাতে তাঁহার মনের আগুন যেন ইন্ধনযোগে দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল।

একদিন যুবরাজ নগরের বাহিরে উদ্যানভূমি দর্শন করিবার মানস করেন। শুদ্ধোদন নগরে ঘোষণা করিয়া দিলেন, যুবরাজ উদ্যান দর্শন করিতে যাইবেন, পথ ঘাট সকল যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা হয়। যে পথ দিয়া তিনি গমন করিবেন ঐ পথ ছত্র, ধ্বজ পুষ্পাদি দ্বারা বিতুষিত ও গন্ধোদক দ্বারা অভিষিক্ত করা হউক; পথের ধারে পূর্ণ কুস্ত ও কদলী বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত হউক। রাজার আদেশে উদ্যান পথ উত্তমরূপে পরিষ্কৃত ও সজ্জিত হইল। কিন্তু ভবিষ্যৎের দ্বার সর্বত্র—কে তাহা প্রতিরোধ করিতে পারে? নগরোত্তানে ভ্রমণকালে

কতকগুলি অপ্রীতিকর দৃশ্য তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইয়া তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করিয়া তুলিল ।

প্রথম দিন একটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ তাঁহার ভ্রমণ-পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সারথীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বুঝাইয়া বলিলেন যে, এই ব্যক্তি জরাদ্বারা অভিভূত হইয়া, জীর্ণ শীর্ণ হীনবীৰ্য্য হইয়া পড়িয়াছে । ইহার কোন কর্ম্মকাজ করিবার শক্তি নাই, বনমধ্যে যেমন জীর্ণ কাষ্ঠ পড়িয়া থাকে, ইহার দশাও সেইরূপ ।

অপর একদিন দক্ষিণ দ্বার দিয়া তিনি উদ্যানভূমিতে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় একটি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল । সারথী বলিলেন, “এই ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত গ্লানি অনুভব করিতেছে । ইহার মৃত্যু আসন্ন এবং আরোগ্য লাভের কোন সম্ভাবনা নাই ।”

আর একদিন দেখিলেন তাঁহার সম্মুখ দিয়া এক শব-যাত্রীর দল চলিয়াছে । মৃতদেহ একটি পালঙ্কোপরি স্থাপিত এবং তাহার চারিদিকে শোকসন্তপ্ত আত্মীয়স্বজনবর্গের বিলাপ-ধ্বনি উত্থিত হইতেছে । সারথী বলিলেন, “দেব, এই লোকটির মৃত্যু হইয়াছে । এ ব্যক্তি গৃহ, পিতা, মাতা আত্মীয়স্বজনবর্গ—ইহাদের সকলকে চিরকালের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছে । আহা, তাহার আপন প্রিয়জনদের কাহাকেও আর সে দেখিতে পাইবে না ।”

সিদ্ধার্থী জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যাধি, জরা, মৃত্যু কি ইহাদের কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম ? সারথী উত্তর করিলেন, “বুবরাজ,



তাহা নহে, মনুষ্যমাত্রেই এই সকলের অধীন । আপনি, আমি, আপনার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র সকলেই এই পথ অনুসরণ করিবে । ব্যাধি, জরা, মৃত্যু কেহই অতিক্রম করিতে পারে না ।”

সিদ্ধার্থ বলিলেন, “যৌবনে ধিক্, যাহার পশ্চাৎ জরা ধাবমান হয় । আরোগ্যে ধিক্, যাহা বিবিধ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত, যাহা স্বপ্নক্রীড়ার স্মার অলীক । জীবনে ধিক্, যাহা এইরূপ নশ্বর ও ক্ষণভঙ্গুর । এই জরা, ব্যাধি, মৃত্যু অতিক্রম করিবার যদি কোন উপায় থাকে, তাহা যেমন করিয়াই হউক আবিষ্কার করিতে হইবে ।”

অন্য একদিন সিদ্ধার্থ উত্তর দ্বার দিয়া উদ্যানভূমিতে প্রবেশ করিতেছিলেন, এমন সময় একটি শাস্ত দাস্ত সংঘত ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক তাঁহার সন্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহাকে দেখিয়া সিদ্ধার্থ সারথীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “যিনি এই কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে শাস্তভাবে বিচরণ করিতেছেন, এই লোকটি কে ?” সারথী বলিল, “ইনি একজন ভিক্ষুক, বিষয়বাসনা বিসর্জন দিয়া সাধু জীবিকা অবলম্বন করিয়াছেন । সন্ন্যাসগ্রহণ পূর্বক ইনি আত্মার শাস্তি অন্বেষণ করিতেছেন, এবং দীনহীন ভাবে সামান্য আহার সংগ্রহ করিতেছেন ।”

সিদ্ধার্থ বলিলেন, “এই আমার মনের মানুষ ! ইনি যে পথে চলিতেছেন সেই মার্গ যিনি অনুসরণ করেন, তিনিই ধম্ম ।” এই লোকটিকে দেখিবামাত্র সিদ্ধার্থ তাঁহার আসক্ত জীবন-চিত্র যেন মানসপটে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন ।

গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া তিনি পথে বাহির হইতে দূত সংকল্প করিলেন। কথিত আছে যে যুবরাজ চতুর্থবার উজ্জান ভ্রমণে সম্যাসী দর্শনানন্তর প্রাসাদে ফিরিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দূতমুখে সংবাদ আসিল যে, তাঁহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছে। এই অপ্ৰত্যাশিত ঘটনায় তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইল—তিনি বলিয়া উঠিলেন, “হায়, এ কি এক নূতন বাঁধনে আমি বাঁধা পড়িলাম, এই কঠিন বন্ধন ছেদন করিতে হইবে।” এই বলিয়া তিনি প্রজাবর্গের আনন্দ উল্লাসের মধ্য দিয়া বিষণ্ণ বদনে বাড়ী ফিরিলেন।

এদিকে যেমন সিদ্ধার্থ সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিয়া গৃহত্যাগী হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, ওদিকে তেমনি তাঁহার পিতা যেকোন উপায়ে হউক তাঁহাকে আটেঘাতে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। এই তাঁহার শেষ চেষ্টা। তিনি স্বীয় রাজ্যের চতুঃসীমার মধ্যে ভাল ভাল নর্তকী গায়িকা, যত সব চতুরা রমণী পুরুষের মন ভুলাইতে সুপটু, তাহাদের সকলকে ডাকাইয়া যুবরাজের প্রাসাদে একত্রিত করিলেন এবং তাহাদিগকে আপন মনোগত অভিপ্রায় খুলিয়া বলিলেন। ইহারাও রাজাজ্ঞানুসারে আপন আপন সন্মোহন বাণ যুবরাজের প্রতি প্রয়োগ করিতে বিরত হইল না; কিন্তু সিদ্ধার্থ এই সকল অন্ত্রে অকৃত রহিলেন। এই সমস্ত যাদুকরী ব্যবসায়িনীরা কিছুতেই তাঁহাকে বশ মানাইতে পারিল না। তাহাদের এইরূপ বিলাসিতার কুহকজাল বিস্তুত দেখিয়া, যুবরাজ ক্রমে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, এবং ভাবিতে ভাবিতে তাহার



## বৌদ্ধধর্ম ।

একটুকু তন্দ্রা আসিল । তন্দ্রা ছুটিয়া গেলে দেখেন সেই সকল যুবতীগণ যে-যেখানে পড়িয়া রহিয়াছে । আলুথালু বেশ, অপরিচ্ছন্ন বেশ,—কোথায় সেই অঙ্গসৌষ্ঠব, কোথায় সেই হাব-ভাব লাভ্য ! তাঁহার চক্ষে এই দৃশ্য এমন কুৎসিৎ কদাকার বোধ হইল যে, তিনি বত শীঘ্র পারেন এই অলৌক আমোদ প্রমোদের মায়াকাল কাটিয়া দূরে পলাইবার পন্থা ভাবিতে লাগিলেন । একবার ভাবিলেন যে, বিদায়ের কালে তাঁহার শিশুটিকে শেষ দেখা দেখিয়া লইবেন ও কোলে করিয়া মুখচুম্বন করিবেন, কিন্তু শয়ন-গৃহের দরজা খুলিয়া দেখেন যে, শিশুটি ফুলশয্যায় তাহার মায়ের কোলে অকাতরে নিদ্রা ঘাইতেছে । শিশুকে লইতে গেলে তাহার মাও জাগিয়া উঠিবেন, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই, তাঁহার যাওয়াই বন্ধ হইয়া যাইবে ; তাই তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া চুপে চুপে সরিয়া গেলেন ।

পূর্ব সঙ্কেত অনুসারে তাঁহার খেতাখ কণ্টক সজ্জিত ছিল । তিনি তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া সারথী ছন্দকসহ সিংহদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন । দ্বারপালেরা কেহই তাঁহাকে রোধ করিল না । এই তাঁহার মহাভিনিক্ষমণ । তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ২৯ বৎসর ।

জাতকে লিখিত আছে যে, সিদ্ধার্থ আষাঢ় মাসে পূর্ণিমা তিথিতে পিতৃগৃহ হইতে অভিনিক্ষমণ করেন । সেই রাতে তাঁহার রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক যোজন দূরে অনোমা নামক নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন । সেখানে অশ্ব হইতে নামিয়া রাজমুকুট দূরে ফেলিয়া দিলেন, ও অঙ্গ

## বৌদ্ধধর্ম ।

হইতে মণিমুক্তা আভরণ সকল খুলিয়া ছন্দকের হস্তে দিয়া করিলেন, “ছন্দক, এই সমস্ত আভরণ নাও, আর কণ্টককে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাও ; আমি এ স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম” । ছন্দক বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া কহিল, “প্রভু ! আমাকে ফিরাবেন না, আমিও গৃহত্যাগী হইয়া আপনার অনুগামী হইব” । কিন্তু সিদ্ধার্থ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাহাকে ফিরিয়া যাইতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিলেন, বলিলেন “তোমার এখনো সন্ন্যাস গ্রহণের সময় হয় নাই, তুমি না ফিরিলে আমি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছি মনে করিয়া আমার পিতা ও বাড়ীর আর সকলে কি ভাবিবে ? তুমি যাও, এবং রাজবাটীর সকলকে বল আমার সমস্তই মঙ্গল । আমি বহুকাল ধরিয়া যে প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি, এক্ষণে তাহা পালন করিতে চলিলাম, আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইলেই আমি বাড়ী ফিরিব, আমার জন্ম কেঁহ যেন চিন্তাকুল না হন ।”

কুমারের আদেশক্রমে ছন্দক অগত্যা অশ্ব ও আভরণ লইয়া শোকার্তহৃদয়ে রাজভবনে ফিরিয়া গেল, এবং রাজাকে সংবাদ দিল যে, যুবরাজ গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসীবেশে কোথায় চলিয়া গেলেন তাহার কোন ঠিকানা নাই ।

গৌতম ছন্দককে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আশ্রম হইতে আশ্রমাস্তুরে বিশ্রাম করতঃ পরিশেষে মগধ-রাজধানী রাজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হন । বিম্বিসার তখন ঐ প্রদেশের প্রবল-প্রতাপ নরপতি ছিলেন । সিদ্ধার্থ নগরে ভিক্ষা করিয়া নিজের আহার সংগ্রহ করিতেন । তাঁহার শরীরে অলোকসামান্য

তেজঃপুঞ্জদৃষ্টি নাগরিকেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। এই নবীন সন্ন্যাসীর আগমনবার্তা রাজসভা পর্য্যন্ত পৌঁছে। বিস্মিসার একদিন প্রাতঃকালে বহু পরিজন সমভিব্যাহারে বহুমূল্য ভেট লইয়া সিদ্ধার্থের সমীপে উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার সুবিমল দেহকান্তি দর্শনে বিমোহিত হইলেন। পরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “প্রভু ! আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি পরম প্রমুদিত হইয়াছি। আপনি আমার সহকারী হউন। যদি আপনি আমার অনুবর্তী হন, আপনি এই অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হইবেন। আপনি যাহা চান সকলি পাইবেন।” তৎপরে তাঁহাকে বহুবিধ মূল্যবান সামগ্রী উপঢৌকন দিয়া কহিলেন “আমার সঙ্গে আসুন, এই দুর্লভ কাম্যবস্তুসকল উপভোগ করিয়া সুখী হইবেন।” এই সাধুকে গৃহস্থাশ্রমে ফিরাইয়া আপনার পার্শ্বচর করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে রাজা এইরূপ অশেষ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। সিদ্ধার্থ মধুর প্রিয় বাক্যে উত্তর করিলেন, “মহারাজ ! আপনার সর্বথা মঙ্গল হউক, এই সকল ভোগ্য বিষয় আপনারি থাকুক, আমি কোন কাম্যবস্তুর প্রার্থী নহি। বিষয়-বাসনা আমার চিত্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে। আমার লক্ষ্যস্থান স্বতন্ত্র।” পরে তিনি রাজার নিকট আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন “কপিলবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন আমার পিতা। বুদ্ধ হইবার আশয়ে আমি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছি।” বিস্মিসার তখন বলিলেন “স্বামিন্, আমি তবে বিদায় হই। আপনি যদি ভবিষ্যতে বুদ্ধ হই লাভ করেন, আমি আপনার ধর্মের

আশ্রয় লইব।” এই বলিয়া বিশ্বিসার তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া রাজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। রাজার সহিত সিদ্ধার্থের এই প্রথম পরিচয়। এক্ষণে তিনি বোধিসত্ত্ব—বুদ্ধ হ লাভের পর তাঁহাদের পুনর্নির্লন হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির নানা উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

রাজগৃহ ভাগীরথীর রমণীয় অধিত্যকায় অবস্থাপিত এক অপূর্ব সাধনক্ষেত্র। বিক্র্যাচলের উত্তরস্থ পঞ্চ শৈলখণ্ডে পরিবেষ্টিত, বাহিরের উপপ্লব হইতে সুরক্ষিত, প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্যে পরিবৃত, বিজনতাসুলভ অথচ নগরীর সন্নির্কর্ষবশতঃ ভিক্ষার সংগ্রহের অনুকূল ইত্যাদি কারণে, ঐ সকল গিরিগুহায় বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী বাস করিত। তাহাদের মধ্যে আলাড় কলম ও রুদ্রক নামক দুইজন খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ উপাধ্যায়ের সঙ্গে গোতমের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। প্রথমে তিনি আলাড় কলমের নিকট গমন করেন। আলাড়ের তিনশত শিষ্য ছিল। গোতম তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকটে দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু সে শিক্ষায় তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। পরে তিনি রুদ্রকের নিকট কিছু কাল ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। তাহাও তাঁহার মনঃপূত হইল না। এই দুই গুরুপদিষ্ট জ্ঞানমার্গে তাঁহার অভীপ্সিত গম্যস্থানে পৌঁছিতে না পারিয়া, তিনি সিদ্ধিলাভের অশ্য পন্থা অবলম্বন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে এই একটি সংস্কার বদ্ধমূল আছে যে, তপশ্চর্য্যার দ্বারা দেবতাদেরও সমকক্ষ হওয়া সম্ভব

হয়, এবং দৈবশক্তি, অস্তুর্দৃষ্টি লাভ ও প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় করা যায় । আলাড় ও রুদ্রকের নিকটে দর্শন শিক্ষা করিয়াও গোতম যখন সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি স্থির করিলেন যে, একান্তে অবস্থানপূর্বক সেই লোকবিশ্রুত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাহার চূড়ান্ত সীমা পর্য্যন্ত গিয়া দেখিবেন তিনি কি ফল লাভ করিতে পারেন । তদনুসারে তিনি বর্তমান বুদ্ধগয়ার মন্দিরের সন্নিকট উরুবেলা বনে গমন করিয়া, নৈরঞ্জনা নদীতীরে পাঁচজন অনুরক্ত শিষ্যের সাহচর্যে ছয় বৎসর যাবৎ যোরতর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন । “শূন্যে আলম্বিত বৃহৎ ঘণ্টাধ্বনির ন্যায়” তাঁহার এই তপস্যার খ্যাতি চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল । এই কঠোর তপশ্চরণে তাঁহার মুখবিবর ও নাসিকারন্ধ্র হইতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইল । ক্রমে তাঁহার কর্ণচ্ছিদ্র রুদ্ধ হইল । তিনি তাঁহার আহার সংযত করিয়া আনিলেন, এমন কি শেষে একটিমাত্র তণ্ডুল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, এবং এইরূপ উপবাস ও শরীর শোষণে অস্থিচর্মসার হইয়া গেলেন । অবশেষে একদিন চিন্তামগ্ন চিন্তে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে তিনি হঠাৎ মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন । শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিল যে তাঁহার ষথার্থই মৃত্যু হইয়াছে । কিন্তু ক্রমে তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন । এই অবস্থায় একটি রাখাল বালক তাঁহাকে এক বাটা দুগ্ধ আনিয়া দিল, সেই দুগ্ধ পান করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন । এই প্রকার তপশ্চর্যার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে হতাশ হইয়া পূর্ববৎ

নিয়মিত আহাৰাদি কৰিতে লাগিলেন, এবং তপস্যার সঙ্কল্প ত্যাগ কৰিলেন । এই সঙ্কট সময়ে, “যখন তাঁহাৰ পক্ষে অপৰেৰ সমবেদনা বিশেষ আবশ্যিক ছিল, যখন অনুরক্ত জনেৰ প্ৰীতি ভক্তি ও উৎসাহবাক্য তাঁহাৰ সংশয়াচ্ছন্ন চিত্তে বল দিতে পাৰিত, তখন তাঁহাৰ শিষ্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ কৰিয়া বারাণসী চলিয়া গেল । তপশ্চৰণ পরিত্যাগ কৰাৰ দৰুণ তিনি তাহা-  
দেৰ শ্ৰদ্ধা হারাইলেন, এবং এই দারুণ দুঃসময়ে তিনি তাহা-  
দেৰ কৰ্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বিফলতাৰ তীব্ৰ জ্বালা একাকী সহ কৰিতে বাধ্য হইলেন ।”

এই অসহায় অবস্থায় তিনি নৈৰঞ্জনাভীৰে একাকী ভ্ৰমণ কৰিতে কৰিতে নিকটস্থ এক অশ্বথ বৃক্ষতলে গিয়া ধ্যানমগ্ন হন । ইহাৰ অব্যবহিতপূৰ্বে পার্শ্ববৰ্তী পল্লীবাসিনী সূজাতা নাম্নী একটি সাধ্বী রমণী এই বনে আগমন কৰেন । সূজাতা প্ৰতিজ্ঞা কৰিয়াছিল—“আমাৰ একটি শিশু সন্তান হইলে বনদেবতাৰ নিকট পূজা দিব” । যখন তিনি এই ঘোৰতৰ উপোষণাদি কৃচ্ছ্ৰসাধনে ত্ৰিয়মাণ তপস্বীকে দেখিলেন, তিনি তাঁহাকে বনদেবতা ভাবিয়া তাঁহাৰ সন্মুখে ভেট লইয়া আসিলেন । সিদ্ধাৰ্থ জিজ্ঞাসা কৰিলেন, “বাছা, কি আনিয়াছ ?” সূজাতা কহিল—“আমি আপনাৰ জন্তু এই পৰম উপাদেয় পৰমাৰ আনিয়াছি । ভগবন্ ! সত্ত্বঃপ্ৰসূত শত গাভীদুখে আমি পঞ্চাশটি গাভী পোষণ কৰিয়াছি, তাহাদেৰ দুখে পঁচিশ, তাহাদেৰ দুখে আবার বাৰোটি গাভী পৰিপুষ্ট । এই দ্বাদশ গাভীৰ দুখ পান কৰাইয়া আমাৰ পালেৰ মধ্যে ছয়টি ভাল ভাল



গরু বাছিয়া তাহাদের দুধ দুছিয়া লই। সেই দুধ উৎকৃষ্ট তণ্ডুলে স্নগন্ধী মশলা দিয়া পাক করিয়া আনিয়াছি। আমার ব্রত এই যে, দেবতার অনুগ্রহে আমার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিলে, এই অন্ন উৎসর্গ করিয়া দেবার্চনা করিব। প্রভু! এখন সেই পরমায় লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করুন”।\* সিদ্ধার্থ স্নজাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, “তুমি যেমন তোমার ব্রত পালন করিয়া সুখী হইয়াছ, সেইরূপ আমিও যেন আমার জীবনব্রত সাধন করিতে সক্ষম হই।” এই দুঃখপানে তিনি শরীরে বল পাইয়া পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষতলে গিয়া যোগাসনে আসীন হইলেন। সেই রাত্রে ঐ বৃক্ষতলে সমাধিস্থ হইয়া তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন। সেই অবধি ঐ বৃক্ষ বোধিবৃক্ষ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

বোধিসত্ত্ব যখন নৈরঞ্জনাভীয়ে বোধিদ্রুমমূলে যোগাসনে আসীন হন, তখন তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন—

ইহাসনে শুশ্যতু মে শরীরং ।  
 ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু ॥  
 অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং ।  
 নৈবাসনাং কায়মতশ্চলিষ্যতে ॥

এ আসনে দেহ মম যাক্ শুকাইয়া,  
 চর্ম্ম অস্থি মাংস যাক্ প্রলয়ে ডুবিয়া ।

\*Light of Asia—Edwin Arnold.

না লভিয়া বোধিজ্ঞান দুর্লভ জগতে,  
টলিবে না দেহ মোর এ আসন হতে ।

এই আসনে বসিয়া বোধিসত্ত্বের দিব্যচক্ষু প্রস্ফুটিত হইল ।  
তিনি ভবজ্ঞানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিলেন । তিনি বৃক্ষ-  
তলে ধ্যানযোগে জগতের যে কার্যকারণশৃঙ্খল প্রত্যক্ষ  
করিলেন, তাহা এই :—

অবিজ্ঞা হইতে সংস্কার ।

সংস্কার হইতে বিজ্ঞান (Consciousness) ।

বিজ্ঞান হইতে নামরূপ ।

নামরূপ হইতে ষড়ায়তন (অর্থাৎ মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়) ।

ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ ।

স্পর্শ হইতে বেদনা ।

বেদনা হইতে তৃষ্ণা ।

তৃষ্ণা হইতে উপাদান (আসক্তি) ।

উপাদান হইতে ভব ।

ভব হইতে জন্ম ।

জন্ম হইতে রোগ, শোক, অরা, মৃত্যু, দুঃখ ও যন্ত্রণা ।

অবিজ্ঞাই সকল দুঃখের মূল । অবিজ্ঞা নাশে সংস্কার বিনষ্ট  
হয়; পরে নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, তৃষ্ণা, আসক্তি প্রভৃতি  
পর্যায়ক্রমে বিনষ্ট হইলে, জন্মবন্ধন ছিন্ন হয়; পরিশেষে জন্ম,  
মৃত্যু, রোগ, শোক, সর্ব দুঃখ বিদূরিত হয় । এইরূপে দুঃখের  
মূলকারণ ও মূলচ্ছেদ বুদ্ধদেব ধ্যানযোগে সুস্পষ্ট উপলব্ধি



করিলেন । তিনি দেখিতে পাইলেন যে, অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানই আমাদের সকল দুঃখের কারণ, এবং অবিজ্ঞার অপগমেই দুঃখের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় ।

বোধিসত্ত্ব যে মুহূর্ত্তে জগতের দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধের এইরূপ প্রণালী নির্দ্ধারণ করিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি “বুদ্ধ” এই নাম ধারণ করেন ।

বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াই তিনি নিম্নোক্ত উদান গান করিয়া-  
ছিলেন :—

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সম্ অনিব্বিসম্  
গহকারকং গবেসন্তো দুঃখাজাতি পুনপ্পুনং ।  
গহকারক দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি  
সব্বাতে ফাস্সুকা ভগ্গা গহকুটং বিসংখিতং  
বিসংখার গতং চিত্তং ত্‌হানং খয় মজ্জবাগা ।

জন্মজন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান,  
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ ।  
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,  
হে গৃহকারক ! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর ;  
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তি চয়,  
সংস্কার-বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয় ।

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর করেক সপ্তাহ বুদ্ধদেব ঐ অঞ্চলেই অবস্থান করিলেন । সপ্তম সপ্তাহে ত্রিপুর ও তল্লিক নামক

দুইজন বণিক পাঁচশত শকট ও বিবিধ পণ্যসহ উৎকল হইতে ঐ পথে আসিতেছিলেন ; দেখেন যে কাষায় বস্ত্রপরিহিত, অগ্নির স্মায় দেদীপ্যমান একটি তাপস-কুমার এক বৃক্ষতলে আসীন। ভোজন-বেলা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, উহারা মধুপিষ্টক প্রভৃতি নানা স্নমিষ্ট খাদ্যদ্রব্য একটি পিণ্ডপাত্রে সাক্কাইয়া কুমারকে নিবেদন করিয়া কহিলেন, “ভগবন্ ! অনুগ্রহ পূর্বক এই পিণ্ডপাত্র গ্রহণ করুন।” বুদ্ধদেব উহাদের প্রতি সম্ভৃষ্ট হইয়া ঐ পিণ্ডপাত্র গ্রহণ করিয়া উহাদের নিকট সঙ্কর্ম্মের ব্যাখ্যা করিলেন। উহারা ভগবৎ-কথিত উপদেশ শ্রবণ করিয়া বুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই দুই বণিক বুদ্ধদেবের প্রথম শিষ্যরূপে পরিগণিত।

বুদ্ধ পাইবার পূর্বের গোতম বোধিবৃক্ষতলে যখন যোগাসনে আসীন ছিলেন, তখন “মার” অর্থাৎ পাপাত্মা সয়তান বা কামদেব স্বীয় পুত্র-কন্যা দলবল লইয়া, কত ভয়, কতপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিতেছিল,—যৌশুখ্মের প্রতি সয়তানের আক্রমণ যেরূপ বর্ণিত আছে, এও কতকটা সেইরূপ,—কিন্তু কিছুতেই তাহারা কৃতকার্য হইতে পারে নাই। বুদ্ধদেব যোগাসনে অটল রহিলেন, অস্মরাগণের সহস্র মায়া পরাহত হইল। এই সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া, যখন তিনি সম্মুদ্র হইলেন, তখন তিনি স্বেচ্ছাবিত ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্ম সমুৎসুক হইয়া, একাকী সম্মিদ্ধ মনে বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি নিজে যে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহা লোকের মধ্যে প্রচার করিবেন কি না, এই

তর্ক তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল । তিনি ভাবিলেন, এই সব বিষয়াসক্ত চঞ্চল-চিত্ত লোকেরা তাঁহার কথা কি বুঝিবে ? অবশেষে ব্রহ্মাসহস্রপতি\* স্বর্গ হইতে নামিয়া তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন, এবং উৎসাহবাক্যে তাঁহাকে ধর্মপ্রচারে উৎসাহিত করিলেন ;—বলিলেন যে তিনি কর্ণধার হইয়া ব্রহ্মা না করিলে লোকেরা সংসারের মোহার্ণবে মগ্ন হইয়া অধঃপাতে যাইবে । ব্রহ্মার প্ররোচনায় বুদ্ধদেব সত্যধর্ম প্রচারে বাহির হইলেন । কিন্তু কাহার নিকট কোথায় যাইবেন ? প্রথমে আলাড় কলম ও রুদ্রক—তাঁহার ভূতপূর্ব দুই গুরুর নাম—তাঁহার মনে পড়িল । তাঁহাদের নিকট তিনি অনেক শাস্ত্রালোচনা করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের প্রথর বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, ভাবিলেন তাঁহারা তাঁহার উপদেশ গ্রহণের যোগ্য পাত্র বটে ; কিন্তু সন্ধান করিয়া দেখিলেন তাঁহাদের উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে । তাঁহাদের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাঁহার পূর্বতম পঞ্চ শিষ্যের কথা স্মরণ করিলেন, ও জানিতে পারিলেন তাঁহারা বারাণসীর মৃগদাব নামক স্থানে ঋষিপত্তনে অবস্থিতি করিতেছেন । তিনি তাহাদিগকে ধর্মোপদেশ দিবার মানসে তাঁহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির অষ্টম সপ্তাহে বারাণসী যাত্রা করেন । গিয়া এই পঞ্চ ভিক্ষুর বাসস্থানে উপনীত হইলেন । প্রথমে শিষ্যেরা স্থির করিয়াছিল যে তাঁহাকে বসিবার আসন দিবে না, তাঁহার কোনরূপ আতিথ্যসংকার করিবে না ;

\*এই দেবতা বুদ্ধের একজন হিতৈষী সহচর বলিয়া বর্ণিত ।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যখন বুদ্ধদেব তাহাদের সমীপে আগমন করিলেন, তখন তাঁহার তেজঃপুঞ্জ রূপ-রাশি সন্দর্শন করিয়া তাহারা পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেল, ও আসন হইতে উখিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিল; তথাপি পূর্বপরিচিত বলিয়া কেহ তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকে, কেহ তাঁহাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করে, ইহাতে তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “আমার নাম ধরিয়া ডাকিও না, আমাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করিও না, তথাগত এখন সম্বুদ্ধ হইয়াছেন, দিব্য জ্ঞানলাভে আপ্তকাম হইয়াছেন। আমার উপদেশ গ্রহণ কর।” এই কথা শুনিয়া সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ বুদ্ধের পদে প্রণত হইয়া তাঁহাকে বলিল, “ভগবন্! দোষ মার্জ্জনা করিয়া আমাদের ধর্মোপদেশ প্রদান করুন।” কথিত আছে যে, এমন সময় অকস্মাৎ সপ্তরত্নময় শত আসন সেই স্থানে কে যেন বিছাইয়া দিল, বুদ্ধদেব একখানি আসনে উপবেশন করিলেন। উপোরোক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁহার পুরোভাগে আসীন হইল। সেই সময় তাঁহার শরীর হইতে স্বর্গীয় জ্যোতি নির্গত হইয়া দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। প্রচণ্ড ভূমিকম্প মেদিনী কাঁপিয়া উঠিল, স্বর্গ হইতে দেবতারা দলে দলে নামিয়া আসিলেন; স্বর্গধাম শূন্য হইয়া গেল। এই শুভ মুহূর্ত্তে সুমন্দ গন্ধবহ ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল, সুরভি পুষ্পসৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হইল। সহসা দিগদিগন্ত ধ্বনিত করিয়া ভৈরব রবে ভেরী বাজিয়া উঠিল, আর জনকোলাহল সব থামিয়া গেল। তখন বুদ্ধদেব কথারম্ভ করিলেন। তিনি পালী ভাষায় কথা

কহিতেছিলেন, কিন্তু উপস্থিত অসংখ্য লোকের মধ্যে প্রতিজনে ভাবিল যে, তিনি তাহারই মাতৃভাষায় তাহাকে উপদেশ দিতেছেন । সেই উপদেশের প্রতি কথা তাহাদের প্রত্যেকের অন্তরে অনুবিন্দ হইল । তাহারা তাঁহার সেই কথামৃত পানে জ্ঞানতৃপ্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল ।

সে উপদেশের সার মর্ম এই :—

মনুষ্যেরা মোহবশতঃ বিপথে পদার্পণ করে ; একদিকে বিষয়-লালসা ভোগাসক্তি, অন্য দিকে অনর্থক কঠোর তপস্যায় শরীর-শোষণ । আমি মধ্যপথ আবিষ্কার করিয়াছি, সেই আষ্টাঙ্গিক আর্ধ্যমার্গ অবলম্বন করিয়া চলিলে দেখিতে পাইবে যে দুঃখক্লেশের মূলচ্ছেদ হইবে—শান্তি ও নির্বাণমুক্তি তোমাদের আয়ত্ত হইবে । এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব যে উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহাই “ধর্মচক্র” । তাহাতে চারিটি গভীর তত্ত্ব সন্নিবেশিত আছে, সেগুলি এই :—

প্রথম ।—সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় । জন্মে দুঃখ, রোগে দুঃখ, জরামরণ দুঃখময় । যাহা ভাল লাগে না তাহার সঙ্গে মিলনে দুঃখ, ভালবাসার পাত্রের বিয়োগ দুঃখময় ।

দ্বিতীয় ।—বিষয়তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ ।

।—এই বিষয়তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটন করাতেই

—দুঃখনিবৃত্তির আষ্টাঙ্গিক পথ আছে, সেই পথ  
যা চলিলেই তোমরা বাঞ্ছিত ফললাভ করিয়া

সে পথ এই অষ্টপ্রকার :—

- ১। সম্যক্ দৃষ্টি
- ২। সম্যক্ সঙ্কল্প (সঙ্কল্প ঠিক রাখা)
- ৩। সম্যক্ বাক্য (সত্য সরল প্রিয় বাক্য বলা)
- ৪। সম্যক্ কর্ম্মাস্তু (সদাচরণ)
- ৫। সম্যক্ আজীব (সর্বভূতে অহিংসাপূর্ণ সাধু জীবিকা অবলম্বন)
- ৬। সম্যক্ ব্যায়াম (আত্মসংযম প্রভৃতি উপায়ে আত্মোৎকর্ষ সাধন)
- ৭। সম্যক্ স্মৃতি (ধারণা ঠিক রাখা)
- ৮। সম্যক্ সমাধি (জীবনের সুগভীর তত্ত্বসকলের ধ্যান ধারণা ও নিদিধ্যাসন)

এই আষ্টাঙ্গিক আর্ধ্যমার্গ অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে, পথে কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি যে কয়েকটি সংযোজন অর্থাৎ বন্ধন আছে, তাহা ছেদন করিতে হইবে। এই নির্দিষ্ট পুণ্যপথে চলিলে দুঃখ, শোক অতিক্রম করিয়া তোমরা নির্বারণরূপ শূন্য পুরুয়ার্থ লাভে সমর্থ হইবে। তথাগত এইরূপে বারাগসীতে সর্বপ্রথমে “ধর্ম্মচ” করিলেন। বুদ্ধদেবের এই হৃদয়স্পর্শী জ্ঞানগর্ভ উ করিয়া সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁহার উপদিষ্ট নবীন পন হইল; তাঁহাদের পূর্বতন গুরুশিষ্য সম্বন্ধ আ

---

\*এই দুঃখতত্ত্ব বৌদ্ধ ধর্ম্ম শাস্ত্রে প্রতীত্য-সমুৎপাদ বলিয়া

হইল । সর্ব প্রথমে বয়োবৃদ্ধ কোণ্ডিয়া, যাঁহার জীবনের ত্রিকাল অতীত হইয়াছে, তিনি “বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি” বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন । অবশিষ্ট চারজন প্রথমে ইতস্ততঃ করিতেছিল, কিন্তু তাহাদের মনে যাহা কিছু সংশয় ছিল, আরো তর্কবিতর্কের পর তাহা বিদূরিত হইল ; তাহারাও একে একে বুদ্ধদেবের শিষ্যরূপে দীক্ষিত হইল । বুদ্ধের এই প্রথম পঞ্চ শিষ্য\* ভবিষ্যতে বৌদ্ধ সমাজে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জন করিয়া, কালক্রমে অর্হৎমগুলীর মধ্যে স্থান লাভ করিলেন ।

বারাণসীতে অবস্থিতি কালে প্রথমে উল্লিখিত পঞ্চভিক্ষু তাঁহার উপদেশক্রমে দীক্ষিত হন । ক্রমে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; বর্ষানন্তর ৬০ জন শিষ্য হইল, তখন তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে একত্র করিয়া এই উপদেশ দিলেন—“হে ভিক্ষু-গণ, তোমরা আমার উপদেশ লাভে এইক্ষণে পঞ্চরিপু দমন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়াছ । এখন তোমাদের কর্তব্য যে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গিয়া উচ্চ নীচ সকল লোকের মধ্যে আমার উপদিষ্ট সত্য ঘোষণা কর । আমি এক্ষণকার মত উরুবেলার বনে গিয়া আমার ব্রত উদ্যাপন করি ।” উরুবেলায় কিয়ৎকাল বাস করিয়া তিনি কতিপয় নূতন শিষ্য সংগ্রহ করিলেন, এবং সেখান হইতে রাজা বিশ্বিসারের রাজধানী রাজগৃহে শিষ্য

---

\*পঞ্চশিষ্যের নাম কোণ্ডিয়া, তত্রজিৎ, বাঙ্গ ( বঙ্গ ), মহানাম এবং অশ্বজিৎ ।



যাত্রা করিলেন । রাজা বহু সম্মানপূর্বক বুদ্ধদেবের দর্শন ও উপদেশ শ্রবণ করিয়া, পরদিন তাঁহাকে ভিক্ষুগণী সহ রাজবাটীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন । বুদ্ধদেব যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন, এবং আহারাদি সমাপ্ত হইলে, রাজা বিশ্বিসার বেণুবন ( বাঁশবন ) নামক এক সুরম্য উদ্যান গুরুদক্ষিণাস্বরূপ বৌদ্ধসমাজকে দান করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন । বুদ্ধদেব এখানে অনেক বৎসর বর্ষাকাল যাপন করেন, এবং তাঁহার অনেক উপদেশ এখান হইতেই প্রদত্ত হয় বলিয়া এই স্থান বৌদ্ধদের মহাতীর্থরূপে প্রসিদ্ধ ।

ইত্যবসরে এক সময়ে তিনি কপিলবস্তু গিয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন । সে রাজ্য হইতে প্রজাবৎসল যুবরাজ যখন বৈরাগ্য-দীপ্ত হৃদয়ে বাহির হইয়াছিলেন, সে এক কাল,—আর এক্ষণে সন্ন্যাসীবেশে, মুণ্ডিত কেশে, ভিক্ষাপাত্র হস্তে সেই রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন । নগরে প্রবেশ করিয়া গোতম দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন শুনিয়া রাজা শুদ্ধোদন অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া, তিনি যেখানে ছিলেন সত্বর আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন, এবং কাতর স্বরে কহিলেন, “এই কি আমাদের শাক্যকুলপ্রদীপ যুবরাজ সিদ্ধার্থ ? তুমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছ, এ কি কখন সম্ভব হয় ? হা বৎস ! এরূপ কেন হইল ?” বুদ্ধ উত্তর করিলেন, “মহারাজ ! আমার কুলধর্ম এই ।” মহারাজ কহিলেন, “সে কি কথা ? কোন্ বংশে তোমার জন্ম ? কত্রিয়বংশীয় রাজপুরুষেরা কি তোমার পিতৃপুরুষ ছিলেন না ? তাঁহাদের মধ্যে কেহ ভিক্ষাবৃত্তি



অবলম্বন করিয়াছেন, কেহ কখনও কি শুনিয়াছে?” গৌতম কহিলেন “আমার বংশ রাজবংশ নয়, বুদ্ধেরা আমার পূর্ব পুরুষ । তাঁহাদেরই চিরন্তন প্রথানুসারে আমি ভিখারী বেশে এই রাজদ্বারে সমাগত হইয়াছি । কিন্তু মহারাজ, আত্মপ্রভাবে এবং প্রেমবলে, এই যে মলিনবসন দীনহীন ভিখারী, মহা প্রতাপশালী রাজরাজেশ্বর অপেক্ষাও আজ তার উচ্চাসন । আমি যে অক্ষয় অমূল্য রত্ন ভেট লইয়া আসিয়াছি, তাহা পিতৃদেবের চরণে সমর্পণ করি আমার একান্ত ইচ্ছা, প্রসন্ন হইয়া গ্রহণ করুন ।” শুদ্ধোদন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া পুত্রের হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন । তথায় রাজা প্রজা মন্ত্রীবর্গ সভাস্থ সকলকে তিনি তাঁহার ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন । চতুরার্য্যসত্য, অষ্টাধ্যমার্গ, আত্মসংযম, বৈরাগ্য, অহিংসা, অনুকম্পা, মৈত্রী, শাস্ত শাস্তিরূপিণী নির্ব্বাণ মুক্তি—এই সকল সত্য অমৃতধারার স্রায় বর্ষিত হইল । সেই উপদেশ শ্রবণ করিয়া শুদ্ধোদন প্রীত হইলেন ; তাঁহার সকল সংশয় দূর হইল, সকল ক্ষোভ মিটিয়া গেল ।

যখন রাজপুত্র প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত রাজপরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষ সকলেই উপস্থিত হইল, কেবল যশোধরা নাই । বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “যশোধরা কোথায় ?” তিনি আসিবেন না শুনিয়া গৌতম রাজার সহিত স্ত্রীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন । গিয়া দেখেন, যশোধরা মলিনবেশে রুদ্ধ আলুলায়িতকেশে ঘরে বসিয়া আছেন । স্বামীকে দেখিয়া তাঁহার চিরসম্বরিত প্রেমাশ্র উখলিয়া

উঠিল,—তিনি তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । পরে রাজাকে দেখিয়া সসন্ত্রমে এক পার্শ্বে উঠিয়া দাঁড়াইলেন । অস্তাগিনী যশোধরা এতকাল পতিবিরহে দীনবেশে, অনাহারে, অনিদ্রায়, কষ্টে দিনযাপন করিতেছিলেন, রাজা সে সমস্ত খুলিয়া বলিলেন । বুদ্ধের মন গলিয়া গেল । তখন তিনি যশোধরা পূর্বজন্মে কিরূপ গুণবতী ছিলেন, তাহার এক ‘জাতক’ গল্প বলিয়া তাঁহাকে সাস্তুনা করিলেন । পরে তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন । বুদ্ধদেবের উপদেশ শ্রবণে যশোধরার হৃদয়মন আকৃষ্ট হইল, এবং বৌদ্ধদের মধ্যে সন্ন্যাসিনীশ্রেণী স্থাপিত হইবার পর তিনি বৌদ্ধসন্ন্যাসিনীর মধ্যে প্রধানা বলিয়া পরিগণিত হইলেন ।

কপিলবস্তু জনপদের মধ্যে অনেকে বুদ্ধ-উপদেশ গ্রহণ করিলেন । তাঁহারা সজ্জভুক্ত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে চারিজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

- ১ । আনন্দ ।
- ২ । অনিরুদ্ধ ।
- ৩ । দেবদত্ত ।
- ৪ । উপালী ।

প্রথম তিনজন তাঁহার আত্মীয় । সর্বপ্রথমে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আনন্দের নাম করিতে হয়, যিনি বুদ্ধের মরণ কাল পর্য্যন্ত পার্শ্চর্যরূপে তাঁহার সেবাসুশ্রমায় রত থাকিয়া গুরুদেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন । বুদ্ধদেব স্বীয় ৫৫

বৎসর বয়সে তাঁহাকে উপস্থায়ক ( Personal Assistant ) পদে নিযুক্ত করেন ।

দ্বিতীয়, রাজা শুক্লোদনের ভ্রাতৃপুত্র অনিরুদ্ধ, যিনি বৌদ্ধ-তত্ত্বদর্শী সুপণ্ডিত বলিয়া বৌদ্ধ সমাজে খ্যাতি লাভ করেন ।

তৃতীয়, বুদ্ধের শ্যালক দেবদত্ত, ইনি ভিন্ন-প্রকৃতির লোক ছিলেন, বৌদ্ধধর্মের দীক্ষিত হইয়া অবধি বুদ্ধের সহিত ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয় ।

দেবদত্তের ইচ্ছা এই যে, তিনি নিজে এক নূতন সম্প্রদায় পুস্তন করিয়া গৌতমের পদারূঢ় হন। এই উদ্দেশে তিনি পাঁচশত শিষ্য সংগ্রহ করিয়া এক স্বতন্ত্র সঙ্ঘ স্থাপন করিবার উদ্ভোগ করেন। মগধ-রাজকুমার অজাতশত্রু ইঁহাদের জন্ম গয়ানদীর তীরে এক বিহার নিৰ্ম্মাণ করিয়া দেন। জনশ্রুতি এই যে, দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু নানাপ্রকার ছল, বল, কৌশলে স্বীয় পিতার প্রাণ সংহার করেন। অনন্তর তিনি মগধের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ।

রাজাকে আপনার পক্ষে টানিয়া লইয়া, দেবদত্ত বুদ্ধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইলেন। তিনি যে বুদ্ধ-পদপ্রাপ্তির উচ্চাভিলাষ পোষণ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত নিষ্ফল জানিয়া বুদ্ধকে সরাইবার অশু পন্থা দেখিতে লাগিলেন। প্রথমে, মগধরাজকে ফুসুলাইয়া গৌতমের বিপক্ষে উত্তেজিত করিলেন, পরে তাঁহার সাহায্যে নানাবিধ গুরুমারা কাঁদ পাতিলেন। কিন্তু যেদিকে যান কোন দিকেই কার্যসিদ্ধি হয় না। তিনি রাজার নিকট হইতে একদল ধর্মুখারী সেনা লইয়া

গৌতমকে মারিতে পাঠান—তাহারা গৌতমের নিকট ষাইবামাত্র তাহাদের ধনুর্বাণ হাত হইতে খসিয়া পড়ে । তাহারা ভয়ে জড়সড় হইয়া ক্রমা প্রার্থনা করে, ও বুদ্ধদেব তাহাদের অপরাধ মার্জনা করিয়া এই সৈন্যদলকে শিষ্যদলভুক্ত করেন । পরে দেবদত্ত স্বয়ং পর্বতে আরোহণ করিয়া শৈলশৃঙ্গ হইতে সূর্যহং শিলাখণ্ড অবসর বুঝিয়া বুদ্ধের মাথার উপর নিক্ষেপ করিলেন— আর অমনি তাহা তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল । বুদ্ধকে পদদলিত করিতে যে উন্মত্ত বন্যহস্তী প্রেরিত হয়, সে তাঁহার সম্মুখে গিয়া নিরীহ শাস্ত ভাব ধারণ করিল । এইরূপে দেবদত্তের গুরুবধ-চেষ্টা, সর্বথৈব ব্যর্থ হইল ।

রাজ-সিংহাসনে অধিকৃত হইবার পর অজাতশত্রু পিতৃহত্যা মহাপাপে অর্জুরিত হইয়া দুঃসহ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন—তাঁহার চিন্তে বিন্দুমাত্র শান্তি রহিল না । ইত্যবসরে একদিন পূর্ণিমা তিথিতে রাজগৃহে এক মহোৎসব হয় । তদুপলক্ষে রাজমন্ত্রীগণ বৈষ্ণরাজ জীবকের পরামর্শে অজাতশত্রুকে বুদ্ধের নিকট লইয়া যান । তাঁহার উপদেশ শ্রবণে রাজার চৈতন্য জন্মে এবং তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে স্বীয় পাপসকল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার পূর্বক বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন ।

এই ঘটনার পর অবধি দেবদত্তের প্রভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসে; তখন তিনি বৌদ্ধসঙ্গে তেদ ঘটাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । তিনি বুদ্ধের নিকট সজ্জের কথকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্তিত করিবার

প্রস্তাব করেন । বুদ্ধদেব তাঁহার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায়, দেবদত্ত অসম্মত হইয়া গয়ানদৌতীরস্থ স্বীয় বিহারে ফিরিয়া যান । কিছুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয় ।

চতুর্থ, রাজ-নাপিত উপালী । উপালী জাতিতে নাপিত, কিন্তু স্বীয় ধর্মপ্রাণতা ও বুদ্ধিবলে তিনি বৌদ্ধমণ্ডলীর নেতৃবর্গের অগ্রগণ্য হইলেন । বৌদ্ধসঙ্ঘে যে জাত্যভিমান স্থান লাভ করে নাই, তাহার এই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ।

কপিলবস্তুর বুদ্ধদেবের অবস্থান কালে একদিন যশোধরা তাঁহার পুত্র রাহুলকে রাজপুত্রের মত বেশভূষায় সাজাইয়া তাঁহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দেন । রাহুলের বয়স তখন সাত বৎসর । মাতা তাহাকে বলিলেন, “ঐ যে সাধু দেখ্‌চিস্, ঐ তোর পিতা । ঠুর কাছে কত টাকাকড়ি ঐশ্বর্য আছে,— কাছে গিয়া তোর বাপের ধন ভিক্ষা চাস্ ।” রাহুল বলিল— “আমার পিতা ? রাজাই ত আমার বাবা, আর কে ?” যশোধরা বুদ্ধকে দেখাইয়া দিলেন । রাহুল বুদ্ধের নিকট গিয়া তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিয়া আপন পৈতৃক সম্পত্তি ভিক্ষা করিল । বুদ্ধ কহিলেন, “বৎস ! সোণা, রূপা, মণিমাণিকা আমার কাছে নাই । আমার কাছে যে সত্যরত্ন আছে, তাহা আমি দিতে পারি, যদি আমাকে কথা দেও যে, তাহা যত্নপূর্বক রক্ষা করিবে ।” এই বলিয়া রাহুলকে তাহার ধারণানুসারে ধর্মোপদেশ দিলেন, এবং বালক পিতৃ-উপদেশ গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধসমাজভুক্ত হইল ।

এই বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি অত্যন্ত মনঃকুণ্ঠ

হইলেন। সিদ্ধার্থ গেল, আনন্দ গেল, তাঁর ভ্রাতৃপুত্র অনিরুদ্ধ গেল, এখন তাঁর পৌত্রটিকে তাঁর পার্শ্ব হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল, তাঁর রাজ্যাধিকারী আর কেহই রহিল না। রাজা সিদ্ধার্থের প্রতি এ বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করাতে সিদ্ধার্থ নিবেদন করিলেন, “মহারাজ! যাহা হইয়াছে মার্জনা করিবেন, ভবিষ্যতে এরূপ আর হইবে না। পিতৃব্যের অনুমতি বিনা অল্পবয়স্ক বালকের দোকাবিধি নিষিদ্ধ—আমি এই নিয়ম করিয়া দিতেছি।” এইরূপ অনেক আশ্বাস দিয়া কিছুদিন পরে পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি রাজগৃহের বেণুবনে প্রত্যাগমন করিলেন।

বুদ্ধদেবের মহাবোধি বৃক্ষতলে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার কপিলাবস্তু গমন ও তথা হইতে রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন পর্য্যন্ত প্রায় আঠার মাস কাল অতিবাহিত হয়। এই স্বল্পকালব্যাপী বুদ্ধজীবনের ইতিবৃত্ত বৌদ্ধগ্রন্থসকলে আনুপূর্বিক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পরবর্তী ঘটনাবলীর কাল নির্ণয় করা সুকঠিন, কেন না সেই সমস্ত গ্রন্থে সে বিষয়ে কোন মিল নাই। যে সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণিত আছে, তাহা আর কিছুই নয়—গৌতম বুদ্ধের স্মরণীয় কোন কৃত্য অথবা স্মরণীয় কথাবার্তা, উপদেশ। এই স্থলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আমার অভিপ্রেত নহে—কেবল দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই ভাগ উপসংহার করিব।

বৌদ্ধধর্মের সছোদৌক্ষিত সুরাপরম্ভের একটি বণিক তাঁহার প্রতিবাসী আত্মীয়বর্গকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতে সমুৎসুক



হইয়া গুরুদেবের অনুমতি প্রার্থনা করাতে বুদ্ধ কহিলেন,—“আমি শুনিয়াছি সুরাপরন্তের লোকেরা বড় দুষ্ক, রাগী ও অত্যাচারী ; তাহারা তোমার অপবাদ ও নিন্দা করিলে তুমি কি করিবে ?”

—আমি চূপ করিয়া থাকিব ।

—তাহারা যদি তোমাকে ধরিয়া মারে ?

—আমি তাদের মারিব না ।

—যদি তোমাকে বধ করিবার চেষ্টা করে ?

—মৃত্যুর হাত এড়াইবার উপায় নাই, শমন ত আসিবেই, কিন্তু তাহাতে ভয় কি ? অনেকে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার জন্য অনেক সময় মৃত্যু চায়, কিন্তু আমি তা করিব না । তাকে ডাকিয়াও আনিব না, আর আসে ত বারণও করিব না ।

এই উত্তরে গুরুদেব তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রচার কার্যে বাহির হইতে অনুমতি দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ।

আর এক সময় একটি যুবতী স্ত্রী তাহার পুত্রটি হারাইয়া পাগলিনীপ্রায় হইয়া ছুটাছুটি করিতেছিল । তাহার নাম কিসাগোতমী । অল্পবয়সে তাহার বিবাহ হয় এবং একটি পুত্র জন্মে । শিশুটি দেখিতে অতি সুন্দর ছিল, আর চলিতে শিখিবার বয়সেই সর্পদংশনে মারা পড়ে । গোগোতমী মৃত শিশুটি কোলে লইয়া ঘরে ঘরে ফিরিতেছেন, যদি কেহ কোন ঔষধ দিয়া তাহাকে বাঁচাইতে পারে । একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঁহাকে বলিল,—“তুমি যে ঔষধ চাহিতেছ আমার কাছে তা নাই । কিন্তু আমি জানি একজন তোমাকে ঔষধ

দিতে পারেন । ঐ গৈরিকবসনধারী বুদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছে যাও, বলিয়া দিবেন ।” গোতমী বুদ্ধের নিকট যাইয়া বলিলেন, “প্রভো ! আমি আপনার নাম শুনিয়া বড় আশা করিয়া আপনার কাছে এসেছি, এখন একটা ঔষধ বলিয়া দিন যাতে আমার এই ছেলেটি প্রাণদান পায় ।” বুদ্ধদেব কহিলেন—“আচ্ছা বলিয়া দিব, যদি আমি যে জিনিষ বলিতেছি আমায় তা আনিয়া দিতে পার; আর কিছু নয়, এক মুঠা সরিষার বীজ ।” যখন গোতমী আশ্রমের সহিত তাহা আনিয়া দিতে স্বীকৃত হইল, তখন তিনি কহিলেন, “কিন্তু একটা সর্ত্ত আছে । এমন ঘর থেকে আনিতে হইবে, যেখানে বাপ, মা, স্বামী, পুত্র কিম্বা ভৃত্য, ইহার কোন একজনের মৃত্যু হয় নাই ।” গোতমী তাহাই অঙ্গীকার করিয়া মৃত শিশু কোলে বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী দ্বারে দ্বারে ফিরিতে লাগিলেন । এক মুঠা সরিষা দিতে সকলেই প্রস্তুত, কিন্তু যখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ বাড়ীতে মা-বাপ-স্বামী-পুত্র কি ভৃত্য কেহ মরিয়াছে কি না ?” তাহারা বলিল, “বলেন কি ? জীবন্ত লোক অল্প, মৃতের সংখ্যাই অধিক ।” \* কেহ বলে আমার একটি পুত্র মরিয়াছে, কেহ বলে আমার পিতা মাতার মৃত্যু হইয়াছে; কেহ বলে আমার ভৃত্যটি মরিয়াছে । অবশেষে যেখানে একটি লোকও মরে নাই, এমন গৃহ না পাইয়া রমণী বুদ্ধের নিকট ফিরিয়া আসিলেন । বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাছা, সরিষার বীজ এনেছ কি ?” গোতমী বলিলেন, “প্রভো, আনি নাই । যাদের জিজ্ঞাসা করি তাহারা বলে জীবন্ত লোক অল্প, মৃতব্যক্তিই অনেক ।” তখন বুদ্ধ তাঁহাকে জীবনের



অনিত্যতা বিষয়ে উপদেশ দিয়া বুঝাইয়া দিলেন । তাঁহার মনে প্রতীতি জন্মিল, তখন সাস্তুনা লাভ করিয়া বুদ্ধদেবের চরণে প্রণত হইলেন ।

বৌদ্ধভিক্ষুরা একদিন বুদ্ধদেবের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“ভগবন্ ! সন্ন্যাসাশ্রমী ভিক্ষুরা স্ত্রীলোকদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে ?”

বুদ্ধদেব কহিলেন—তাহাদের প্রতি দৃষ্টি করিও না ।

—যদি তাহারা সম্মুখে আসিয়া পড়ে ?

—তাদের দেখিয়াও দেখিও না, এবং তাদের সহিত বাক্যালাপ করিও না ।

—যদি তাহারা আমাদের সহিত কথা কহে তাহা হইলে কি করিব ?

—যদি কথা কহিতেই হয়, মনে কোন কুভাব না থাকে, পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্লিপ্ত থাকিবে ।

বুদ্ধদেব আরও কহিলেন :—

“বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীকে মাতৃতুল্য, যুবতীকে ভগিনীতুল্য, অল্পবয়স্ক বালিকাকে দুহিতা সমান জ্ঞান করিবে ।

“পরস্ত্রীর প্রতি কামাসক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করা অপেক্ষা তপ্তলৌহখণ্ড দ্বারা চক্ষু উৎপাটন করা ভাল ।

“সাবধান ! সংযমী হও, কামরিপুকে হৃদয়ে স্থান দিও না । রমণীসংসর্গ হইতে দূরে থাকিয়া তোমরা শ্রমণের ব্রত পালন করিবে ।”

এইরূপে তাঁহার জীবনের অশীতি বৎসর গত হইল;

এই দীর্ঘকাল বিনা দুঃখে কষ্টে, বিনা সঙ্কটে অবাধে কাটিয়া গেল, এমন মনে করা ঠিক নয়। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার উপর দিয়া কত বিপ্লব বাধা গিয়াছে, তিনি কত বিপত্তির মধ্যে পড়িয়াছেন বলা যায় না; তথাপি তিনি তাঁহার কর্তব্যপথ হইতে তিলমাত্র বিচ্যুত হন নাই। গৃহস্থেরা আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবিচ্ছেদে তাঁহার উপর ক্ষেপিয়া উঠিয়া তাঁহার কত অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা স্বকীয় আধিপত্য নাশ ভয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে কত ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তাঁহার শিষ্য দেবদত্ত একবার তাঁহাকে যে বিপদে ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল; তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

এই জীবনী হইতে বুদ্ধদেবের নিত্য নিয়মিত জীবনকৃত্য আমরা কতকটা কল্পনা করিতে পারি,—কিন্তু শুধু কল্পনা নহে, অনেকানেক বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা তাহা বর্ণিত দেখিতে পাই। তিনি প্রত্যুষে গাত্রোথান পূর্বক কোন পরিচারকের সাহায্য ব্যতিরেকে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেন। তখন হইতে ভিক্ষার্থে গ্রামে ষাইবার পূর্বে যে সময়টুকু থাকিত, তাহা নির্ভঙ্কনে ধ্যানে যাপন করিতেন। বাহির হইবার সময় হইলে তিনি ভিক্ষুকদের শ্রায় বসনত্রয় পরিধান পূর্বক ভিক্ষাপাত্র হস্তে কখনো একাকী, কখনও বা অনুচরসহ সন্নিহিত গ্রামে কিম্বা নগরে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করিতেন। তাঁহার দেহ হইতে অপূর্ব জ্যোতি বিনির্গত হইত। বিহঙ্গমের কলরবে এবং আকাশ হইতে মধুর ধ্বনিতে দিগ্বিদিক্ নিবাসিত হইত। তাঁহার শুভাগমনের নিদর্শন দৃষ্টে গ্রামের স্ত্রীপুরুষ

বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, পুষ্পমালা উপহার লইয়া তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিতে বাহির হইত । তাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া যাইত যে, কে তাঁহার আতিথ্য করিবে । অনুগ্রহ করিয়া আজ আমার গৃহে পদার্পণ করুন, আপনার জন্ম, আপনার অনুচরবর্গের জন্ম আহার প্রস্তুত,—এই বলিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া, উপস্থিত জনের মধ্যে কোন গৃহস্থামী তাঁহাকে অনুচরবর্গসহ গৃহে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের আতিথ্য করিতেন । আহার শেষ হইলে বুদ্ধদের সমবেত লোকসকলকে উপদেশ দিতেন । শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কেহ বা গৃহস্থের উপদেশ গ্রহণ করিত ; আর যাহাদের তদপেক্ষা উচ্চাভিলাষ, তাঁহারা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতেন । পরে উঠিয়া তিনি নিজ বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিতেন ; সেখানে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত দিবসের গতাগত কার্যসকল স্থিরভাবে পর্যালোচনা করিতেন । তৎপরে দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ উপদেশ দিতেন “সত্যপরায়ণ হও, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও । পৃথিবীতে বুদ্ধদর্শন দুর্লভ । বুদ্ধের উপদেশ লাভের সুযোগ অবহেলা করিও না ।” পরে তাঁহার পুষ্পবাসিত কক্ষে গিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতেন । সন্ধ্যার সময় ইচ্ছা হইলে স্নান করিতেন । তদনন্তর লোকেরা আশপাশের গ্রাম বা নগর হইতে আসিয়া তাঁহার বাসস্থানে সন্মিলিত হইলে পর, তিনি তাহাদের ধীশক্তি ও ধারণা অনুসারে ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেন ; তাহারা তাঁহাকে আপন আপন আধ্যাত্মিক অবস্থা জ্ঞাপন করিত ; তাহার বাহা আনিবার ইচ্ছা, তিনি তাহা

পূর্ণ করিতেন ; বাহার যে কোন বিষয়ে সংশয়, তাহা মিটাইয়া দিতেন । এইরূপে একপ্রহর রাত্রি কাটিয়া যাইত ; পরে সকলকে সুমধুর সাস্ত্রনা বাক্যে বিদায় দিতেন । অবশিষ্ট কাল কতক ধ্যান, কতক বা নিদ্রায় যাপন করিতেন, এবং প্রত্যুষে উঠিয়া কাহার কি আবশ্যক, কাহাকে কিরূপ উপদেশ দিতে হইবে, কি উপায়ে লোকের দুঃখ মোচন ও কুশল বর্দ্ধন করিবেন, এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া দিবসের কার্য স্থির করিতেন ।

মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বুদ্ধের মৃত্যুর পূর্বে শেষ তিন মাসের ঘটনাবলীর সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে । ইহা হইতে এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ হইতে দেখা যায় যে, বর্ষার চারিমাস ছাড়া অবশিষ্ট কয়েক মাস তিনি প্রায় প্রত্যহ আট দশ ক্রোশ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন । ইহাই তাঁহার বল, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয় । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রবুদ্ধ হইবার পর প্রায় ৪৫ বৎসর তিনি শ্রাবস্তী, বৈশালী, রাজগৃহ, কুশীনগর, এই সকল প্রদেশে স্থায় মতানুযায়ী ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়ান । এইরূপে দক্ষিণ-পূর্ব পাটনা হইতে উত্তর-পশ্চিম সরস্বতী পর্য্যন্ত এক দিকে প্রায় দেড়শত ক্রোশ, অন্য দিকে পঞ্চাশ ক্রোশ ব্যাপিয়া. তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করেন এবং এই বিস্তীর্ণ প্রদেশে রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, বহুবিধ জনপদের সমাগমে তিনি মানব-প্রকৃতি—মনুষ্যের ভাবগতি, রীতিনীতি, সুখদুঃখ, আশা ভয়সা ভলাইয়া বুঝিবার বিস্তর সুযোগ পাইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই ।

বুদ্ধদেবের যখন অশীতি বৎসর বয়ঃক্রম, তাঁহার ধর্ম-প্রচারের প্রারম্ভ হইতে চতুশ্চত্বারিংশৎ বৎসর, তখন তিনি পাটলিপুত্র, আধুনিক পাটনা নগরের স্থানে গঙ্গা পার হইলেন । সেখানে গিয়া দেখেন রাজা অজাতশত্রুর মন্ত্রীগণ পাটলিপুত্রের দুর্গ নিৰ্ম্মাণে ব্যস্ত, মগধের ভাবি রাজধানীর সেই প্রথম পত্তন । তাহার রাজ্যশ্রী সহস্রবৎসর স্থায়ী হইবে, বুদ্ধ এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া যান । সেখান হইতে বৃজ্জিজাতীয় লিচ্ছবিদের আবাস-স্থান বৈশালী গমন পূর্বক অম্বপালী গণিকার আম্রবনে বিশ্রাম করেন ও নাগরিকদের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া গণিকার ভবনে গিয়া আহারাদি করেন । সেই সময় অম্বপালী তাঁহার উত্তানগৃহ বৌদ্ধ সঙ্ঘে উৎসর্গ করে । বৈশালীর কূটাগারে বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মের সারতত্ত্বগুলি, যথা চারপ্রকার ধ্যান, চতুঃশমপ্রধান ধর্ম, চারি ঋদ্ধিপাদ, আধ্যাত্মিক পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, অষ্টাঙ্গ মার্গ ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ দিলেন ও পরদিন ভিক্ষার পর বৈশালী ছাড়িয়া চলিলেন । বৈশালী হইতে তিনি ভণ্ডগ্রাম ও আর কতকগুলি গ্রাম অতিক্রম করিয়া অবশেষে কুশীনগর যাত্রা করেন—ইহা কপিলবস্তু হইতে পূর্বদিকে প্রায় ২০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত । কুশীনগর যাত্রাকালে 'পাবা' গ্রামের প্রান্তবর্তী আম্রবনে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন । এই ভূমি চুন্দ নামক জনৈক কর্ম্মকার বৌদ্ধ সমাজে দান করিয়াছিলেন । চুন্দ ভিক্ষুকদের জন্ম তণ্ডুল ও বরাহমাংস প্রস্তুত করিল । প্রবাদ এই যে, সেই মাংস ভোজন করিয়াই বুদ্ধদেব পীড়িত হন এবং এই পীড়াতেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয় । অপরাহ্নে কুশীনগরের পথে কিয়দূর চলিয়া

শান্তিবোধ হওয়াতে তিনি বসিয়া পড়িলেন এবং আনন্দকে বলিলেন—“আমার বড় তৃষ্ণা লাগিয়াছে, জল আনিয়া দেও।” আনন্দ জল আনিয়া দিলেন। অল্প দূরে ককুখা নদী বহিত ছিল—তীরে পৌঁছিয়া নদীতে শেষবারের মত স্নান করিয়া লইলেন। মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া এবং লোকে পাছে চূন্দের প্রতি দোষারোপ ও কটুবাক্য প্রয়োগ করে এই আশঙ্কায় আনন্দকে বলিলেন “আমার মৃত্যুর পর চূন্দকে বলিও সে বড়ই পুণ্যফল উপার্জন করিয়াছে ; জন্মান্তরে তাহার কল্যাণ হইবে। তাহার প্রদত্ত অন্নাহার করিয়া আমি মৃত্যুরূপ আরোগ্য লাভ করিলাম, নির্বাণমুখে উপনীত হইলাম। আমার বুদ্ধত্বের পূর্বে সূজাতার আত্মিত্যা সংকার, আর এক্ষণে এই চূন্দের পক্ষায় উপহার—এ দুইই আমার সমান আদরণীয়। এ বিষয়ে যদি কোন ব্যক্তি সন্দেহ প্রকাশ করে, কহিও যে এ কথা আমার নিজের মুখ হইতে শুনিয়াছ।” অনেক কক্ষে আস্তে আস্তে কুশীনগরসমীপস্থ হিরণ্যবতী নদীতীরে পৌঁছিয়া গৌতম তথায় কিয়দণ্ড বিশ্রাম করিলেন, এবং মল্লদের এক শালবনে গিয়া বৃক্ষতলে ডান কাতে শয়ান থাকিয়া মৃত্যুর পর আপনার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে আনন্দের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার সময় আনন্দের বিলাপধ্বনি শুনিয়া বলিলেন “ভাই আনন্দ, আমার জন্ম শোক করিও না। আমি তোমাদের পূর্বেই বলিয়াছি, যার জন্ম তারই মৃত্যু—যার বৃদ্ধি তারই ক্ষয়—এমন কি কোন জিনিস আছে যাহার বিনাশ নাই ? শীঘ্রই হউক বিলম্বেই হউক, এক সময়ে প্রিয়জনদের ছাড়িয়া বাইতেই হইবে। কিন্তু আমার



মৃত্যু হইল ভাবিও না । আমার প্রচারিত সত্যসকল, আমার উপদেশ ও অনুশাসন আমার পশ্চাতে রাখিয়া যাইতেছি—সেই সকল আমার প্রতিনিধি—সেই তোমাদের পথ প্রদর্শক । আনন্দ, তুমি অতি যত্নে আমার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছ—আশীর্ব্বাদ করি তোমার কল্যাণ হউক । দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ধর্ম্মপথে চল, বিষয়াসক্তি, অহমিকা, অবিद्या হইতে পরিত্রাণ পাইবে । যতদিন আমার শিষ্যেরা শুদ্ধাচারী হইয়া সত্যপথে চলিবে, ততদিন আমার ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রচলিত থাকিবে । পাঁচ সহস্র বৎসর পরে যখন সত্যজ্যোতিঃ সংশয়-মেঘজালে আচ্ছন্ন হইবে, তখন যোগ্যকালে অন্যতর বুদ্ধ উদিত হইয়া আমার উপদিষ্ট ধর্ম্ম পুনরায় উদ্ধার করিবেন । শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন “সে বুদ্ধের নাম কি ?” বুদ্ধ উত্তর করিলেন “মৌলি”

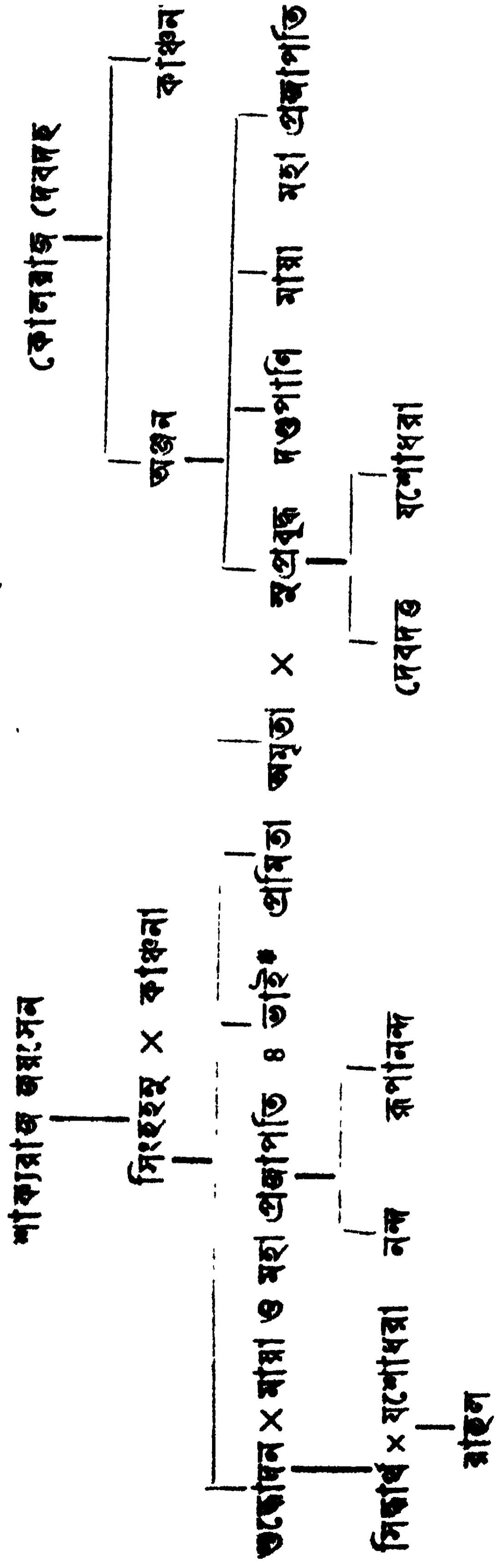
পরদিন প্রাতঃকালে তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন বুদ্ধের প্রতি কাম্পেরা কিছু সন্দেহ আছে কি না । তদুত্তরে আনন্দ উত্তর করিলেন—“গুরুদেব ! আশ্চর্য্য এই যে, এত লোকের মধ্যে কাহারো একটি বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই । সত্যের প্রতি, বুদ্ধের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি আমাদের সকলেরই বিশ্বাস অটল, কাহারো মনে তিলমাত্র সংশয় নাই ।” পরে বুদ্ধদেব কালান্তর লক্ষ্য থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন “যার জন্ম, তার মৃত্যু ও মৃত্যু অবশ্যস্তাবী—সত্যই মৃত্যুঞ্জয় হইয়া চিরকাল বাস করিবে । তোমরা যত্নপূর্ব্বক সত্যধর্ম্ম পালন করিয়া আপন মুক্তিসাধন কর ।” এই কয়েকটি কথা বলিয়া তিনি গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া নির্ব্বাণ রাজ্যে প্রয়াণ করিলেন । তাঁহার নির্ব্বাণ



সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে দু্যলোক ও ভুলোক কম্পিত হইল—  
প্রচণ্ড বজ্রধ্বনি গগন ভেদ করিয়া উঠিল। ব্রহ্মা সহাস্পতি এবং  
শক্রের কণ্ঠ হইতে আকাশবাণী হইল—“হায়! বুদ্ধদেব মর্ত্য  
হইতে অন্তর্হিত হইলেন—পৃথিবীর আলোক নিবিয়া গেল।”

তদনন্তর চক্রবর্তী নৃপতির মরণোত্তর যে অস্ত্যোষ্টি-বিধান  
শাস্ত্রবিহিত, সেই বিধানানুসারে বুদ্ধদেবের অস্ত্যোষ্টিক্রিয়া  
কুশীনগরের প্রধান প্রধান নাগরিক কর্তৃক যথাবিধি অনুষ্ঠিত  
হইলে, তাঁহার দেহাবশেষ গ্রহণ করিতে অনেকানেক রাজ্য হইতে  
ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই দক্ষদেহের ভঙ্গরাশি  
দুইটি ভাগে বিভক্ত হইল এবং প্রত্যেকের উপর এক একটি স্তূপ  
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপিত হইল।

# বংশাবলী।



বৌদ্ধধর্ম

\*১। গুরুদান

নেবদত্ত      আনন্দ

২। অযতোদন

মহানাম      অনিরুদ্ধ

৩। ধোতোদন

৪। ষনিতোদন



## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।

### বৌদ্ধ ইতিহাসের কালনির্ণয় ।

বুদ্ধদেব ঠিক কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কোন্ সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়, বৌদ্ধেরা কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত এদেশে বিদ্যমান ছিলেন ও কোন্ সময়েই বা এখান হইতে অন্তর্হিত হন, আমাদের সকলেরই সে বিষয়ে জ্ঞানিবার কৌতূহল হইতে পারে । দুর্ভাগ্যবশতঃ কাল নিরূপণের বেলায় আমাদের প্রাচীন ইতিহাস হইতে সাড়াশব্দ কিছুই পাওয়া যায় না । যুক্তি ও অনুমান, শিলালিপি ও প্রোথিত ধাতুমুদ্রা ইত্যাদি সাধন ও উপকরণ হইতে বাহা কিছু স্থির করা যায়, তাহাতেই একপ্রকার সম্মুখ থাকিতে হয় । তত্রাপি বৌদ্ধ ধর্মের উদয়ান্ত, উন্নতি অবনতির কাল কতকগুলি বিশেষ কারণ বশতঃ নিরূপণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ । সেই সকল কাল-নির্ণায়ক নিদর্শন সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে ।

প্রথমতঃ, বুদ্ধ শাক্যসিংহের মৃত্যুকাল যতদূর জানা যায়, খুব সম্ভব খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে ।

দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধের মৃত্যুর পর বৌদ্ধদের চারিটি মহাসভা হয় ; তাঁহাদের কালও একপ্রকার নির্দেশ করা বাইতে পারে । তন্মধ্যে ১৫ রাজ্যাধিপতি অশোক রাজার মহাসভা সর্বাপেক্ষা

প্রসিদ্ধ । এই অশোক রাজা গ্রীকদের সাম্রাজ্যকোতস্ (চন্দ্রগুপ্তের) পৌত্র ; পাটলিপুত্র (পাটনা) ইহার রাজধানী । অশোক রাজার পূর্বে দুইটি বৌদ্ধ সভা হয় । বুদ্ধের মরণোত্তর অনতিদীর্ঘকালবিলম্বে রাজগৃহে রাজা অজাতশত্রুর আশ্রয়ে প্রথম সভায় বৌদ্ধশাস্ত্র প্রস্তুত হয় । ঐ শাস্ত্র তিন প্রকার :—সূত্রপিটক (বুদ্ধের কথাবার্তা), বিনয়পিটক (ব্যবহার ধর্ম) এবং অভিধর্মপিটক (দর্শনশাস্ত্র) ; এই তিনের সমবেত নাম ত্রিপিটক । (ভারতবর্ষের ভূপতিগণের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে প্রথমে মগধরাজ বিম্বিসার, পরে সম্রাট অশোক খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করেন । তাঁহার উৎসাহপ্রভাবে বৌদ্ধধর্মের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হয় । তাঁহার অনুশাসন-লিপিসকল, প্রোথিত স্তম্ভ, গিরি ও গিরি-গুহায় খোদিত, কাবুল নদীর উত্তর হইতে দক্ষিণে মহীশূর পর্য্যন্ত—পূর্বে উড়িষ্যা হইতে পশ্চিমে গির্গার (কাঠেওয়ার) পর্য্যন্ত—পূর্বাপর তোয়নিধির মধ্যস্থ সমুদয় ভারতবর্ষে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । এই সকল লেখা আবিষ্কৃত এবং অর্থ সহিত অনুবাদিত হইয়াছে । এই সকল অনুশাসনপত্রে অশোকরাজার স্বধর্ম্মা-নুরাগ, উদার নিঃস্বার্থতা, দয়া দাক্ষিণ্য অহিংসাদি গুণের যে দেদীপ্যমান প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি কেন তিনি ধর্ম্মাশোক নামে বিখ্যাত হইলেন । তাঁহার একটি খোদিত স্তম্ভ বুদ্ধদেবের জন্মভূমি কপিলাবস্তুর চিহ্ন স্বরূপ নির্মিত হয়, তাহা তিন চারি বৎসর হইয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে ।

তৃতীয়তঃ সেকন্দর সা'র ভারত আক্রমণের পর হইতে যে কয়েক জন গ্রীকদেশীয় লোক ভারতবর্ষ পরিদর্শনার্থ আগমন করেন, তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতে তৎকালবর্তী ধর্ম ও রীতিনীতি বিষয়ক কিছু কিছু জ্ঞানলাভ হয়। ইহাদের মধ্যে গ্রীক দূত মেগাস্থিনীস একজন প্রসিদ্ধ। তিনি প্রায় খৃষ্টাব্দের ৩০০ বৎসর পূর্বে মগধ রাজধানী পাটলিপুত্রে কয়েককাল বাস করেন এবং তাঁহার সমসাময়িক ভারতের সামাজিক অবস্থা-বৃত্তান্ত অল্পবিস্তর লিখিয়া যান। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ—এই দুই শ্রেণীর লোকের বিষয় উল্লেখ করেন; এবং বৌদ্ধদের কথা প্রসঙ্গে বলেন যে, কতকগুলি শ্রমণ অর্থাৎ সন্ন্যাসী কেবল দয়াধর্মের অনুষ্ঠান উদ্দেশে লোকের চিকিৎসা করিয়া বেড়ান; তাহারো নিকট কিছু গ্রহণ করেন না; অপর কতকগুলি ধর্মপ্রচারক লোকদিগকে নরকভয় প্রদর্শনপূর্বক ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। কোন কোন সংস্কৃত নাটক হইতে এই বাক্যগুলির সত্যতার পোষকতা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চতুর্থতঃ, চীন পরিব্রাজকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত। চীনদেশীয় অনেক তীর্থযাত্রী তীর্থভ্রমণ উদ্দেশে খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভ্রমণবর্ষে আগমন করেন। বুদ্ধগয়াতে তাঁহাদের খোদিত লিপি বিদ্যমান আছে ও তাহার মধ্যে অনেকের নামও সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই সকল যাত্রীর মধ্যে কাহিয়ান ও হিউ-এন্ সাং আমাদের বিশিষ্টরূপে পরিচিত। তাঁহাদের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই শতাব্দীর প্রভুত্ব সম্বন্ধীয় যে মহান্

আবিষ্কার—বুদ্ধজন্মভূমি কপিলবস্তুর স্থাননিরূপণ—এই দুই চীন পরিভ্রাজকের লিখিত বিবরণই তাহার সাধনীভূত । ফাহিয়ান ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ হইতে যাত্রা করিয়া ৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তীর্থ ভ্রমণ করেন; এবং হিউএন্ সাং ৬৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পরিভ্রমণ পূর্বক ভারতবর্ষের হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মসংক্রান্ত নানা বিষয় লিখিয়া যান । তাঁহার উভয়েই গাঙ্কার, তক্ষশিলা, মথুরা, কাশ্যকুজ, শ্রাবস্তী, কপিলবস্ত, বৈশালী, মগধ, পাটলিপুত্র, নালন্দ, রাজগৃহ, গয়া, বারাণসী, তাম্রলিপ্ত, কোশল প্রভৃতি বিবিধ স্থানস্থিত বিহার ও বিহারবাসী বহুসংখ্যক ভিক্ষুগণের দর্শন করেন । হিউএন্ সাং তদতিরিক্ত প্রয়াগ, সারনাথ, উৎকল, কলিঙ্গ, ভরোচ, মালব, উজ্জয়িনী, দ্রাবিড়, কাঞ্চীপুর, মলয়, কোঙ্কণ, গুজরাট, কচ্ছ, মূলতান, খানেশ্বর, প্রভৃতি বিবিধ স্থান পরিভ্রমণ পূর্বক প্রায় সমগ্র ভারতভূমিতেই বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত দেখেন । কিন্তু ফাহিয়ানের সময় অপেক্ষা তাঁহার সময়ে এ ধর্মের কিয়ৎপরিমাণে হীন দশা উপস্থিত হইয়াছিল দেখা যায় । ফাহিয়ান যে সমস্ত বৌদ্ধতীর্থ ও বৌদ্ধ দেবালয়ের কার্য সুন্দররূপে পরিচালিত দেখেন, হিউএন্ সাং তাহার মধ্যে অনেকানেক স্থান ও তদতিরিক্ত অন্যান্য বহুতর বৌদ্ধক্ষেত্র ভগ্ন, ভগ্নপ্রায়, বা একেবারে শূন্য দেখিতে পান, এবং কোন কোন স্থান ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্মের বহু হইতে নির্মূল হইয়া হিন্দুধর্মের অধীন হইতেছে দেখিয়া যান । ঐ সময় হইতে খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্মের অবনতিকাল । সপ্তম শতাব্দীতে কাশ্যকুজা-



ধিপতি শ্রীহর্ষ পূর্বাবলম্বিত বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈনধর্ম গ্রহণ করেন। ঐ সময়ের পর যে জৈন সম্প্রদায়ের প্রাচুর্য হয়, মহীশূর, বিজয়নগর, আবু প্রভৃতি অনেক স্থানের খোদিত লিপিতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাদের যেমন উন্নতি হইতে লাগিল, বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সেইরূপ অবনতি হইয়া আসিল। এদিকে আবার হিন্দুধর্ম তাহার সহস্র-বৎসরব্যাপী ঘুমবোর হইতে উত্থান করিয়া বৌদ্ধধর্মের উচ্ছেদ-সাধন-ব্রতে কটিবদ্ধ হইলেন। খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে এবং তাহার পরেও কিছুদিন বৌদ্ধেরা যদিও ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়েন সন্দেহ নাই। চতুর্দশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম একেবারে অস্তিত্ব বোধ হয়।

পণ্ডিত প্রবর কুমারিল ভট্ট এবং শঙ্কর ও রামানুজ—ইহারা এই পুনরুদ্ধারিত হিন্দুধর্মপ্রণালীর প্রধান প্রবর্তক। কুমারিল ভট্ট বৌদ্ধসম্প্রদায়ের একজন প্রবল বিপক্ষ ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। তিনি নিজ গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ বৌদ্ধ-মতের প্রতিবাদ করেন এবং বৌদ্ধদের প্রতি যারপরনাই বিদেহ প্রকাশ করিয়া যান। বেদভাষ্যকার সুবিখ্যাত সায়ণাচার্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য লিখিয়াছেন, কুমারিলের সহায়ভূত সুধম্মা রাজা বৌদ্ধসম্প্রদায় সংহার উদ্দেশে এই আদেশ প্রচার করেন যে,—

আসেতোরাভুযারাদ্ধে বৌদ্ধানাং বুদ্ধবালকান্ ।

ন হস্তি বঃ স হস্তব্যো ভৃত্যানিত্যশার্পণঃ ॥

রাজা স্বকীয় কার্যকর্তাদিগকে আদেশ করিলেন, একদিকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, অপরদিকে হিমালয় পর্বত, ইহার মধ্যে আবালবৃদ্ধ যত বৌদ্ধ আছে, সকলকে সংহার কর। যাহারা বধ না করে, তাহারা বধ্য ।

শঙ্করাচার্য্য কুমারিলের উত্তরকালীন লোক, তিনিও বৌদ্ধবিদ্বেষী বলিয়া প্রখ্যাত । যেরূপে তিনি হিন্দুসমাজে ধর্ম-বিপ্লব উপস্থিত করেন, তাহা প্রসিদ্ধই আছে । শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার দত্ত তাঁহার প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় নামক গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে শঙ্করের কালনির্ণয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় । তিনি বলেন, চীন-দেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন্ সাং সপ্তম খৃষ্টাব্দের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে অনেক বর্ষ অবস্থিতি করিয়া সর্বস্থান পরিভ্রমণ পূর্বক ভারতবর্ষীয় জ্ঞান, ধর্ম ও অন্যান্য নানাবিষয়ে যেরূপ সবিশেষ বর্ণন করেন, তাহাতে ঐ সময়ে বা তাহার কিছু পূর্বে যদি হিন্দুসমাজে তাদৃশ ধর্মবিপ্লব সঙ্ঘটিত বা আন্দোলিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণে সে বিষয়ের প্রসঙ্গ না থাকা কোনরূপেই সম্ভব নয় । যখন ঐ ভ্রমণ-বিবরণে সেরূপ ধর্মআন্দোলনের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই, তখন ঐ সময়ের উত্তর কালে কোন সময়ে শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাব সর্বতোভাবে সম্ভব । যতদূর জানা গিয়াছে শঙ্কর ভাষ্য রচনার কাল খৃষ্টাব্দ ৮০৪ ।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

দর্শন, নীতি, পরকাল ও নির্বাণ ।

উপরে বুদ্ধের জীবন-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে; এখন বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক । শাক্যমুনি প্রবুদ্ধ হইয়া যে কার্যকারণশৃঙ্খল ( দ্বাদশ নিদান ) ধ্যানযোগে উপলব্ধি করেন, তাহার অর্থ কি ? এই দ্বাদশ নিদানের অনুক্রম একের পর এক যেরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা সাধারণের বিচার্য । মোটামুটি এই দেখা যাইতেছে যে, অবিজ্ঞা শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত— অবিজ্ঞাই দুঃখোৎপত্তির মূল কারণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে । বেদান্ত-দর্শনের সহিত এই বিষয়ে বৌদ্ধশাস্ত্রের ঐক্য দেখা যাইতেছে । বেদান্ত মতেও অবিজ্ঞা হইতে তাবৎ ভবযন্ত্রণার উৎপত্তি । এই মহারিপু দমন করা উভয় শাস্ত্রের উদ্দেশ্য । তবে বেদান্তের অবিদ্যা আর বুদ্ধের অবিজ্ঞা এক নহে । বৈদান্তিকেরা বলেন, জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এই অবিদ্যার ব্যবধান দূর হইলে “সোহম্” বলিয়া যে অভেদ জ্ঞান অন্বে, তাহা হইতেই জীবব্রহ্ম একীকরণ সংঘটিত হয় । অবিদ্যা ধারা আচ্ছাদিত ব্রহ্মই জীব । অবিদ্যারূপ আবরণের উচ্ছেদ হইলে জীব ব্রহ্মরূপ প্রাপ্ত হন । সেই আবরণচ্ছেদেই

মুক্তি । বুদ্ধের অবিদ্যা স্বতন্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই । অবিদ্যা সেই, যাহা জীবনের প্রকৃত তত্ত্ব জীবের নিকট হইতে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে—সেই যত অনর্থের মূল । যদি কোন ব্যক্তির রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তাহা হইলে সে ভ্রম অপনীত হইলে সর্পভয়ও দূর হয়—এও সেইরূপ । এই অবিদ্যার অপগমে দুঃখাৎপত্তির বাস্তবিক কারণ আমাদের জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত হয় । সেই কারণ কি—না বিষয়তৃষ্ণা—তৃষ্ণা হইতে আসক্তি—আসক্তি হইতে জন্ম—তাহার সঙ্গে সঙ্গেই রোগ শোক দুঃখ কষ্ট । এই জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াই মুক্তি । অবিদ্যা দূর হইলে তাহার নীচের বন্ধনগুলি একে একে টুটিয়া যায় ; এক কথায়, আমার আমিত্ব ঘুচিয়া যায়, জন্মবন্ধন ছিন্ন হয়, এবং নির্ব্বাণপথ উন্মুক্ত হয় ।

বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পর বুদ্ধদেব যে চতুর্শতাসত্যের উপদেশ দিলেন, তাহাই বা কি ? ইহাতে নূতন কথা কিছুই নাই । ( ১ ) জীবের দুঃখ ( ২ ) দুঃখের কারণ ( ৩ ) দুঃখের মূলোচ্ছেদ ( ৪ ) তাহার উপায় নির্দ্ধারণ এবং উপায় চেষ্টা । উপায় নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া অষ্ট মহামার্গরূপ বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র বিবৃত হইয়াছে ।

বৌদ্ধধর্ম ও সাংখ্য মতের অনেক বিষয়ে পরস্পার ঐক্য দেখিয়া অনেকে বৌদ্ধধর্ম সাংখ্যমত হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিবেচনা করেন । আবার কেহ কেহ বলেন, কাপিল সাংখ্যদর্শন এই বৌদ্ধ শাস্ত্রের অমুদর্শন । কাপিল ও বুদ্ধ উভয়েই নিরীশ্বরবাদী । বৌদ্ধ ও সাংখ্য উভয় মতেই সংসার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময়, সেই

দুঃখ হইতে জীবের পরিত্রাণসাধন-চেষ্টা ঐ উভয় মত প্রবর্তনেরই মূলসূত্র । বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলবস্তু, বুদ্ধের মাতার নাম মায়া ( প্রকৃতি )—এ দুইটিও সাংখ্য মতের পরিচায়ক । বৌদ্ধদের এইরূপ এক উপাখ্যান আছে যে, বুদ্ধ পূর্বজন্মে কপিল ছিলেন । শাক্যবংশীয় নৃপতির আশ্রয়লাভের নগর নির্মাণের স্থান-নিরূপণ করিতে গিয়া কপিল ঋষির কুটার দর্শন ও তাঁহার সন্তিত সাক্ষাৎ করিলে পর, তিনি তাঁহাদিগকে একটি স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন, সেই স্থানে নগর নির্মিত হইলে, কপিলের নামানুসারে তাহার নাম কপিলবস্তু হইল । সে যাহা হউক, এই উভয় মতের যেমন সৌসাদৃশ্য আছে, তেমনই অনেকাংশে ভিন্নতাও দৃষ্ট হয় । উভয়েই একস্থান হইতে যাত্রাবস্তু করিয়াছেন, উভয়েই প্রশ্নান ভূমি এক—মনুষ্যের দুঃখসাধন; কিন্তু উভয়েই স্বতন্ত্র এবং গন্তব্যপথও অনেক ভিন্ন । ঐকান্তিক দুঃখনিবৃত্তি উভয়েরই লক্ষ্য, কিন্তু সে লক্ষ্য কিসে সিদ্ধ হয়? কপিল মনি দুইটি মূলতত্ত্ব মানিয়া চলেন, প্রকৃতি আর পুরুষ । সঙ্ঘরজস্বমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি নর্তকীর স্থায় পুরুষের সম্মুখে সংসাররূপ মায়া খেলা খেলিতেছেন, পুরুষ নিজদর্পণে তাহা দর্শন করিতেছেন । প্রকৃতির এই মায়াময়ী প্রতিকৃতি অপসারিত করিয়া, প্রকৃতির অজ্ঞানরচিত আবরণ জীর্ণ বস্ত্রের স্থায় কেলিয়া দিয়া পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্ররূপে আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন, তখন সেই মায়া খেলা থামিয়া যায়; তখন তিনি দুঃখরেশ, জন্মমৃত্যু

আছে, তাহার একটি বলিয়া এই ভাগ শেষ কাণ্ড করেন অশোক রাজার পুত্র কুনালের আখ্যান; কুনালচরিত্র কন্যার সহিষ্ণুতা গুণের দৃষ্টান্তমূল। তাঁহার বিমাতা ভিষ্য-রক্ষিতা তাঁহার শ্রীসৌভাগ্য দর্শনে ঈর্ষান্বিতা হইয়া তাঁহাকে দূর দেশে নির্বাসন করিয়া দেন, ও তৎকাল রাজকর্মচারীর প্রতি কুমারের চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলা হয়, এইরূপ রাজ-নামাঙ্কিত এক আশ্রয়পত্র প্রেরণ করেন। কেহ এই অঘোর কৃত্য করিতে প্রস্তুত হয় না; অবশেষে একজন নির্দয় নিষ্ঠুর চণ্ডালের সাহায্যে এই নৃশংস কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। যখন সেই ষাণ্ডক সাড়াশী দিয়া তাঁহার দুই চক্ষু একে একে টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, তখন লোকদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল, কিন্তু রাজকুমার একটি কাতর শব্দ করিলেন না—চক্ষু দুটি হাতে লইয়া কহিলেন “আমার চক্ষুচক্ষু গেল, তাহাতে কি? এখন আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিল। রাজা আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু আমার রাজা ধর্ম, তিনি কখনো আমায় পরিত্যাগ করিবেন না।” রাণী এই কার্য্যের আদেশ করিয়াছেন শুনিয়া কহিলেন, “মহারাণী আমার এত উপকার করিয়াছেন, তাঁর মঙ্গল হউক। আমি চক্ষু হারাইয়াছি সত্য, কিন্তু যে কমা কারুণ্য শিক্ষা করিয়াছি, সেই আমার মহৎলাভ; তার তুলনায় এ ক্ষতি কিছুই নহে।” পরে তিনি ভিখারীর বেশে তাঁহার পিতার রাজধানীতে উপনীত হইলেন। এক রাতে রাজবাটীর সম্মুখে বীণা বাজাইয়া গান করেন, রাজা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেই অন্ধকে দেখিয়া পুত্র বলিয়া



স্থান অন্বেষণ করে—বিষয়কোলাহল হইতে নিবৃত্ত হইয়া সেই আনন্দস্বরূপের সহবাসে আনন্দরস পান করিতে উৎসুক হয় । “সাধন দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে স্ববশে আনিলাম, কিন্তু ভজন দ্বারা ভক্তবৎসল ভগবানের প্রেমামৃত-রস পান করিলাম না, তবে সে সাধনের ফল কি ? চিত্তকে বশীভূত করাই বা কি জন্ম ?” বৌদ্ধধর্ম সাধনের ধর্ম, তাহাতে ভজনের কোন ব্যবস্থা নাই, এই হেতু বৌদ্ধধর্ম অঙ্গহীন । এই কারণে কালসহকারে নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্মের যে অবস্থান্তর ঘটিয়াছে, তাহা জানাই আছে ; তাহার জন্মভূমি এই ভারতভূমি হইতে তাহার বিহীন হইবার কারণও এই । বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া নীতি-প্রণালী যেমনই আবিষ্কৃত করুন, কিন্তু দেখা যায় অনেকানেক বৌদ্ধক্ষেত্রে যোর পৌত্তলিকতা বিলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে । যে বুদ্ধদেব ঈশ্বরের প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত মুখে আনিতে কুণ্ঠিত হইতেন, সেই বুদ্ধদেবের মতাবলম্বী সাধকেরা তাঁহাতেই ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন । “প্রতিমা পূজা, বুদ্ধ প্রভৃতির অস্থি দস্তাদির অর্চনা এবং নানাবিধ বাক্সা মহোৎসব অবাধে চলিয়া আসিতেছে । কাহিয়ান খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমে অনেকানেক বুদ্ধপ্রতিমূর্তি দেখিয়া যান । কেবল শাক্য বুদ্ধ নয়, এক এক দেবালয়ে অগ্ন্য অগ্ন্য বৌদ্ধদেবতার প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ও অর্চিত হইয়া থাকে ।” এদিকে আমরা দেখিতে পাই যে বৌদ্ধেরা নিরীশ্বর এবং দেবপ্রসাদ হইতে পরাশ্রয়—ওদিকে দেখি যে, বৌদ্ধেরা মনুষ্যপূজা এবং মূর্তিপূজার আদি গুরু । বুদ্ধদেব যেমনি



পৃথিবী হইতে অস্তর্দান করিলেন, তাহার কিয়ৎপরে ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে সীমান্তুর পর্য্যন্ত শত স্থান শত দেবদেবীর প্রস্তর মূর্তিতে পরিকার্ণ হইয়া উঠিল, তার সাক্ষী ইলোরা, অজন্তা, খণ্ডগিরি, শ্রীক্ষেত্র ; বুদ্ধগয়ায় তারাদেবী ও বাগীশ্বরী দেবী, বৈশালীতে ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ ও বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, নালন্দ বিহারে অবলোকিতেশ্বর, তারা, ত্রিশিরা, বজ্রবরাহী, বাগীশ্বরী ইত্যাদি অনেকানেক বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রতিমূর্তি ও মন্দির অনেক স্থানে অজ্ঞাপি দেখিতে পাওয়া যায়। দেবপ্রসাদ হইতে বিচ্ছিন্ন আত্মপ্রভাবের নিরতিশয় কঠোর সাধনার যে বিসদৃশ পরিণাম, তাহা আর একদিক দিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্মসাধন ক্রমে উচ্ছ্বল হইয়া যথেষ্টাচারিতায় পরিণত হইল। যথেষ্টাচারিতার বলে কৃত্রিম সিদ্ধি উপার্জনের প্রণালীই তন্ত্রশাস্ত্র—কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের গণ্ডীর ভিতরে বিকট বীভৎস তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লাভ করিল। “হিন্দু মতানুযায়ী সিদ্ধ যোগীরা যেমন অগ্নিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি প্রভৃতি আট প্রকার ঐশ্বর্য লাভ করেন লিখিত আছে, সেইরূপ বৌদ্ধদিগেরও বিশ্বাস এই যে, ঐ সম্প্রদায়ী সিদ্ধবান্ধুরা অশেষরূপ অলৌকিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়া অতীব অদ্ভুত কার্যসমুদয় সম্পাদন করিতে সমর্থ হন,—যেমন বায়ু মধ্যে সঞ্চরণ, জলের উপর গমনাগমন, গৃহসম্বলিত পর্বত ও সমুদ্র প্রকম্পন, পর্বত ও পৃথিবীর গর্ভদর্শন, ইচ্ছাবলে বায়ুপ্রবাহ উৎপাদন, অগ্নিধারা আনয়ন, নক্ষত্র বা গুপ্ত সম্পত্তি উদগার করণ, ইত্যাদি।”

যদি জিজ্ঞাসা করেন বৌদ্ধশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব—তাহার বীজমন্ত্র কি ? তাহার উত্তর “কর্মফল” । কতকগুলি দর্শনতত্ত্ব হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের সাধারণ সম্পত্তি—এ তত্ত্বটিও তাহারই মধ্যে একটি । স্মৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে জীবের সদসদগতি, হিন্দু শাস্ত্রেরও এই শিক্ষা, এই উপদেশ—ইহাতে বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব নাই । কেহ রাজা কেহ চাষা হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে—কেহ ধনী কেহ দরিদ্র—কেহ সুখস্বচ্ছন্দে দিনযাপন করিতেছে, কেহ অকারণ কষ্টভোগ করিতেছে—অগ্নায় উৎপীড়ন সহ্য করিতেছে; এরূপ অবস্থাবৈষম্যের কারণ কি ? জীবনে এই দুঃখশোক, পাপতাপ, অগ্নায় অত্যাচার—এ সকলেরই মীমাংসা “কর্মফল” । ঐহিকে যে অমঙ্গলের কারণ অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না, পূর্বজন্মকৃত ফলাফল সেই রহস্য ভেদ করে—সেই প্রহেলিকার উত্তর বলিয়া দেয় । তবে এই কর্মের প্রাধান্য যেমন বৌদ্ধধর্মে, তেমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না । তাহার মতে কর্মোত্তমই জীবন—কর্মই দেবতার স্থলাভিষিক্তি বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না । আর সকলি ক্ষয়শীল, মৃত্যুর অধীন—কেবল কর্মবলের উপর মৃত্যুর কোন অধিকার নাই ।) বুদ্ধের উপদেশ এই—“যেমন বীজ বপন করিবে, তাহার ফলও তদনুরূপ হইবে ।” কর্মবন্ধন কেহই অতিক্রম করিতে পারে না । আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, জানিতেছি, তাহা পরিবর্তনশীল নামরূপ মাত্র—ভৌতিক জগতে কোন বস্তুর স্থায়িত্ব নাই । দেহ পঞ্চভূতের সমষ্টি, আত্মা কতকগুলি গুণ ও সংস্কারের সমষ্টি; তাহাদের বাস্তব্য নাই । কর্মই একমাত্র

সত্য পদার্থ, বিশ্বচরাচর কেবল কর্মসূত্রে বাঁধা। বালকের কর্মফল যুবার জীবনে প্রতিকলিত; সেইরূপ তোমার ঐহিকের কর্মফল পারত্রিক জীবনে প্রতিকলিত হইবে। যেমন পূর্বজন্মের কর্মফল তুমি ইহজীবনে ভোগ করিতেছ, সেইরূপ যদি পরলোকে মঙ্গল চাও, তবে পাপকর্ম পরিহার কর. পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান কর; কেননা কোন চিন্তা, কোন বাক্য, কোন কর্ম এ পৃথিবীতে নষ্ট হয় না। আমি সত্য বলিতেছি, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল যেখানে যাও, সমুদ্রে প্রবেশ কর অথবা গিরিগুহায় লুকায়িত থাক, তোমার কর্মফল তোমার পশ্চাৎ ধাবিত হইবে—কিছুতেই তাহা হইতে নিস্তার নাই। তোমার পাপের ফল যেমন দুঃখভোগ, সেইরূপ তোমার পুণ্যের সুফলভাগীও তুমি। বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলে তোমার আত্মীয়স্বজনবন্ধু যেমন তোমাকে আনন্দে অভ্যর্থনা করে, সেইরূপ তোমার পুণ্যফল লোক হইতে লোকান্তরে তোমাকে অনুসরণ করিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিবে।”

এইস্থলে বৌদ্ধধর্মের পারলৌকিক মত ও বিশ্বাস একবার পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। মৃত্যু ও পরকাল সম্বন্ধীয় যে-সকল প্রহেলিকা মানব হৃদয়ে স্বভাবতঃ উদয় হয়, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে তাহার সমস্তোষজনক উত্তর সর্ববাংশে উপলব্ধি হয় না। বুদ্ধদেব স্বয়ং তাহা কতক ব্যক্ত, কতক অব্যক্ত রাখিয়াছেন। জীবাত্মার শেষ গতি কি? বুদ্ধদেব মৃত্যুর পর জীবিত থাকিবেন কি না?—এই সকল প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি অনেক সময় মৌনভাবে অবলম্বন করিতেন। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁর কাছে এই সমস্ত গূঢ়

প্রশ্ন উত্থাপন করিতে বিরত হইত না; বুদ্ধদেব সে-সকলের যথা-সাধ্য উত্তর প্রদান করিয়াছেন—যাহার উত্তর নাই, তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। মালুঙ্ঘ্যপুত্রের প্রতি বুদ্ধের উপদেশ যাহা পূর্বের বিরূত হইয়াছে, এইস্থলে তাহার পুনরুক্তি করা যাইতেছে।

মালুঙ্ঘ্যপুত্র যখন এই সকল তত্ত্বের জ্ঞানলাভ মানসে বুদ্ধের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করেন, তখন বুদ্ধদেব কহিলেন :—

হে মালুঙ্ঘ্যপুত্র—আমি কি কখন তোমাকে বলিয়াছি—“এস, আমার শিষ্য হও—আমি তোমাকে বলিয়া দিব, জগৎ সৃষ্ট কি অনাদি, দেহ আত্মা পরস্পর ভিন্ন কি অভিন্ন—বুদ্ধ মরণোত্তর নব-জীবন ধারণ করিবেন কি না ?—এই সকল সন্দেহ তপ্তন করিয়া উপদেশ দিব, আমি কি এমন কোন বচন দিয়াছি ?”

—না, গুরুদেব, তা দেন নাই।

—এই সকল তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশে কি তুমি আমাকে গুরু বলিয়া মানিয়াছ ?

—না, তাহা নহে।

বুদ্ধদেব কহিলেন—

“এক ব্যক্তি বিষাক্ত বাগে আহত হইয়াছিল। তাহার আত্মীয় বন্ধুগণ একজন স্ত্রীপুণ চিকিৎসক ডাকিয়া আনিল। যদি সেই আহত ব্যক্তি বলিত আগে আমাকে বল কার কার বাগে আমি আহত হইয়াছি, যে বাগ মারিয়াছে সে লোকটা কে ? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কি শূদ্র ? তাহার নাম কি ? নিবাস কোথায় ? সে বাগই বা কি রকমের বাগ ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে কি কোন লাভ আছে ? ফলে এই দাঁড়াইত যে, যথা শেষ হইতে না হইতেই

সেই বাণাহত ক্ষত ব্যক্তি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে দেখিতে পাইতে ।

—হে মালুখ্যপুত্র, তুমি আহত হইয়া আমার নিকট চিকিৎসার জন্য আসিয়াছ । তোমার আরোগ্যের উপযোগী যে ঔষধ তাহা আমি বলিয়া দিয়াছি । আমি ঘাঁই প্রকাশ করি নাই, তাহা অপ্রকাশিত থাকুক—যাহা ব্যক্ত করিয়াছি তাহা প্রকাশিত হউক ।”

বৌদ্ধদেযোগণ এই মৌনভাববশতঃ বুদ্ধের প্রতি দোষারোপ করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি ? মিলিন্দ প্রশ্নে যবনরাজ মিলিন্দ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেনের মধ্যে যে কথোপকথন আছে, তাহাতে বুদ্ধদেবের এই মৌনভাবের কারণ সমালোচিত দেখিবেন ।

রাজা কহিলেন—

✱—শাক্যমুনি বলিয়াছেন যে-সকল ধর্ম্মতত্ত্ব মনুষ্যবুদ্ধির গোচর তাহা আমি অপ্রকাশিত রাখি নাই । তথাপি দেখা যায় যে, মালুখ্যপুত্রের প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে তিনি বিরত হইয়াছিলেন । তাহার কারণ দুয়ের এক হইতে পারে—হয় অজ্ঞানবশতঃ উত্তর দেন নাই, অথবা জানিয়া শুনিয়া গুহ্য রাখিবার ইচ্ছায় উত্তর দেন নাই । এ দুয়ের কোনটা ঠিক ?

—রাজন, বুদ্ধদেব মালুখ্যপুত্রের প্রশ্নগুলির উত্তর দেন নাই সত্য বটে, কিন্তু তাহা অজ্ঞানবশতঃ নহে । কোন প্রশ্ন এমন আছে, যাহার উত্তরে অন্য এক প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইতে পারে—আবার এমনও প্রশ্ন আছে, নিরুত্তর থাকাই যাহার উত্তর । সে সকল প্রশ্ন কি ?—না

## বৌদ্ধ

জগৎ নিত্য কি অনিত্য ?

দেহ ও আত্মা এক কি স্বতন্ত্র ?

মৃত্যুর পরে তথাগত জীবিত থাকিবেন ।

এই সমস্ত প্রহেলিকা একপাশে ফেলিয়া রাখ।

কোন উত্তর নাই—উত্তরে 'কোন লাভ নাই—এই

অনর্থক উত্তরদানে তথাগত বাক্যব্যয় করিতে

ছিলেন না। যে-সকল দুঃসহ সত্য মানববুদ্ধির

তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট মত ব্যক্ত করা তাঁহার অভিপ্রে

ছিল না।

জীবাত্মা অমর কিম্বা মৃত্যুর অধীন—মৃত্যুর পুর জীবাত্মার

পত্তি কি হইবে ? এই প্রহেলিকা ভেদ করা মনুষ্যের পক্ষে

দুঃসাধ্য সন্দেহ নাই। অথচ আবার মানবজাতির জীবিতাশা

ও সুখাশা এতাদৃশ বলবতী যে, তাহা ক্লমভঙ্গুর সংসারে

সীমাবদ্ধ থাকিয়া তৃপ্ত হইবার নহে। ঐক্যবাদিনী মৈত্রেয়ীর সেই

গভীর উচ্ছ্বাস আত্মা হইতে স্বতই উথিত হয় যেনাহং নামৃতং

স্মাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্। এই হেতু পারলৌকিক আশার

উদ্রেককারী আশ্বাসবচন প্রায় সর্বজাতীয় ধর্মশাস্ত্রেই সন্নিবিষ্ট

দৃষ্ট হয়। কোরাণ ত স্বর্গবর্ণনায় ও স্বর্গসুখবর্ণনায় পরিপূর্ণ।

খৃষ্টি ধর্মশাস্ত্র বাইবেলেও এ কথা আছে, আর তা ছাড়া খৃষ্টানেরা

ঈশ্বার সশরীরে স্বর্গারোহণ বিশ্বাস-বলে অনন্ত জীবন ও মুক্তি

লাভের প্রত্যাশা করেন। বুদ্ধ এ বিষয়ে কোন আশ্বাসবাক্য

দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ঐহিক সুখবাসনার ন্যায় স্বর্গ

কামনাও তাঁহার নীতিরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত। বুদ্ধ স্বয়ং অমর



বন্দী ।

১.—তাহাও প্রকাশিত হয় নাই।

ক্লেমার মধ্যে যে কথোপকথন আছে

সেই বলিতেছেন—“স্বয়ং বুদ্ধ যাহা প্রকাশ

করা তাহা কি বলিব ? বুদ্ধের প্রকৃতি সমুদ্রের

শর্শ গভীর। যদি বল বুদ্ধ অমর, তাহা ভুল—যদি

মরণশীল, তাহাও ঠিক নহে।” এই উত্তরে রাজা

হইলেন কি না জানি না, কিন্তু ইহার উপর কাহারো

কি বলিবার নাই। যে-সকল বিষয় মানববুদ্ধির অগোচর,

সে বিষয়ে মৌন থাকা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই।

বৌদ্ধেরা যদি এইখানে থামিয়া বাইতেন, তাহা হইলে আর কোন কথা বলিবার থাকিত না। কিন্তু এদিকে আবার দেখা যায়, তাঁহারাও হিন্দুদের ন্যায় মৃত্যুর পর নানারূপ যোনি ভ্রমণ স্বীকার করেন। ইহকালে যিনি যেরূপ শুভাশুভ কর্ম্ম করেন, পরকালে তিনি তদনুরূপ যোনি প্রাপ্ত হন। কেবল পশুপক্ষী কীটাদি নিকৃষ্ট জন্তু নয়, পাতকের পরিমাণানুসারে মৃৎপিণ্ডাদি জড় বস্তু হইয়াও জন্মগ্রহণ করিতে হয়। বৌদ্ধেরা বলেন, শাকামুনি নিজে অশেষ জন্মচক্রে ঘূর্ণিত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। পূর্বজন্মের কথা তোমার আমার মত যে-সে লোকের মনে থাকে না। বুদ্ধের ন্যায় সিদ্ধ পুরুষেরাই তাহাদের বিগত জীবন-কাহিনী স্মরণ করিয়া বলিতে পারেন। বুদ্ধদেব পশুপক্ষ্যাদি কোন্ যোনিতে কিরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত জাতকমালায় বর্ণিত আছে। বুদ্ধজাতকে আত্মার নিম্ন হইতে উর্দ্ধমুখী



অভিব্যক্তি নাই—জীবনের ক্রমোন্নতির ভাব লক্ষিত হয় না ।  
কি কারণে, কি নিয়মে জীবের অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাহা বুঝা  
যায় না । আমরা দেখিতে পাই চারিবার তিনি মহাব্রহ্ম, বিশ  
বার ইন্দ্র—তিরানীবার সম্যাসী—আটাল্লবার রাজা—চব্বিশবার  
ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন বানর, হস্তী, সিংহ, বরাহ,  
শশক, মৎস্য, বৃক্ষ, চোর, বাজীকর, ভূতের ওঝা—এইরূপ  
কত কত জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই । বুদ্ধ  
নারীজন্ম গ্রহণ করেন নাই—ভূতপ্রেতরূপেও জন্মান নাই ।  
সকল জন্মেই তিনি বোধিসত্ত্ব ছিলেন, ও জগতের মঙ্গল সাধন  
উদ্দেশে অশেষ দুঃখক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন ।

বুদ্ধের পূর্বজন্ম কাহিনীতে বুদ্ধজীবন স্বার্থহীন পরোপকার ও  
দয়ার অবতাররূপে চিত্রিত ; এবং এই সকল মহদুগ্ধভূষিত  
তাঁহার সেই জীবনী মানবের দৃষ্টান্ত স্বরূপে জাতকমালায় বর্ণিত  
দেখা যায় । একস্থানে বুদ্ধদেব কহিতেছেন—“আমি ‘সাম’  
নাম ধারণ করিয়া উপত্যকারে বাস করিতাম । সর্বভূতে  
সমদৃষ্টি দ্বারা আমি সকলকেই বশে আনিয়াছিলাম । সিংহ ব্যাঘ্র  
ভল্লুক বন্যবরাহ মহিষ ইহারা সকলেই পালিত পশুর গ্যায় আমার  
কাছে আসিয়া বসিত । আমাকেও কেহ ভয় করে না, আমিও  
কাহাকে ভয় করি না, আমি দয়ার উপর পা রাখিয়া নির্ভয়ে  
পর্বতপ্রদেশে বিচরণ করিতাম ।”

যিনি পরোপকার ব্রতে জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহাকে কত  
প্রকার কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়—সময়ে সময়ে প্রাণ  
পর্যন্ত অকাতরে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হইতে হয় । বুদ্ধদেব

স্বীয় জীবনে সেইরূপ আত্মত্যাগের পরাকর্ষ্য প্রদর্শন করিয়াছেন ।

পূর্বজন্মে বুদ্ধ যখন রাজকুমার বশ্শত্তুর হইয়া জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বিপদের আর অন্ত ছিল না । বশ্শত্তুর অন্য়ারূপে রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইলেন । তাঁহার বাহ্য কিছু ধন সম্পত্তি ছিল—পরিশেষে চড়িবার রথটিও অশ্ব-সহ দানে ক্ষয় হইয়া গেল । স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে পদব্রজে প্রথর সূর্য্যতাপের মধ্য দিয়া তিনি বনে ফিরিতেছেন । বালক বালিকা পথের মধ্যে বৃক্ষে ফল কুলিয়া আছে দেখিয়া তাহা পাড়িবার জন্ত লালায়িত—বৃক্ষ পর্য্যন্ত তাহাদের দুর্দশায় সমবেদনা অনুভব করিয়া অবনত হইয়া তাহাদিগকে ফল পাড়িতে দিতেছে । পরে তাঁহারা বৃক্ষ পর্বতে সন্ন্যাসীবশে এক পর্ণগৃহে বাস করিতে লাগিলেন । “আমি, রাজকন্যা মাদ্রী, দুই পুত্র, দুই কন্যা জালী ও কৃষ্ণাজিনা, এই কয়জন মিলিয়া সেই পর্ণ কুটীরে বাস করিতে লাগিলাম—পরস্পর পরস্পরের শোকাশ্রু মুছাইয়া সান্ত্বনা অনুভব করিতাম । আমি ছেলে মেয়ে দুটির সংরক্ষণে আশ্রমে থাকিতাম, মাদ্রী বন হইতে ফল কুড়াইয়া আনিয়া আমাদের আহার যোগাইত । এই সময়ে একজন ভিক্ষুক আসিয়া আমার নিকট পুত্রকন্যা ভিক্ষা চাহিল । আমি একটু মুচ্কি হাসিয়া ছেলেমেয়েদের দিয়া ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম । পরে স্বর্গ হইতে ইন্দ্র নামিয়া আসিয়া মাদ্রীকেও লইতে চাহিলেন—আমার সতীসাক্ষী স্ত্রী, আমি তাহার হাত ধরিয়া তাহার হস্তে জল রাখিয়া মাদ্রীকেও সম্ভোষিত্তে জলাঞ্জলি

## বৌদ্ধধর্ম।

দিলাম। এই দান দেখিয়া দেবতারা উপর হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন—বনের তরুরাজি হইতে মেরু পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। আমার পুত্র, কন্যা, রাজকুমারী সকলকেই আমি বুদ্ধত্ব পাইবার আশায় পরিত্যাগ করিলাম সেই মুনি-জন অতীপ্সিত মহামূল্য রত্নের নিকট এ সকল জিনিস কি ক্ষুদ্র—কি তুচ্ছ!”

দানশীলতার আর একটি আখ্যান শ্রবণ করুন। বুদ্ধের পূর্বজন্ম বৃত্তান্তে একটি বিজ্ঞ শশকের গল্প আছে। বুদ্ধ বলিতেছেন :—

“পূর্বজন্মে যখন আমি শশক ছিলাম, পার্বত্য অরণ্যে চরিয়া বেড়াইতাম। তৃণ পল্লব ফল মূল যাহা পাইতাম আহার করিতাম। এক বানর, এক শৃগাল, এক বিড়াল, আর আমি—আমরা এই চারি জনে মিলিয়া বনে বিচরণ করিতাম। আমার সহচরদিগকে আমি ধর্মোপদেশ করিতাম - কি ভাল কি মন্দ তাহা শিক্ষা দিতাম—ভাল গ্রহণ করা, মন্দ পরিত্যাগ করা, এইরূপ উপদেশ দিতাম। পূর্ণিমার উপবাসপর্বের আমি তাহা দিগকে বলিতাম “এই পুণ্য দিনে ভিক্ষুকদিগের জন্ম অন্নদানের সংগ্রহ করিয়া রাখ। পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া ভিক্ষা দান করিবে ও আগে হইতে তাহাদের জন্ম ভিক্ষাসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখিবে।” আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এই উপলক্ষে কি দান করা যায়? কলাই মটর ডাল ভাত আমার কিছুই নাই। আমি তৃণ ভক্ষণ করিয়া থাকি, তাহা ত আর কাহাকেও দেওয়া যায় না। ভাল মনে পড়িয়াছে! কেহ আসিয়া ভিক্ষা চাহিলে আমি আপনাকে দান করিব—তাহাকে

## বৌদ্ধধর্ম ।

শূন্য হস্তে ফিরিয়া যাইতে হইবে না। শত্রু আমার মনের ভাব জানিতে পারিয়া আমাকে পরীক্ষা করিতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। ব্রাহ্মণ বেশে আমার বিবরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন “ভিক্ষাং দেহি।” আমি কহিলাম, আপনি ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছেন, ভালই হইয়াছে—আমি আপনাকে এমন জিনিস দিব যে কেহ কখন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে না। মহাশয়, সাধু পুরুষ কাহাকেও অনর্থক কষ্ট দিতে ইচ্ছা করিবেন না। আমার মিনতি যে, আপনি শুষ্ক কাষ্ঠসকল একত্র করিয়া জ্বলাইয়া দিন—আমি নিজে দক্ষ হইয়া আপনার আহার যোগাইব।” ইন্দ্র আমার কথামত করিলেন এবং অগ্নির পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। কাষ্ঠ জ্বলিয়া উঠিলে আমি জ্বলন্ত অনলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িলাম। জলপ্রবেশ করিলে যেমন অঙ্গদাহ নিবারিত হয়, সেই চিত্তানলে তেমনি আমার সকল কষ্টের অবসান হইল। অস্থি চর্ম মাংস শিরা উদর হৃৎপিণ্ড সমেত আমার সমুদয় দেহ ভস্মসাৎ হইল; ব্রাহ্মণের হস্তে আমি অকাতরে আত্মসমর্পণ করিলাম।”

বুদ্ধের পূর্বজন্ম কাহিনীর নমুনা স্বরূপ দুই একটি ক্ষুদ্র গল্প উপরে দেওয়া হইল—এই সকল নীতিপূর্ণ উপাখ্যানে জাতক-মালা পরিপূর্ণ।

পরলোক ও মুক্তি বিষয়ে বৌদ্ধ মত জানিতে হইলে বৌদ্ধধর্মের আত্ম-তত্ত্বের শিক্ষা ও উপদেশের প্রতি মনোনিবেশ করা আবশ্যিক। আত্মার পারলৌকিক গতি ও মুক্তির কল্পনা আত্মার স্বরূপলক্ষণের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। আত্মাকে যদি

দেহের সহিত অভিন্ন—মস্তিষ্কের প্রক্রিয়ামাত্র মনে করা যায়, তাহা হইলে দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ সহজে নিস্পন্ন হয়। এই আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে আমাদের ধর্মশাস্ত্রে ও বৌদ্ধশাস্ত্রে আকাশপাতাল প্রভেদ। X দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, উপনিষদে আত্মা বলিয়া যাহা নিরূপিত, তাহা শরীর হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। আত্মা যে আমি, আমি শরীর হইতে ভিন্ন—আমি চক্ষু নহি, কর্ণ নহি, মনোবৃত্তি নহি—চক্ষু কর্ণ মনোবৃত্তি আমার। ছান্দোগ্য উপনিষদে আত্মজ্ঞান বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা আছে, তাহাতে প্রজাপতির যে উপদেশ, তাহা শ্রবণ করুন—

“এই দেহ নশ্বর—মৃত্যুর অধীন। আত্মা অজর অমর, অশরীরী, এই দেহ তাহার বাসস্থান। অশ্ন যেরূপ রথে যুক্ত, এই আত্মাও সেইরূপ শরীরের সহিত সংযুক্ত। যখন আলোক চক্ষুর তারকে প্রবেশ করে, তখন আত্মাই দর্শক, চক্ষু দর্শনেন্দ্রিয়। যিনি ভাবেন আমি বাক্য উচ্চারণ করিতেছি, তিনি আত্মা, রসনা বাগিন্দ্রিয়। যিনি শ্রবণ করেন তিনি আত্মা, কর্ণ শ্রবণেন্দ্রিয়। যিনি মন দ্বারা মনন করেন, তিনি আত্মা, মন দিব্যচক্ষুস্বরূপ; আত্মাই এই মনোরূপ দিব্যচক্ষে কাম্যবিষয়সকল দর্শন করত রমণ করেন। আত্মা যতদিন এই শরীরে অবস্থিতি করেন, ততদিন তিনি মোহপাশে বদ্ধ থাকিয়া বিষয়বাসনার বশবর্তী হইয়া সুখদুঃখে বিচলিত হয়েন; কিন্তু যখন তিনি দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন, তখন সুখদুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

যেমন অশরীরী বায়ু মেঘ বিদ্যুৎ, আকাশ হইতে উখিত হইয়া পরম জ্যোতিতে গিয়া নিজ নিজ রূপ ধারণ করে, সেইরূপ আত্মাও এই শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই পরম জ্যোতিকে পাইয়া নিজরূপে প্রকাশিত হরেন—তখনই তিনি পুরুষ—তখন সুখদুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দিব্য জ্ঞান দ্বারা পরমাঙ্গার সহিত যোগযুক্ত হইয়া, বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, তখন তিনি পরম শান্তি পরমারোগ্য উপভোগ করেন।

২ উপনিষদের এই উপদেশ—বৌদ্ধধর্মের উপদেশ স্বতন্ত্র। যে ধর্ম হিন্দুসমাজ হইতেই বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাহার উপর বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের প্রতিবিম্ব পড়িবে, তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু বুদ্ধদেব আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুধর্মের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ পার্থক্য ঘটিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম দেহমনের আড়ালে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে বলে দেহ আত্মা এক। পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন, কূট প্রশ্ন বলিয়া বুদ্ধদেব তাহার উত্তরদানে বিরত ছিলেন। অপরাপর গ্রন্থে ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টতর অবিশ্বাসের কথা আছে—অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্পষ্টই অস্বীকার করা হইয়াছে দৃষ্ট হয়।

মিলিন্দ-প্রশ্ন হইতে নিম্নে যে কয়েকটি প্রশ্নোত্তর উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে 'আত্মতত্ত্ববিষয়ে বৌদ্ধমত স্পষ্ট প্রতিপাত হইবে।

রাজা মিলিন্দ বৌদ্ধাচার্য্য নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“মহাশয়, আপনার নাম কি ?”



নাগসেন উত্তর দিলেন “মহারাজ ! আমার নাম নাগসেন, কিন্তু নাগসেন নাম মাত্র, ইহা শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে । ইহার কোন বাস্তব্য নাই, কোন বিষয় নাই ।”

রাজা—“কোন বিষয় নাই ? বলেন কি ? যদি কোন বিষয় না থাকে, কে তোমাকে অন্নবস্ত্র দিয়া তোমার অভাব পূরণ করে ? পীড়িত হইলে কে তোমাকে ঔষধ পথা দেয় ? কে এই সকল বস্তু ভোগ করিতেছে ? কে ধর্ম অনুষ্ঠান করে, পুণ্যফল ভোগ করে ? কে নির্বাণ লাভ করে ? চৌর্য্য হত্যা পঞ্চ পাপাদি কে করে ? তোমার মতে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই নাই । পাপপুণ্যের ফলাফল নাই । কর্ম্মের কোন কস্তা নাই । প্রভুজি, আপনাকে কেহ প্রাণে বধিলে তাহার হত্যাদোষ হয় না ।”

তখন নাগসেন কহিলেন, “রাজন, আমার কেশগুচ্ছ কি নাগসেন ?

—তা নয় ।

—বেদনা কি নাগসেন ? নাম, রূপ, সংস্কার, বিজ্ঞান—ইহারা কি নাগসেন ?

—না ।

—তবে নাগসেন কোথায় ? আমি যদিকে দৃষ্টি করি নাগসেন নাই । নাগসেন একটি শব্দমাত্র ।”

পরে আরও বলিলেন—

“মহারাজ ! আপনি রৌদ্রের প্রথর উত্তাপে পদব্রজে চলিয়া যাইতে শ্রান্তি বোধ করেন । এখানে আপনি পদব্রজে আসিয়াছেন, না রথে আসিয়াছেন” ।



—আমি পায়ে চলিয়া বেড়াই না, রথে আসিয়াছি ।

✕ —যদি রথে আসিয়া থাকেন ত রথ কি, আমাকে বলুন । যুগকাষ্ঠখানা কি রথ ? যুগকাষ্ঠ, চক্র, আসন, ইহার কোনটাই রথ নহে । এই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগও রথ নহে । আমি যেদিকে দেখি, রথ নাই,—ইহা একটি শব্দমাত্র । মহারাজ ! আপনি বলিলেন রথে আসিয়াছি—একি অসত্য নহে ? যদি সত্য হয় ত রথ কি, আমাকে বুঝাইয়া বলুন ।

—আমি যাহা বলিয়াছি সত্যই বলিয়াছি,—যুগকাষ্ঠ, চক্র, চক্রনাভি, অর, আসন ; এই সব মিলিয়া রথের নাম রথ ।

—যদি তাহাই ঠিক হয়, নাগসেনও সেইরূপ । রূপ, বেদনা, সংস্কার, বিজ্ঞান, এই সকল মিলিয়া তাহার নাম নাগসেন । তাহার আভ্যন্তরিক বিষয় আর কিছুই নাই । জীবাঙ্গা এই পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি ।”

আত্মজ্ঞান বিষয়ে উপনিষদ্ আর বৌদ্ধধর্মের কি প্রভেদ দেখুন । বৌদ্ধমতে জীবাঙ্গা বলিয়া দেহ হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই । জন্মসংস্কারে জীবন-স্রোত বহিয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যে “আমি” “তুমি” কোন মূল সত্তা বিদ্যমান নাই ।

এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় আমার আমিই চলিয়া আসে, অথবা বিনষ্ট হইয়া যায় ? বৌদ্ধদর্শন ইহার উত্তর কি দেন ?—এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্য দীপশিখার সহিত আত্মার উপমা দেওয়া হয় । দীপশিখা যেমন বায়ুভরে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তু আশ্রয় করিয়া চলিয়া উঠে, জীব সেইরূপ এক যোনি হইতে অন্য যোনিতে ভ্রমণ করে, এক দেহ ত্যাগ করিয়া

অন্য দেহ আশ্রয় করে । বায়ুর স্থায় বিষয়-তৃষ্ণা জীবাঙ্গাকে ঘোনি হইতে ঘোনিতে লইয়া যায় । এই যে জীবাঙ্গা অবস্থা হইতে অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা একও নহে—ভিন্নও নহে ।

রাজা—একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিন ।

—একটা দীপ জ্বালাইয়া দিলে সমস্ত রাত্রি তাহা জ্বলিতে থাকে । প্রথম প্রহরে যে শিখা জ্বলিতেছে, তাহা কি মধ্যরাত্রির শিখার সঙ্গে সমান ?

—না ।

—মধ্যরাত্রির শিখা ও শেষ প্রহরের শিখা—ইহারা এক কি ভিন্ন ?

—এক নহে ।

—তবে এই একই শিখার কি ভিন্ন রূপ বলিবেন ? তাহাও নহে, সমস্ত রাত্রি সেই একই শিখা জ্বলিতেছে । আমাদের জীবনেরও এই গতি,—এক যায়, এক আসে । আদি নাই, অন্ত নাই, জীবন-চক্র ঘুরিতেছে । পূর্বাপর একও নহে, আবার ভিন্নও বলা যায় না ।”

এই জীবন-শিখা কার্য-কারণগতিকে নূতন নূতন ক্ষেত্র অধিকার করিতেছে । জ্বলিতেছে, জ্বলিয়া নিবিয়া যাইতেছে—নূতন ইন্ধন পাইয়া পুনর্ব্বার জ্বলিয়া উঠিতেছে—মনে হয় এক অথচ ভিন্ন, ভিন্ন অথচ এক ।

জীবাঙ্গার যদি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে তাহার ঘোমিভ্রমণ কিরূপে সম্ভবে ?

আত্মা ছাড়িয়া অনাত্মবাদ অবলম্বনপূর্বক সুখদুঃখভোগী  
বে জীব তাহার জীবন-সমস্যা পূরণ—বৌদ্ধধর্ম এই অসাধ্য  
সাধনে ব্রতী হইয়াছেন ।

এই সমস্যা পূরণের প্রণালী এইঃ—বৌদ্ধমতে যে সমস্ত  
উপকরণে জীবের জীবন সংগঠিত, তাহাদের নাম “স্কন্ধ” । এই  
স্কন্ধ পঞ্চসংখ্যক, এই পঞ্চস্কন্ধ নূনাধিক মাত্রায় সর্বজীবে  
বর্তমান । সেই পাঁচটি এই—

বিষয় প্রপঞ্চ—রূপ ;

বিষয়জ্ঞান প্রপঞ্চ—বেদনা ;

সংজ্ঞা প্রপঞ্চ—নাম ;

সংস্কার প্রপঞ্চ—বাসনা ;

বিজ্ঞান প্রপঞ্চ—( consciousness )

প্রত্যেক স্কন্ধের আবার অশ্রুতর নানাপ্রকার বিভাগ ।  
এই পঞ্চ স্কন্ধের সংযোগে জীবের জন্ম—তাহাদের বিয়োগে  
জীবের মৃত্যু । এই সকল স্কন্ধ ছাড়িয়া জীবাত্মার স্বভাব  
অস্তিত্ব নাই ।

এই পঞ্চ স্কন্ধ কখন কখন ‘নামরূপ’ এই দুই শ্রেণীতে  
বিভক্ত দেখা যায়, মোটামুটি বলিতে গেলে জীব নামরূপের  
সমষ্টিমাত্র । মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপার নামের অন্তর্গত—  
দৈহিক ও বাহ্য বিষয় রূপের অন্তর্ভুক্ত ।

মৃত্যুকালে দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গে স্কন্ধপুঞ্জের বিয়োগ হইবা-  
মাত্র অশ্রুত তাহাদের সংযোজন ঘটে, হয় ইহলোক অথবা অন্য  
লোকে ; এইরূপে নূতন নূতন জীব সৃষ্টি হয় । এই কয়েকটি

স্বক্কের যোগাযোগেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—মনুষ্যের চরিত্র—  
মনুষ্যের আত্মা । এই সমস্ত স্বক্কের মূলে আত্মা যে আমি,  
আমি কতকগুলি গুণ ও সংস্কারের সমষ্টি মাত্র । এই যে আমি,  
আমার নিয়তই পরিবর্তন হইতেছে ; আজ একরূপ, কল্য অন্ত-  
রূপ । শিশু যে সে বালক নহে, বালক যে সে যুবা নহে ।  
এই পরিবর্তন অনুসারে নামের ভিন্নতা, যেমন একই দুগ্ধের পরি-  
বর্তনে ক্ষীর, দধি, ঘোল প্রভৃতি নাম ভেদ হয় । ইহাতে একটা  
প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে—যদি আত্মা বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ  
না থাকে, তাহা হইলে শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে জীবের ভাল মন্দ  
যোনিভ্রমণ কিরূপে সম্ভবে ? আত্মা নাই ত যোনি ভ্রমণ  
কাহার ? যেমন কথায় বলে, “মাথা নাই তার মাথা বাথা !”—  
ইহার উত্তরে বৌদ্ধশাস্ত্রে বলে, যদিও আত্মার অন্য সমস্ত  
চৈতন্য ( স্বক্ক ) ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তথাপি কর্ম্মফল—কর্ম্মবল—  
অক্ষত থাকে । জীব নিজ নিজ কর্ম্মবলে নূতন জন্ম ধারণ করে ।  
যে সকল সংস্কার এই ভিন্ন ভিন্ন যোনিতে কার্য্য করিতেছে, মৃত্যু  
তাহাদিগকে বিয়োজিত করে, কিন্তু কর্ম্মবলের উপর মৃত্যুর  
কোন অধিকার নাই । মৃত্যু ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে জীবদেহ  
হইতে বিশ্লেষিত আত্মার অবয়বখণ্ড নূতন যোনিতে সংযোজিত  
হয়—নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রেরিত হয় । এইরূপে জীবন-স্রোত  
অব্যাহত থাকে । পূর্বজন্ম ও নবজন্মের মধ্যে কর্ম্মসূত্রই এক-  
মাত্র বন্ধন । মনে করুন তাড়িত শক্তির ম্যায় কর্ম্মবল বলিয়া  
একটি শক্তি আছে, তাহার গতিবিধিতেই জীবন গঠিত  
হইতেছে—সংসার চলিতেছে । যেমন রথচক্র উঁচু নীচু নানা

স্থান নানা দৃশ্যের মধ্য দিয়া গমন করে, অথবা দীপশিখা  
 কিয়ৎকাল জ্বলিয়া নিবিয়া যায়—আবার জ্বলিয়া উঠে—  
 তাহাকে পূর্বাপর একই শিখা বলা যায় না, অথচ ভিন্নও  
 নহে। এইরূপে কর্মবলে জীবনচক্র নিয়তই ঘূর্ণমান—অথচ  
 বৌদ্ধধর্ম আত্মার অনুবর্ত্তিৎ, আমার আমিৎ অঙ্গীকার করেন  
 না। আমার কর্মের স্রোত জীবনে প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু  
 কর্ম-কর্তা কোন পুরুষ নাই। মোটামুটি, বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক  
 তত্ত্বের সারাংশ এই—আত্মার পৃথক সত্তা নাই। দেহ এবং  
 আত্মা ও আত্মার উপকরণ সমস্ত মৃত্যু দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া  
 যায়; কর্মবলে সেই সকল ছিন্ন অবয়ব-খণ্ড সংসারের ক্রীড়া-  
 ক্ষেত্রে নূতন নূতন জড়পিণ্ড ও জীবাকারে পরিণত হইতেছে—  
 বিশ্বসংসার এই অখণ্ডনীয় নিয়মে চলিয়া আসিতেছে। কেহ  
 সম্প্রদায়ী লোকেরা ( ইংরাজীতে যাদের Positivist বণে )  
 তাঁদের মতও কতকটা এইরূপ। তাঁহারা ব্যক্তিকে—পুরুষকে  
 সিংহাসনচ্যুত করিয়া, তাহার স্থানে মনুষ্যজাতিকে সংস্থাপিত  
 করেন। মনুষ্যের বিনাশ—কিন্তু মানব জাতির অমরতা। মৃত্যু-  
 কালে মনুষ্যের দেহমন বিযুক্ত হইয়া আদি ভূতে মিশিয়া যায় ;  
 যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা তাঁহার স্মৃতি এবং সাধু দৃষ্টান্ত—  
 অশ্রু কথায় কর্মবল এবং কর্মফল; তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী  
 সন্ধান সন্ততি ও অন্যান্য লোকের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া  
 জনসমাজ সংরক্ষণ এবং তাহার উন্নতি সাধনে সহায়ভূত হয়।

\* সে যাহাই হউক, এই প্রশ্ন উৎপন্ন হইতেছে, এই কর্মবল  
 কাহার? আমার, তোমার, কি অন্য কোন জীবের? আত্মা

বিনষ্ট হইলে কর্মবল কিসের উপর স্বীয় শক্তি চালনা করিবে ?  
 কর্তা ব্যতিরেকেই বা কর্মবল কিরূপে দেহের বাহিরে ও  
 অভ্যন্তরে কার্য্য করিবে ? বৌদ্ধধর্মের সহস্র ব্যাখ্যাতেও এই  
 সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। কর্তা  
 ছাড়িয়া দিলে কর্মের বল আপনাপনি বিনষ্ট হইয়া যায় ; স্বাধীন  
 পুরুষ ছাড়িয়া দিলে শুভাশুভ কর্মের জন্ম দায়িত্ব চলিয়া যায়।  
 পরকালে বিশ্বাসও এই আত্ম-জ্ঞানের উপর অনেকটা নির্ভর  
 করে। আমি আছি, আমি পরে থাকিব, আমার আমিত্ব  
 নিরন্তর বহমান থাকিবে, এই বিশ্বাস পরকাল-বিশ্বাসের মূল।  
 আমার আমিত্ব গেলে কর্মবলের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়—  
 পরকালে বিশ্বাসও হীনবল হয়।

তবে কি এই কর্মনিবন্ধন জন্মের পাকচক্র হইতে জীবের  
 কিছুতেই পরিত্রাণ নাই ? আছে, এবং বুদ্ধদেব সে উপায় বলিয়া  
 দিয়াছেন। তিনি সেই পথ প্রদর্শন করিয়াছেন “যস্মাৎ ভূয়ো  
 ন জায়তে”। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বনের শেষফল  
 নির্বাণমুক্তি। এই নির্বাণমুক্তি কি ? ঘুরিয়া ফিরিয়া এই  
 প্রশ্নে আসিয়া পড়িতে হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণের অনেক কথা,  
 অনেক উপদেশ আছে। বুদ্ধের নির্বাণ যে অবস্থা, তাহা  
 ভাবাভাব এতদুভয়েরই অতীত এক অভাবনীয় অবস্থা—

“ন চাত্তাবোহপি নির্বাণং কুত এবাস্ত ভাবতা ।

ভাবাভাববিনিমুক্তঃ পদার্থো নির্বাণমুচ্যতে ।”

( রত্নকূট সূত্র )

মিলিন্দ-প্রশ্নে নাগসেনের নির্বাণ-ব্যাখ্যার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

। “দুঃখ শোক পাপতাপ হইতে মুক্তিলাভ—শান্তি আনন্দ পবিত্রতা—এই নির্বাণের অবস্থা । ।

যিনি স্নায় জীবনকে পুণ্যপথে নিয়োজিত করিয়া চতুর্দিক অবলোকন করেন, তিনি কি দেখেন ? জন্ম রোগ শোক জরা মৃত্যু, চতুর্দিকে পরিবর্তন—সকলই অস্থির—সর্বত্রই অশান্তি । এই দৃশ্যে তাঁহা শরীর জ্বরে অভিভূত হয়, মন অশান্তিতে পূর্ণ হয়, কিছুতেই তাঁহার সম্ভাষণ নাই, তৃপ্তি নাই, পুনঃপুনঃ জন্ম ভয়ে তিনি সদাই ভীত ও ত্রস্ত, এবং সেই ভীতিবশতঃ আরোগ্যালাভে অসমর্থ । এই অবস্থায় তিনি চিন্তা করেন, এই খালা বন্ধনা হইতে কি উপায়ে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় ? এই অশান্তির মধ্যে শান্তি কোথায় পাওয়া যায় ? যদি এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, যেখানে জন্মভয় নাই, মৃত্যুভয় নাই, বাসনার দংশন নাই, আসক্তিবহীন হইয়া শান্তি, আরাম, নির্বাণ উপভোগ করা যায়, তাহা হইলেই তাঁহার সকল কামনা পূর্ণ হয় ; সাধনা দ্বারা তাঁহার সেই অবস্থা উপলব্ধ হয়, যেখানে জন্মভয় শোক তাপ অতিক্রম করিয়া তিনি শান্তি লাভ করেন । তখন তিনি পুলকে উৎফুল্ল হইয়া মনে করেন, এতক্ষণে আমি আশ্রয়স্থান লাভ করিলাম । সেই মোক্ষধাম অর্জন ও রক্ষণ করিতে তিনি কায়মনে সচেষ্ট হন ; সংযমী ত্রিভৈন্দ্রিয় ও অহিংসাপরায়ণ হন, সর্বভূতে দয়া ও প্রেমে তাঁহার হৃদয় অভিষিক্ত হয় । এইরূপ সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ



করিয়। এই পরিবর্তনশীল সংসারের অতীত যাহা স্থায়ী, যাহা সত্য, অর্হৎমণ্ডলীর চিরকাঙ্ক্ষিত ফল, তাহা তাঁহার হস্তগত হয় । তখনই তিনি নির্বাণমুক্তি লাভ করেন ।

এই নির্বাণমুক্তি স্থানবিশেষে বদ্ধ নহে । ধর্ম্মই তাহার আশ্রয়স্থান । চীন, তাতার, কাশ্মীর, গান্ধার, স্ৰগ মর্ত্তা যেখানেই থাকুন, প্রত্যেক সাধুপুরুষ বুদ্ধনির্দিষ্ট ধর্ম্মপথে চলিয়া নির্বাণমুক্তি লাভের অধিকারী । যাহার চরিত্র পবিত্র, যিনি ধ্যান ও বিবেক অর্জন করিয়াছেন, যিনি আসক্তি বিহীন মুক্তহৃদয়, তিনি জন্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্বাণরূপ অমৃত লাভ করেন ।”

নাগসেন আবার কহিলেন, “নির্বাণের যেমন স্থান নির্দেশ করা যায় না, তেমনি তাহার কারণও নির্দেশ করা যায় না । যে পথ নির্বাণে লইয়া যায়, সে পথ প্রদর্শন করা যাইতে পারে ; কিন্তু নির্বাণের উৎপত্তি কোথা হইতে, তাহা বলা যায় না । আর জিনিসটা যে কি, তাও স্পষ্ট বলা যায় না ।

—তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাতে দাঁড়ায় এই, ‘নির্বাণ’ কি না ‘নির্বাণ’, অর্থাৎ তাহা কিছুই নয় ।

—মহারাজ তা নয়—নির্বাণ আছে, ইহা সত্য ।”

ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধেও উপনিষদের এই উপদেশ—অস্তৌতি ক্রবতোহম্মত্র কথং তদুপলভ্যতে”—আছেন” এ বলা ভিন্ন আর কিমে তিনি উপলব্ধ হন ?

নাগসেনের এই সমস্ত উপদেশেও নির্বাণের প্রকৃত স্বরূপ

অবগত হওয়া গেল না। যে অবস্থায় আসক্তি নাই, জন্মভয় মৃত্যুভয় নাই, রাগ দ্বেষ স্নেহ মমতা প্রভৃতি সকলই নষ্ট, মনোবৃত্তি সমুদায় তিরোহিত, সে যে কি অবস্থা কে বলিতে পারে? কাহার সাধ্য ভাবিয়া উঠে? কথিত আছে বুদ্ধদেব স্বয়ং এই নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার শিষ্যেরা সে অবস্থা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; দেখা যাক এই বর্ণনা হইতে বেশী কিছু জ্ঞানলাভ হয় কি না।

বুদ্ধদেব তাঁহার আসন্ন মৃত্যুকালে শিষ্যদিগকে ডাকিয়া উপদেশ করিলেন, “পৃথিবীর তাবৎ বস্তুই অনিত্য, তোমরা যত্নপূর্বক আপনারা আপন মুক্তি-সাধন কর।” এই কয়েকটি কথা তথাগতের শেষ কথা।

পরে বুদ্ধদেব গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া নির্বাণের প্রথম সোপানে পাদনিক্ষেপ করিলেন; প্রথম সোপান উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় সোপানে, দ্বিতীয় সোপান হইতে তৃতীয় সোপানে, তৃতীয় হইতে চতুর্থ সোপানে। তখনও তাঁহার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই, কতক জ্ঞান, কতক আনন্দ অবশিষ্ট আছে। আরও উচ্চে উঠিতে হইবে। চতুর্থ মহাধ্যান-সোপান অতিক্রম করিয়া তিনি সেই সোপানে পদক্ষেপ করিলেন, যেখানে কেবল অনন্ত আকাশ বিরাজমান। অনন্ত আকাশের সোপান হইতে তথায় পদার্পণ করিলেন, যেখানে কোন চিন্তা, কোন ভাব, কোন মনোবৃত্তি বিद्यমান নাই—সকলি শূন্য। কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই। শূন্যতার অনুভবেও আনন্দ, তাহাও বিনষ্ট করা আবশ্যিক। পরে শূন্যতার সোপান হইতে এমন

মধ্যে প্রবেশ করা—সকল জীবনের মূল যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য, তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া ব্রহ্মে কিম্বা শূন্যে মিশিয়া যাওয়া, ইহার পরিণামে মনুষ্যের আর কি অবশিষ্ট রহিল ? ভক্তি-ভাজন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন তাঁহার বৌদ্ধধর্ম ও আর্য্যধর্মের পরস্পর সম্বন্ধবিষয়ক প্রবন্ধে বলিয়াছেন, “বৈদান্তিক চৌতলা মন্দিরের তুরীয় অবস্থা এবং বৌদ্ধ চৌতলা মন্দিরের নির্বাণ-মুক্তি এ-পিঠ ও-পিঠ।” বেদান্তমতে জীবাত্মার পরব্রহ্মে বিলীন হওয়া—বৌদ্ধমতে নির্বাণ-প্রলয়মাগরে ডুবিয়া যাওয়া—ইহার উর্ধ্বে আর কিছুই নাই—অন্ধকার, নিস্তরতা, শূন্যতা, বিনাশ !

টিপ্পনী—বুদ্ধদেব বৈশালীর কূটাগার শালায়

যে উপদেশ দেন তাহার ব্যাখ্যা ।

চারিটি স্মৃতি-উপস্থান (ধান)—

১। কার অপবিত্র

২। সংসার ছঃখময়

৩। চিন্তা চঞ্চল

৪। পদার্থসমূহ অলৌক

চারিটি ধর্ম-চেষ্টা—

১। অজিত পুণ্যের সংরক্ষণ

২। অলঙ্কৃত পুণ্যের উপার্জন

৩। পূর্বসঞ্চিত পাপের পরিত্যাগ

৪। নূতন পাপের অন্তঃপত্তি

চারিটি ঋদ্ধিপাদ :—

অলৌকিক সিদ্ধি লাভের—

১। অভিলাষ

২। চিন্তা

৩। উৎসাহ

৪। অন্বেষণ

পঞ্চবল—

১। শ্রদ্ধা

২। সমাধি

৩। বীর্ঘ্য

৪। স্মৃতি

৫। প্রজ্ঞা

সপ্ত বোধঙ্গ —

১। স্মৃতি

২। বিবেক

৩। বীর্ঘ্য

৪। প্রীতি

৫। শ্রদ্ধা

৬। বৈরাগ্য

৭। সমাধি

অষ্ট আর্ষ্যমার্গ—

১। সম্যক্ দৃষ্টি

২। সম্যক্ সংকল্প

৩। সম্যক্ বাক্

৪। সম্যক্ কর্ম্মান্ত

৫। সম্যক্ আত্মীব

৬। সম্যক্ ব্যায়াস

৭। সম্যক্ স্মৃতি

৮। সম্যক্ সমাধি

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

বৌদ্ধ সঙ্ঘ ।

উপক্রমণিকা ।—

বৌদ্ধধর্ম ত্রিরত্নে খচিত—বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘ । হিন্দুধর্মের ত্রিমূর্তির ন্যায় বৌদ্ধধর্মক্ষেত্রে এই তিনের ত্রিমূর্তি কল্পিত দেখা যায় । যুমুকু ব্যক্তি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইবার সময় এই ত্রিবর্গের শরণাপন্ন হইয়া দীক্ষা লাভ করেন ।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি

ধর্মং শরণং গচ্ছামি

সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

—বৌদ্ধদের এই দীক্ষামন্ত্র । ১

সঙ্ঘ ।—

পযাস্তু 'বুদ্ধ' ও 'ধর্ম', এই দুই অঙ্গ লইয়াই অল্প-বিস্তর চর্চা করা গিয়াছে । বুদ্ধের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত এবং তাহার উপদিষ্ট ধর্মতত্ত্ব যথাসাধা সমালোচিত হইয়াছে । বৌদ্ধধর্মের তৃতীয় অঙ্গ যে সঙ্ঘ, এই প্রবন্ধে তাহার অবতারণা সঙ্গত বোধ হয় ।

আমরা দেখিয়াছি যে, বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র এই যে, মনুষ্যের জীবনযাত্রা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় ; বিষয়-তৃষ্ণাই সে দুঃখের মূল, এবং বুদ্ধ-নির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক অবলম্বনপূর্বক তৃষ্ণা পরিহারই

সেই নুলোচ্ছেদের উপায়। এইরূপ বিশ্বাস ও উপদেশের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধ সঙ্ঘের উৎপত্তি। গৃহস্থাশ্রমে বাস করিয়া বৌদ্ধধর্মের উচ্চ অঙ্গের উপদেশ সম্যক্রূপে পালন করা গৃহীর পক্ষে সম্ভব নহে। সংসারের মায়ামমতা পরিত্যাগ করিয়া গৃহের বাহির হওয়া নির্বাণ লাভের উৎকৃষ্ট সাধন; সহজ কথায়, নির্বাণপথের পথিক হইতে গেলে গৃহস্থের সন্ন্যাসী হওয়া আবশ্যিক। বুদ্ধদেব স্রয়ং মুণ্ডিত কেশে, গৈরিক বেশে, ভিক্ষাপাত্র হস্তে সেই জীবন-ত্রুত অবলম্বন করিলেন, এবং স্বকীয় দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা অনেকে সেই পথে নিয়োজিত করিলেন। কাজেই তাঁর শিষ্যবর্গ মিলিয়া এক উদাসীন সম্প্রদায় স্বতই সংগঠিত হইল। বুদ্ধসম্প্রদায়ী উদাসীনের নাম ভিক্ষু, এবং সমাজবদ্ধ ভিক্ষুদলের নাম সঙ্ঘ।

(বৌদ্ধধর্ম যখন হিন্দু সমাজ হইতেই বিনিঃসৃত, তখন সহজেই মনে করা যাইতে পারে যে, এই উদাসীন-সম্প্রদায় বুদ্ধদেবের স্বকপোল-কল্পিত নূতন সৃষ্টি নয়। ইহার নিয়মাবলীর মধ্যে হিন্দুসমাজের রীতিনীতিবহির্ভূত অভিনব ব্যাপার কিছুই নাই। হিন্দুদের আদর্শ-জীবন ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস, এই চতুরাশ্রমে বিভক্ত। ইহার শেষ আশ্রম-বাসী যিনি, তিনি সন্ন্যাসী। বুদ্ধের সময়েও যোগী, বৈরাগী, যতী, মৌনী, নিগ্রহ, অচেসক, আজীবক, দিগম্বর প্রভৃতি নানা ধরনের সন্ন্যাসী বিচ্যমান ছিল; তাঁহার প্রবর্তিত উদাসীন-সম্প্রদায়ও উহাদের সহিত এক ছাঁচেই গঠিত। তবে ইহার বিশেষত্ব কোন্খানে, তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইবে।

ার গুরু; তাঁহার মুখে আমি যে উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, যে তাহাতেই অনুরক্ত থাকিব।” বৈশালীর সভাও এই দলি হইতে উৎপন্ন। কতকগুলি ভিক্ষু সঙ্ঘনিয়মেব রতা নিবারণ জন্য কোন কোন নিয়মের পরিবর্তন হয়, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তাঁহারা এইরূপ দশটি নিয়ম নির্দেশ করেন—অশন বসন সম্বন্ধে কতকগুলি ছোটখাট নিয়ম, তাছাড়া সোনারূপা গ্রহণের যে নিষেধ ছিল, তাহা দূরীকরণ। এই সকল বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্কের পর নবীন মত অগ্রাহ্য হইয়া সঙ্ঘের প্রাচীনপন্থীদের মর্যাদাই রক্ষিত হইল। তথাপি প্রতিপক্ষীয়েরা সম্মুখ হইলেন না। তাঁহারাও স্বপক্ষ হইতে এক সভা করিলেন—এই সভা ‘মহাসঙ্গীতি’ বলিয়া অভিহিত। এই বিপক্ষ দলের প্রতি কটাক্ষ করিয়া দীপ-বংশ বলেন—“ইহারা ধর্ম্মনষ্ট করিতে ও শাস্ত্র উল্টাইতে চায়—বুদ্ধের উপদেশের নূতন অর্থ করিয়া স্বমত সমর্থন করে—সূত্র বিনয় ও পরিবার পাঠ, অভিধর্ম্ম, নির্দেশ, জাতক প্রভৃতি একদিকে ফেলিয়া দিয়া নিজেদের মনগড়া শাস্ত্র পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিতে উদ্বৃত।” বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এই মতভেদ দলাদলি আরো বাড়িয়া উঠিল—ক্রমে বৌদ্ধেরা অষ্টাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল—তাহাদের গুরুও ভিন্ন ভিন্ন। এই কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রতিকূলে বুদ্ধের উপর ভক্তি শ্রদ্ধা, বৌদ্ধশাস্ত্রে আস্থা, ধর্ম্মবন্ধনে সাধারণ অনুরাগ ও উৎসাহ—এ ভিন্ন আর কোন শক্তি ছিল না। ( ভারতে বৌদ্ধ সঙ্ঘ নির্ম্মূল হইবার এক কারণ মনে হয় সঙ্ঘের এই প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা : )



বুদ্ধদেবের জীবদ্দশা হইতেই এইরূপ মতভেদের সূত্রপাত ।  
যায়, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলে আলোচ্য বিষয়ের স্পষ্টী-  
হইবে । আমরাও আমাদের এখনকার সমাজের বি-  
দলাদলি দূর করিবার সত্বপায় স্থির করিতে পারিব ।

যখন ভগবান্ বুদ্ধ কৌশাম্বীতে বাস করিতেছিলেন, এই সময়  
জনৈক ভিক্ষুর প্রতি অকারণে দোষারোপ করা হয়, কিন্তু তিনি  
নিজ দোষ কিছুতেই স্বীকার করেন না; ভিক্ষুগণ তঁাহার  
প্রতি বিরক্ত হইয়া বহিষ্কার দণ্ড বিধান করে ।

সেই ভিক্ষু বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, ধর্মশাস্ত্রবিশারদ এবং বিনীত-  
স্বভাব ছিলেন । তিনি নিজ বন্ধুগণের নিকট গিয়া বলিলেন,  
“আমি ত কোন দোষ করি নাই, আমাকে অনর্থক দণ্ড বিধান  
করা হইয়াছে । আমি আপনাকে সজ্ঞ হইতে বহিষ্কৃত মনে  
করিতে পারি না । আপনারা আমাকে এই অণ্ডায় দণ্ড হইতে  
মুক্তি দান করুন ।”

তঁাহার বন্ধুগণ বিচারকদের নিকট গিয়া আপনাদের অভি-  
প্রায় ব্যক্ত করিলে পর, দুই দলের মধ্যে ঘোরতর কলহ-বিবাদের  
উপক্রম হইল ।

বুদ্ধেব নিকট ইহার মায়াংসার জন্য উভয় দলই উপস্থিত  
হইল । বুদ্ধদেব দু'পক্ষকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, ও বাহাতে  
সম্ভাব রক্ষিত হয়, তাহার উপদেশ দিলেন ।

তবুও দলাদলি ভাঙ্গে না । উভয় পক্ষ স্বতন্ত্রভাবে উপবাস  
প্রভৃতি নিজ নিজ ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হইল । বুদ্ধদেব তাহ

দেখিয়া বলিলেন, দুই দলের মধ্যে যখন ঐক্য নাই, তখন তাহাদের স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ ধর্মকৃত্য অনুষ্ঠান করাই বিধেয় । তিনি বিবাদের সূত্রধরদিগকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, “হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা পরাহত হয় না, কিন্তু প্রেম-গুণে বিজিত হয় । অজ্ঞানবশতঃ যে ব্যক্তি বিবাদকলহে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে কিছু বলিবার নাই ; কিন্তু জানিয়া শুনিয়া এইরূপ অসদ্যবহার দূষণীয় । তোমরা সকলে শান্তি ও সম্ভাবে বাস করিতে শিক্ষা কর, এই আমার উপদেশ । আর তা না পার ত বনে গিয়া নির্জনে বাস কর । দুষ্কের সহবাস অপেক্ষা অরণ্যের নির্জ্ঞনতা শতগুণে শ্রেয়স্কর ।”

.. এইরূপ উপদেশেও ভিক্ষুদলের বিবাদ ভঞ্জন না হওয়াতে, ভগবান বুদ্ধ কোশাম্বী পরিত্যাগ করিয়া শ্রাবস্তীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন । তাঁহার অবর্তমানে এই কলহ-বিবাদ আরো অধিক প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল । পরে কোশাম্বীব গৃহস্থেরা স্থির করিল, “এই সকল ভিক্ষু মহা গণ্ডগোল বাধাইয়াছে, ইহাদের দৌরাভ্রো বুদ্ধদেবও দূরে গমন করিলেন । এই সকল ভিক্ষুদিগকে আমরা আর ভিক্ষা দান করিব না । ইহারা গৈরিক বসন ধারণের উপযুক্ত নহে—ইহারা সংসারে ফিরিয়া গেলেই ঠিক হয় ।” গৃহীদের এইরূপ আচরণে ভিক্ষুদলের চৈতন্য হইল, ও তাহারা তখন পরস্পরের মধ্যে শান্তিস্থাপনে কৃতনিশ্চয় হইল ।

উভয় পক্ষের লোকেরা শ্রাবস্তী গিয়া উপস্থিত হইল । সারীপুত্র বুদ্ধদেবের নিকট নিবেদন করিলেন,—ভগবন্ ! এই

সকল কলহপ্রিয় তিন্দুদল সমাগত হইয়াছে, ইহাদের সহিত  
কিরূপ ব্যবহার করিব ?

বুদ্ধদেব কহিলেন :—

“ইহাদিগকে ভৎসনা করিও না—কর্কশবাক্য কাহারো ভাল  
লাগে না। উভয়পক্ষের কথা শুনিয়া বিচার কর। এক  
পক্ষের কথা শুনিয়া ইতিকর্তব্য স্থির করা অসম্ভব। উভয়  
পক্ষের দোষগুণ প্রণিধানপুরঃসর বিচার করা মুনির লক্ষণ।”

কুলস্ত্রী প্রজাপতি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এইক্ষণে কি  
করা কর্তব্য ?

বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন, “উভয় দলকেই গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া  
পরিভূষ্ট কর—কোন এক দলের প্রতি পক্ষপাতী হইও না।”

উপালী জিজ্ঞাসা করিলেন,—ইহাদের কলহের ব্যাপার তদন্ত  
না করিয়া কি ইহাদের মধ্যে সন্ধিস্থাপন বিধেয় ? বুদ্ধ  
কহিলেন—“না, এরূপ হইতে পারে না। অনুসন্ধান দ্বারা  
ইহাদের দোষগুণ বিচার করিয়া এর শেষ পর্য্যন্ত তলাইয়া  
না দেখিলে সন্ধিস্থাপনের উপায় নির্ণয় করা অসাধ্য। মৌখিক  
সন্ধি কোন কার্যের নহে—অস্তুরের সহিত পরস্পরের দোষ  
মাজ্জনা না করিলে স্থায়ী ফল প্রত্যাশা করা বৃথা। এক  
মৌখিক সন্ধি—অশ্রু যে আস্তুরিক সখ্য-বন্ধন, তাহাই প্রকৃত  
সন্ধি।” এই বলিয়া তিনি দীর্ঘায়ুর গল্প বলিলেন :—

\* পুরাকালে কাশীতে ব্রহ্মদত্ত নামক এক প্রবলপ্রতাপ  
নরপতি ছিলেন। তিনি দীর্ঘেতি নামক কোশল রাজের সহিত  
যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কারণ তিনি মনে ভাবিলেন

কোশল এক ক্ষুদ্র রাজ্য—দীর্ঘেতি আমার সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পারিয়া উঠিবে না। দীর্ঘেতি নিজের দুর্বলতা অনুভব করিয়া রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন, ও নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে কাশী আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় তিনি সন্ন্যাসীবেশে এক কুস্তকার-গৃহে রাণীকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাণীর এক সন্তান জন্মিল, তাহার নাম দীর্ঘায়ু। দীর্ঘায়ু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা তাহার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাহাকে দূরে পাঠাইয়া দিলেন।

যখন ব্রহ্মদত্ত জানিতে পারিলেন যে, কোশলরাজ চন্দ্রবেশে রাণীর সহিত কুস্তকার-গৃহে বাস করিতেছেন, তখন তিনি তাহাদের উভয়কে ধৃত করিয়া প্রাণদণ্ড আদেশ করিলেন।

তাঁহাদের পুত্র দীর্ঘায়ু কাশীর বাহিরে বাস করিতেছিল, তাহার পিতা মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে আনাইয়া উপদেশ দিলেন—  
“হে পুত্র দীর্ঘায়ু, অধিক দেখিও না—অল্প দেখিও না। হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা পরাজিত হয় না—মৈত্রীগুণে হিংসাকে পরাজয় করিবেক।”

দীর্ঘায়ু বনে গমন করিয়া কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি নগরে ফিরিয়া আসিয়া নৃপতির হস্তা-রক্ষকের অধীনে কর্মগ্রহণ করিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া তিনি বোণা বাজাইয়া মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিলেন। রাজা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করাতে পরিজনেরা বালকটিকে রাজার নিকট লইয়া গেল; রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আপনার পার্শ্বচর করিয়া রাখিলেন।

একদিন রাজা মৃগয়ায় বাহির হইয়া তাঁহার অনুচরবর্গ হইতে দূরে গিয়া পড়িলেন—সঙ্গে কেবল দীর্ঘায়ু রহিল । দীর্ঘায়ুর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া রাজা নিদ্রা গেলেন ।

দীর্ঘায়ু মনে মনে ভাবিলেন, রাজা আমাদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন—আমার পিতা মাতাকে হনন করিয়া আমাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছেন । এখন তাহার প্রতিশোধের সময় আসিয়াছে । এই ভাবিয়া তিনি কোষ হইতে তরবারি উন্মোচন করিলেন ।

তখন পিতার শেষ কথাগুলি দীর্ঘায়ুর স্মরণ হইল—স্মরণ করিয়া আবার খড়গ কোষमध्ये রাখিয়া দিলেন ।

রাজা এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন । কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রাজা কহিলেন, “আমার কখনই সুনিদ্রা হয় না, আমি সর্বদাই এই দুঃস্বপ্ন দেখি যে, দীর্ঘায়ু তরবারি হস্তে আমাকে মারিতে আসিতেছে—দেখিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হয় । আমি তোমার কোলে মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছি, এই স্বপ্ন দেখিয়া ভয়ে জাগিয়া উঠিলাম ।”

তখন যুবক বান হস্ত রাজার মস্তকে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে খড়গ ধারণপূর্বক বলিলেন, “মহারাজ ! আমিই দীর্ঘায়ু, দীর্ঘেতি রাজার পুত্র—আমার পিতাকে হনন করিয়া আপনি তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন করিয়াছেন । দেখুন এখন প্রতিশোধের সময় আসিয়াছে ।”

রাজা আপনাকে অরক্ষিত দেখিয়া কহিলেন, “হে

দীর্ঘায়ু, আমার প্রাণ ভিক্ষা দাও—আমাকে বাঁচাও—প্রাণে মারিও না।”

দীর্ঘায়ু বলিল—“কেমন করিয়া আপনার প্রাণদান করিব, যখন আমার নিজের প্রাণসঙ্কট উপস্থিত। যদি আপনি আমাকে অভয়বচন দেন, তাহা হইলে আমিও আপনার প্রাণ রক্ষা করিব।”

রাজা সম্মত হইয়া কহিলেন, “তুমি আমার প্রাণদান কর, আমিও তোমাকে অভয়বচন দিতেছি।”

পরে তাঁহারা পরস্পর হাতে হাত দিয়া বন্ধুত্ব শপথ করিলেন।

ব্রহ্মদত্তকে দীর্ঘায়ু তাঁহার পিতার শেষ উপদেশগুলি ভাঙ্গিয়া বলিলেন। ব্রহ্মদত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতা মৃত্যুকালে যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহার অর্থ কি?—“অধিক দেখিও না, অল্প দেখিও না, হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা জিত হয় না।”

দীর্ঘায়ু কহিলেন—“অধিক দেখিও না, অর্থাৎ হিংসা অধিক কাল মনে স্থান দিও না। অল্প দেখিও না, অর্থাৎ বন্ধুবিচ্ছেদ অল্পে হইতে দিও না। হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা নিবারণিত হয় না, তাহার অর্থ এই.—তুমি আমার পিতা মাতাকে বধ করিয়াছ, আমি যদি তাহার প্রতিশোধ লইবার মানসে তোমাকে হত্যা করি, তাহা হইলে তোমার পক্ষের লোকেরা তাহার প্রতিশোধ তুলিয়া আমাকে বধ করিবে, ও আমার পক্ষের লোকেরা তাহার শোধ তুলিবার চেষ্টায় ফিরিবে;—প্রতিহিংসা দ্বারা

হিংসা জিত হয় না । মহারাজ ! এখন তুমি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ, আমিও তোমাকে প্রাণদান করিলাম,—অহিংসা দ্বারা হিংসার পরাজয় হইল ।”

ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুর কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার রাজ্য অশ্ব রথ সেনা সম্পত্তি তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন ; এবং স্বীয় কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দিলেন ।

হে ভিক্ষুগণ ! বড় লোকেদের এই দৃষ্টান্তে তোমরাও ক্ষমা দয়া অভ্যাস কর ; গুরুজনকে ভক্তি কর, সকলকে প্রেমদৃষ্টিতে দেখ । তোমরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিও না, শান্তি ও সদ্ভাবে মিলিত হইয়া বাস কর,—এই আমার উপদেশ । আশীর্ব্বাদ করি যে গৃহস্থেরা তোমাদের সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সুখী হউক ।

ভগবান বুদ্ধ গল্পাচ্ছলে এই উপদেশ প্রদান করিয়া ভিক্ষুদিগকে বিদায় করিলেন ।

ভিক্ষুদল মিলিত হইয়া তাহাদের বিবাদ কলহ মিটাইয়া ফেলিল, ও সেই অবধি তাহারা সুখে সদ্ভাবে কাল যাপন করিতে লাগিল । সঙ্ঘের মধ্যে শান্তি স্থাপন হইল ।

বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড—পৌরোহিত্য ।—

(বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব কালে আর্গ্যসমাজে বলি, হোম, যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ প্রবহমান ছিল, এবং এই সকল কর্ম কাণ্ডের অধিনায়ক হোতা ঋত্বিক অধ্বর্যু প্রভৃতি নানা শ্রেণীর পুরোহিত বিদ্যমান ছিলেন । এই আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়াকর্ম ও পৌরোহিত্য পরিবর্জনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতি-স্তিত্তির উপর



বুদ্ধদেব তাঁহার সজ্জ স্থাপন করিলেন । তিনি বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ড, বিশেষতঃ পশুবলির প্রতি বিরূপ বীতরাগ ছিলেন, তাহার নিদর্শন বৌদ্ধশাস্ত্রের অনেক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই বিষয় লইয়া এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হয়, তাহাতে বুদ্ধদেব এইরূপে উপদেশ দেন :—

পুরাকালে এক মহা প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন, তিনি এক মহা যজ্ঞের আয়োজন করিলেন । কুল-পুরোহিতকে ডাকিয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করাতে পুরোহিত কহিলেন, মহারাজ ! এই কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে প্রজাদের সুখ শান্তি ও কল্যাণসাধনে মনোনিবেশ করুন ।—এই পরামর্শক্রমে রাজ্যের সমস্ত অকল্যাণ দূর করিয়া, পরে তিনি যজ্ঞারম্ভ করিলেন । সে যজ্ঞে কোন পশু হত্যার ব্যবস্থা নাই ! কোন বৃক্ষচ্ছেদন, একটা তৃণেরও উচ্ছেদসাধনের প্রয়োজন হইল না । ভূত্যেরা স্বেচ্ছাপূর্বক নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিয়া গেল । ক্ষীর দুগ্ধ মধুপর্ক—এই সমস্ত বলিতে যজ্ঞের কার্য সমাধা হইল । কিন্তু বুদ্ধ কহিলেন, ইহা অপেক্ষাও মহত্তর বলি আছে, অথচ তাহা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য—সে কি, না ভিক্ষুদিগকে অন্নদান, বুদ্ধ ও সজ্জের জন্ত আশ্রমনির্মাণ । ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলি, যখন ভক্ত আসিয়া বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্জের শরণাপন্ন হয়, যখন তিনি কোন প্রাণীহিংসার প্রশয় দেন না, তাঁহার প্রতাপে সর্বপ্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা সুদূরপর্যন্ত হয় ; যখন তিনি ভিক্ষুর গায় সুখদুঃখ হইতে নিবৃত্ত হইয়া শান্তি-সলিলে নিমগ্ন হয়েন । কিন্তু সেই সর্বোৎকৃষ্ট বলি, যখন তিনি দুঃখ শোক হইতে

উদ্ভীর্ণ হইয়া, জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিয়া জ্ঞাননেত্রে এই নির্বাণাবস্থা অনুভব করেন ও জানিতে পারেন “আর আমাকে এই মর্ত্যলোকে কিরিয়া আসিতে হইবে না।”

বুদ্ধের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ তখনি বিনীত ভাবে বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্জের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি এক বৃহৎ যজ্ঞ করিবার মানসে অনেক পশু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে সকলকে ছাড়িয়া দিয়া বুদ্ধকে কহিলেন—

“দেখুন, আমি এই সকল জীবকে মুক্ত করিয়া দিলাম,— ইহারা মনের সুখে চরিয়া বেড়াক—মুক্ত বায়ু ইহাদিগকে ব্যজন করুক।”

এইরূপ কথিত আছে যে, বুদ্ধের উপদেশে রাজা বিম্বিসার তাঁহার রাজ্যে যজ্ঞে পশুহত্যা উঠাইয়া দিয়া প্রচার করিয়া দিলেন “এখন হইতে যজ্ঞে আর পশুবলি হইবে না—পশুদের প্রতি মনুষ্য সদয় হইলে, দেবতার মনুষ্যের প্রতি সদয় হইবেন।”

পুরোহিতের কর্মকাণ্ড ছাড়িয়া দিলে পৌরোহিত্য কাজেই চলিয়া যায়—বৌদ্ধ সজ্জেও তাহাই দেখা যায়। গুণ ও বয়সে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রাধান্য ছিল—বৌদ্ধ সজ্জের প্রথম বয়সে তাহার মধ্যে পৌরোহিত্যের প্রভাব উপলক্ষিত হয় না। সে প্রভাব কেনই বা থাকিবে? যে ধর্মে দেবতার আসন নির্দিষ্ট নাই—শাস্তি স্বস্ত্যয়নের বিধান নাই—যে ধর্মে ষাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কর্ম ভজন পূজনের কোন বিধি-ব্যবস্থা নাই—সে ধর্মে পুরোহিত কিসের জন্ম? ষাগ যজ্ঞের অধীশ্বর, দেব মানবের মধ্যস্থ একরূপ কোন কার্যকর্তার কিছুই প্রয়োজন নাই।—বৌদ্ধ মতে প্রত্যেক

মনুষ্য নিজ পুণ্যপ্রভাবে নির্বাণ লাভের অধিকারী, প্রত্যেক বৌদ্ধ আপনি আপনার প্রদোষ, আপনি আপন নির্ভর-যত্নি । প্রত্যেক বৌদ্ধ ভিক্ষু আপনিই আপনার পুরোহিত, আপনিই আপনার যজমান । বুদ্ধদেব মুমুক্ষুমাত্রকেই সংসার ও গৃহ সম্পত্তি বিসর্জন দিয়া তাঁহার প্রদর্শিত পুণ্যপথে আহ্বান করিতেছেন, কিন্তু সাধকের মোক্ষলাভ নিজের যত্ন চেষ্ঠা ও সাধনার উপরেই নির্ভর ।

এই নিয়ম যাহা বলা হইল তাহা আদি বৌদ্ধ সমাজে খাটে, কালসহকারে ও স্থানবিশেষে ইহার বিপর্যয় দৃষ্ট হয় । বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সিংহল, চীন, তিব্বত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে সঙ্ঘের আকার প্রকার নিয়ম বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে । তিব্বতী লামাদের মতো ইহা যে অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা আদিম বৌদ্ধধর্মের অনুমোদিত কে বলিবে ? — আচার্য্য উপাচার্য্য প্রভৃতি নানা শ্রেণীর মণ্ডিত পণ্ডিত-পুরোহিত, সমস্বরে ধর্ম সঙ্গীত গান, ধূপ-ধূনা ঘণ্টার ঘটা, বৃহৎ মঠ মন্দিরে পট পুস্তলী প্রতিষ্ঠা, শাস্তিজল সিঞ্চন, উপোষণ ও গুরু সন্নিধানে আত্মদোষ স্বীকার, পার্গেটরি-সদৃশ নরকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভোগ, সেন্ট-প্রতিম বোধিসত্ত্ব কল্পনা, পোপের স্থানীয় ধর্মযাজক লামার অধিকার ইত্যাদি অনেক বিষয়ে তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম মূলধর্ম হইতে বহুদূরে গিয়া পড়িয়াছে,—বরং আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ক্যাথলিক খৃষ্টধর্মের সহিত উহার সাদৃশ্য সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় ।

জাতি বিচার ।—

বর্ণাশ্রমের সহিত বৌদ্ধ সঙ্ঘের সম্পর্ক কি ?

এই প্রশ্নের উত্তরে গুটিকতক কথা বলা আবশ্যিক।

যদিও জাতিভেদ প্রথা উন্মূলিত করিয়া হিন্দু-সমাজ ভাঙ্গিয়া ফেলা বুদ্ধদেবের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না, তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে, বর্ণবিচার তাঁহার সমাজের পত্তন-ভূমি নহে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের গায় নীচ বর্ণের লোকেও ভিক্ষু সঙ্ঘে প্রবেশের অধিকারী। বুদ্ধদেব একস্থানে বলিয়া গিয়াছেন, “হে ভিক্ষুগণ—যেমন গঙ্গা যমুনা মহী অচিরাবতী প্রভৃতি নদনদী, যেমনই হউক না কেন, সাগরে প্রবেশ করিয়া নিজ নিজ পুরাতন নাম ধার হারাইয়া একই সাগর নাম ধারণ করে, তেমনি যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চতুর্বর্ণ আমার বিধানানুসারে গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে, তখন তাহারা পূর্ব বংশ-মর্যাদা পূর্ব নাম পরিত্যাগ করিয়া শাক্যপুত্রীয় ভিক্ষু নামেই অভিহিত হয়।” রাজা অজাতশত্রুকে সন্ন্যাসধর্মের উপদেশ প্রদান কালে বুদ্ধ বলিতেছেন—“যদি কোন রাজভৃত্য বা অনুচর গৈরিক বসন পরিধান পূর্বক কায়মনোবাক্যে শুদ্ধাচারী হইয়া ভিক্ষুবৃত্তি অবলম্বন করে, হে রাজন্, তখন কি তুমি বলিবে এ আমার ভৃত্য—আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিবে—প্রণতভাবে আমার আজ্ঞাধীন থাকিবে—সকল সময় আমার কথামত চলিবে—আমার সেবা-তৎপর থাকিবে ?” রাজা উত্তর করিলেন, “প্রভো! তাহা নহে—আমিই তাঁহার নিকট প্রণত হইব—তাঁহাকে বসিবার আসন দিব—তাঁহাকে অন্ন বস্ত্র ঔষধ পথ্য যখন যাহা আবশ্যিক তাহা দান করিব—তাঁহার সকল অভাব মোচন করিয়া, যাহাতে তিনি সর্বতোভাবে সুরক্ষিত থাকেন তাহার উপায় বিধান করিব।”

বুদ্ধ-শিষ্যের গৈরিক বসনে রাজা প্রজা, ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলেই একীভূত । একমাত্র উচ্চবর্ণের লোকে নির্বাণ লাভের অধিকারী, তাহা নহে—সুর নর, উচ্চ নীচ সকলেরই কলাগ উদ্দেশে এই ধর্ম প্রচারিত ।

বুদ্ধের প্রথম শিষ্যদলের মধ্যে আমরা রাজনাপিত উপালীর নাম দেখিতে পাই । হীন অস্পৃশ্য জাতি হইতেও যে তাঁহার সজ্জ পুষ্টলাভ করিত, এরূপ আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে । থেরাগাথায় সুনীত নিজ কাহিনী যাহা বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ করুন—

“নীচকূলে আমার জন্ম, আমি দীন দরিদ্র অজ্ঞান ছিলাম, মন্দিরের শুষ্ক ফুল ঝাঁট দিয়া মন্দির পরিচ্ছন্ন রাখা—এই আমার কাজ । লোকে আমায় হেয়জ্ঞান করিত, আমি বড়লোকের নিকট ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইতাম । ভগবান বুদ্ধ যখন তাঁহার শিষ্যগণসহ মগধের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার দর্শন লাভ মানসে আমার মাথার বোঝা ফেলিয়া দিয়া ধাবিত হইলাম । আমায় দেখিয়া তিনি রূপালু হইয়া ক্ষণেকের তরে দাঁড়াইলেন । রাজাধিরাজতুলা কোথায় সেই ভগবান বুদ্ধ, আর কোথায় আমার মত এই দীনহীন অকিঞ্চন ! আমার আবেদন শ্রুতিবার জন্ম থামিলেন । আমি প্রভূচরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলাম—প্রভো ! এই অধীনকে আপনার ভিক্ষু-দলে গ্রহণ করুন । তখন পরম রূপালু ভগবান বুদ্ধ কহিলেন—হে ভিক্ষু, এস—আমার সঙ্গে চল । এই আমার একমাত্র দাঁকা ।” পরে সুনীত কহিতেছেন, “আমি অরণ্যে গিয়া ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত রহিলাম, এবং মুক্তির উপায় অন্বেষণ করিতে

লাগিলাম। তখন দেবতারাও আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। বুদ্ধদেব আমাকে দেখিয়া হাস্ত করিয়া কহিলেন, “সদাচার শুদ্ধাচার পুণ্যবলে হীনবর্ণও ব্রাহ্মণ হয়— ব্রাহ্মণত্বের প্রকৃত লক্ষণ তাহাই।” জন্মিয়াই ব্রাহ্মণ হয় না, কর্মগুণেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হওয়া যায়—বৌদ্ধশাস্ত্রে এইরূপ ভূরি ভূরি বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বুদ্ধদেব মাতঙ্গের গল্পে বলিয়াছেন—“মাতঙ্গ চণ্ডাল নিজ কর্মগুণে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। জন্মিয়াই কেহ চণ্ডাল হয় না—জন্মিয়াই ব্রাহ্মণ হয় না—নিজ কর্মগুণেই ব্রাহ্মণ—নিজ কর্মদোষেই চণ্ডাল।” (সূত্র নিপাত)। “তিনিই ব্রাহ্মণ যিনি সত্য, প্রেম, ক্ষমা, দয়া অভ্যাস করেন—যিনি সংযমী ও জিতেন্দ্রিয়, অজ্ঞান ও পাপ-কলঙ্ক হইতে বিনির্মুক্ত।” (ধর্মপদ)। কিন্তু ইহা হইতে মনে করিবেন না যে, বুদ্ধদেব জাতিভেদ প্রথা উন্মূলন করিয়া সমাজ সংস্কারে সচেষ্ট ছিলেন। সমাজের মধ্যে যাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের উদ্ধারের চেষ্টা, হীনবর্ণকে উন্নত করিবার চেষ্টা, অথবা সামাজিক কুরীতি কুসংস্কার সংশোধন চেষ্টা, ইহার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। সমাজ সংস্কার তাঁহার ধর্মপ্রচারের অঙ্গীভূত ছিল না। রাজ্য ও সমাজ যে অবস্থায় থাকুক না কেন, তিন্তু যিনি সমাজের বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তিনি আপনার সঙ্ঘ-নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিলেই হইল। ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ও চাতুর্বর্ণ্যের অন্যাশ্রয় নিয়ম রক্ষায় তিন্তুরা হস্তক্ষেপ করিতেন না—তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, বৈদিক আচার ক্রিয়া



কাণ্ড বুদ্ধদেব ভিক্ষু-সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইতে দেন নাই । বিচার আকর বলিয়া তাঁহার নিকট বেদের কোন মাহাত্ম্য ছিল না; তিনি নিজে প্রবুদ্ধ হইয়া যে মহাসত্য উপার্জন করিয়াছিলেন, তাহা বেদেরও অনধিগম্য, বেদবাক্য হইতেও উচ্চতর । সে সত্য বিশ্বজনীন, দেশবিশেষে অথবা জাতিবিশেষে বদ্ধ নহে । তিনি সেই সত্য, ব্রাহ্মণ শূদ্র, উচ্চ নীচ সকলেরই মধ্যে প্রচার করিতে ব্রতী হইলেন, তাঁহার সঙ্ঘের দ্বারও সকলেরই জন্ম উন্মুক্ত হইল ।

জাতিভেদ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মতামত সমালোচনা করিয়া, Rhys-Davids তাঁহার অস্বর্গ সূত্রে ( Dialogues of the Buddha গ্রন্থে ) যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভূমিকার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ।—

বুদ্ধের সময়ে জাতিভেদ প্রথা প্রথম গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ হয় । আমরা দেখিতে পাই, সেকালে জনসঙ্ঘ সাধারণতঃ চার ভাগে বিভক্ত ছিল । কিন্তু এই প্রভেদের সীমা সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট ছিল না । এক প্রান্তে সমাজবহির্ভূত অস্পৃশ্য অনার্য্যগণ— অপর প্রান্তে ব্রাহ্মণবংশ-সম্বৃত জনপদ । এই ব্রাহ্মণগণের পৌরোহিত্য ব্যতীত অন্য ব্যবসায়ও ছিল । শৌচাশৌচের নিয়ম রক্ষা করিয়া সামাজিক বিধিসকল গঠিত হইয়াছিল । সত্যতার সমান অবস্থায় এই একই বিধান অন্যান্য দেশেও প্রচলিত দেখা যায় । ব্রাহ্মণগণের আধিপত্যস্বরূপ ভারতের সমাজ-মণ্ডলের যে বিশিষ্ট স্তম্ভ, তখনও তাহার সুদৃঢ় স্থাপনা হয় নাই । অধুনা জাতিভেদ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তখনও তাহার অস্তিত্ব ছিল



না । এই সামাজিক অবস্থার মাঝে বুদ্ধ স্বীয় কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন । ইহার দুইটি ভাগ আমরা দেখিতে পাই— সঙ্ঘের ভিতরে ও বাহিরে তাঁহার বিভিন্ন কার্যপ্রণালী ; কিন্তু আসলে এই উভয়ের কোন বিরোধ ছিল না—উভয় ক্ষেত্রে একই মনোভাবের উদ্দীপনা অনুভূত হয় ।

প্রথমতঃ তাঁহার কর্তৃত্বাধীন ধর্মসঙ্ঘে তিনি জাতিভেদের কোনরূপ প্রশ্রয় দিতেন না । তিনি জন্মগত, কর্মগত, পদগৌরব কিম্বা অগৌরবমূলক জাতিভেদের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করিতেন না । যাগ বজ্রানুষ্ঠান, শোচাশোচঘটিত যে প্রভেদ ও হীনতার সৃষ্টি হয়, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছিলেন ।

দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে, হীন নাপিতজাতীয় উপালী তাঁহার সঙ্ঘের একজন সম্মানিত সভ্য ছিলেন, গৌতমের পরেই সঙ্ঘের নিয়মাদি সম্বন্ধে তাঁহার মতামতের প্রাধান্য দেখা যায় । খেরাগাথায় যে সুনীতের পদাবলী উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে, তিনিও অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত ছিলেন । বৌদ্ধসঙ্ঘে এইরূপ হীনজাতীয় লোকদের প্রবেশাধিকার ছিল, তাহার বহুতর উদাহরণ দেখিতে পাই । কেবলমাত্র এক বিষয়ে দেখিতে পাই, তিনি সম্মাস গ্রহণ সম্বন্ধীয় প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং এই বিরোধের সম্যক কারণও ছিল । অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় তিনি দাসজাতীয় লোকদিগকে দলভুক্ত করিতে সম্মত হইতেন না । বৌদ্ধ-সঙ্ঘের একটি বিশেষ নিয়ম ছিল যে, পলাতক দাসকে সঙ্ঘভুক্ত করা হইবে না । দীক্ষাকালে অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে দীক্ষার্থীকে আত্ম-পরিচয়ে জানাইতে হইত যে, সে

ক্রীতদাস নহে। যখনই কোন দাসকে সজ্বভুক্ত করা হইত, তখনই সে যে প্রভুর সম্মতিক্রমে কিম্বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া এই দীক্ষা গ্রহণ করিল, তাহা বিশেষভাবে জানাইতে হইত।

দ্বিতীয়তঃ—সজ্জের বাহিরে সাধারণ সমাজে, জাতিভেদ সম্বন্ধে কুসংস্কারসকল তিনি ধীমান ব্যক্তির ন্যায় যুক্তিযুক্ত উপদেশ ও সম্যক বিচারবুদ্ধির দ্বারা দূরীভূত করিবার প্রয়াস পাইতেন। সূত্র নিপাতের কোন কোন সূত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—যথা, জাতিবিশেষের সহিত একত্র পানভোজন কিম্বা তাহাদের স্পৃষ্ট অথবা পক্ক আহাৰ্য্য গ্রহণে পাপ স্পর্শে না,— কুচিন্তা, কুবাক্য, এবং কুকর্মের দ্বারাই লোকে পাপভাগী হয়। বুদ্ধ-পূর্ব্ব শাস্ত্রেও এই নীতির অভাব নাই, কিন্তু সাধারণতঃ জাতি-ভেদ সম্বন্ধে মতামত তাঁহার নিজস্ব, তাহা আর অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিসকল তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, এবং ঐতিহাসিক। সূত্র নিপাতের বশিষ্ঠ সূত্রে (যাহার কতকগুলি শ্লোক ধর্ম্যপদে স্থান লাভ করিয়াছে) প্রশ্ন এই যে, মানুষ কিসে ব্রাহ্মণ পদবীর যোগ্য হয়? উত্তরে, বুদ্ধ প্রশ্নকারককে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, উদ্ভিদ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক শ্রেণী নিজ নিজ লক্ষণবিশেষের দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে; কেবলমাত্র মানুষই এই বিশেষত্ববর্জিত। আধুনিক বিজ্ঞানও তাঁহার এই মতের সমর্থন করে। অন্যান্য সূত্রেও তিনি এই একই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, মধুর সূত্রে, কাত্যায়ন এবং মধুর রাজ, এই উভয়ের প্রশ্নোত্তর কথোপকথন আছে। মধুর রাজ বলিতেছেন, “ব্রাহ্মণগণ বলেন, তাঁহারা সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, একমাত্র ব্রাহ্মণগণই সাদা অন্য সকলেই কালা, তাঁহারা শুদ্ধ, অপর সকল জাতিই অপরিশুদ্ধ, ব্রাহ্মণেরা সৃষ্টিকর্তার মুখ হইতে জন্ম লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার গৌরবের উত্তরাধিকারী—এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি ?” উত্তরে কাত্যায়ন বলিলেন, সাধারণ জীবনক্ষেত্রে আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই, ঐশ্বর্যবান ব্যক্তি সকল বর্ণের দ্বারাই সম্মানিত ; এক্ষেত্রে ‘দ্বিজ’ কোন বিশেষ গৌরব প্রাপ্ত হইবেন না।

দ্বিতীয়তঃ—বর্ণ নির্বিশেষে মনুষ্য মাত্রই সদসৎকর্ম অনুসারে উচ্চ নীচ জন্ম গ্রহণ করে।

তৃতীয়তঃ—চোর দস্যু প্রভৃতি অপরাধীগণ যে-কোন বর্ণেরই হোক না কেন, দুষ্কৃতির জন্য যোগ্য শাস্তি ভোগ করে। পরিশেষে ধর্ম সজ্জ্বলুকে যে কোন বর্ণেরই সাধু কি সন্ন্যাসী হউন না কেন, সাধারণের নিকট হইতে সমান শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়া থাকেন।

এই জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব স্বীয় মতামত যাহা ব্যক্ত করিতেন তাহা জনসাধারণে গৃহীত হইয়া সফলপ্রায় হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। যদি তাঁহার সেই মত ভারতবাসীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিত, তাহা হইলে ভারতের সমাজ-নীতি পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই, এবং এই দেশের আধুনিক জাতিভেদ-প্রথা আর মাথা তুলিতে পারিত না।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

সজ্জের নিয়মাবলী ।

প্রবেশ ।—

বৌদ্ধ সজ্জের অব্যবহিতদ্বার, যাহার ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারে ; প্রথম প্রথম প্রবেশ নিয়মের কঠোরতা ছিল না । বুদ্ধ-দেবের জীবদ্দশায় যে-সকল শিষ্য ধর্ম্য ও সজ্জের শরণাপন্ন হইত, তাহাদের পরীক্ষার কাল সামান্যতঃ ৪ মাস নিরূপিত ছিল, কিন্তু যোগ্য পাত্র হইলে সে নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটিত । ~~দৃষ্টান্ত~~ স্বরূপ বলি, বুদ্ধ যখন মল্লদের শালবনে মৃত্যুশয্যায় শয়ান, সেই সময় সুভদ্র নামক একটা ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আনন্দকে ডাকিয়া বলিলেন “আমি অনেকানেক বয়োবৃদ্ধ সাধু পুরুষের নিকট শুনিয়াছি তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাব জগৎ দুর্লভ, তিনিই এইক্ষণে আবির্ভূত হইয়াছেন । আজ রাত্রে কি শ্রমণ গোতম ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন । আমনে নানা সংশয় আসিয়া সতাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয় আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, একমাত্র শ্রমণ গোতম সেই সংসন্দেহ দূর করিতে সক্ষম । আমি তাঁহার দর্শন লাভ আশায় আসিয়াছি—তাঁহার কি দর্শন পাইব ?”

আনন্দ কহিলেন—“এখন থাক—আর না—তৎসংসার বিরক্ত করিও না । তিনি এখন পীড়িত ।”

এই কথোপকথন ভগবান বুদ্ধ তাঁহার রোগশয্যায় শুনিয়া পাইয়া আনন্দকে ডাকিয়া कहিলেন—“আনন্দ! সুভদ্রকে আসিতে দেও । তিনি জ্ঞানলাভ মানসে আসিয়াছেন, আমাকে বিরক্ত করিবার জন্ম নয় । তিনি যাহা শুনিতে চান আমি সাধ্যমত উত্তর দিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিব, তাঁহাকে আসিতে বারণ করিও না ।”

তাঁহার অনুমতি ক্রমে সুভদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । সুভদ্র প্রথমে ষট্‌তীর্থকরের\* প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া

\*পুরণ কাশ্মপ, মঙ্করী গোশাল, অজিত কেশকম্বল, ককুধ কাত্যায়ন, সঞ্জয় বেলাস্থিপুত্র, নিগ্রহ নাথপুর, বুদ্ধের সময় এই ছয়জন উপাধ্যায়ের নাম শুনা যায় । ইহারা ষট্‌তীর্থকর বলিয়া পরিচিত ।

জনসমাজে ইহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি বিলক্ষণ ছিল । ইহাদের শ্রোতাকের বহুসংখ্যক শিষ্য ছিল । সারীপুত্র ও মুদগলায়ণ—বুদ্ধের ষট্‌তীর্থকর প্রধান শিষ্য—তাঁহাদের আদি গুরু সঞ্জয় । ইহারা ছয়জন বুদ্ধবিষেবা ছিলেন, এবং বুদ্ধদেবকে অপদস্থ করিবার বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই ।

প্রথমে তাঁহারা রাজা বিম্বিসারের নিকট গিয়া বুদ্ধের বিরুদ্ধে অভিযোগ রন । সেখানে বিফলমনোরথ হইয়া কোশলরাজ্য প্রমেনজিতের নিকট গমন করেন, এবং তাঁহাকে নানা বাহুকরী কৌশল দেখাইয়া হত করেন । কিন্তু বুদ্ধদেবের অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রভাবে তাঁহাদের লক্ষ্যসকল ব্যর্থ হয় । বুদ্ধদেব যখন ধর্ম প্রচারের জন্ম শ্রাবণের অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এই তীর্থিকগণ তাঁহাকে নানারূপ যড়যন্ত্র করেন । তাঁহারা একদিন চিঞ্চানামক এক কুমন্ত্রণা দিয়া বুদ্ধের নিকট পাঠাইয়া দেন । তাহার দুই ত্রি পরে প্রচার করেন যে চিঞ্চা গর্ভবতী হইয়াছে, এবং বুদ্ধই এর কারণ । ক্রমে তীর্থিকদের যড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং এর সর্বৈব মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয় । অবশেষে তাঁহারা অগত্য গণ নিতান্ত দীনভাবে কালহরণ করিতে লাগিলেন । প্রবাদ এই ষট্‌তীর্থকর অগ্রণী পুরণকাশ্মপ বলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন ।

তাহাদের নিয়ম । কিন্তু অর্যাই তাহাদের প্রশস্ত বাসস্থান, তাহারাই ভারতে গৃহনির্মাণ কৌশলের সূত্রপাত করিয়া যায় । ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে স্তূপ চৈত্য বিহারের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহা তাহাদেরই হস্ত-রচনা । গিরি খুদিয়া গুহাশ্রম নির্মাণ করায় যে কি বিপুল পরিশ্রমের ব্যয়, তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন । এই সকল গিরিমন্দির কোন কোনটা দ্বিতীয় বা তৃতীয় খৃষ্টাব্দে বিরচিত । এইরূপ নির্মাণের উৎকৃষ্ট নমুনা পুণা সমীপস্থ কালীগুহা খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দে রচিত হয় । হিন্দুদের দেবদেবীমন্দির সে দিনকার রচনা—যেন বৌদ্ধমন্দিরের দেখাদেখি তাহাদের সূত্রপাত মনে হয়; আর যে বৌদ্ধ ধর্ম কঠোর জ্ঞান ও নীতির ধর্ম, যাহাতে ভজন পূজনের বিধি ব্যবস্থা কিছুই নাই, ক্রিয়া কাণ্ডের কোন বাহ্যাদম্বর নাই, আশ্চর্য্য যে তাহার সেবকেরাই প্রকাণ্ড শিলাস্তম্ভ স্তূপ চৈত্য বিহার প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া তাহাদের হস্তচিহ্নসকল নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছেন । বিহার ও চৈত্য ব্যতীত বৌদ্ধেরা তাহাদের তীর্থক্ষেত্রে বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঘণ্টাকৃতি স্তূপসমূহ নির্মাণ করিত, কোন কোন স্তূপ আশ্চর্য্য কারুকার্য্যময় রেলিং বেষ্টিত ; এই সকল স্তূপের মধ্যে ভূপালের অন্তর্গত ভিলসা স্তূপ সুপ্রসিদ্ধ । কাশীষাত্রীগণ সারনাথ ক্ষেত্রের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছেন ; তাহার সেখানকার স্তূপও দেখিয়া থাকিবেন, তাহা সেই ক্ষেত্র স্মরণ করাইয়া দেয় যেখা । গৌতম তাহার ধর্মচক্র প্রথম প্রবর্তিত করেন । এতদ্বিন্ন গিরিগুহা-নিহিত চৈত্য বিহার



প্রভৃতি কোথায় না প্রক্ষিপ্ত? সপ্তগর্গী,—যেখানে প্রথম বৌদ্ধ-সভার অধিবেশন হয়,—নাসিকের লেনা, কালাী, অজন্তা, সালুসেট দ্বীপস্থিত কাহেরীর গুহামন্দির, ভুবনেশ্বরের খণ্ডগিরি উদয়-গিরির গুহাশ্রম, এই সমস্ত চিরস্মরণীয় বৌদ্ধকীর্তি ভারতে প্রকীর্ণ দেখা যায়।

দারিদ্র্য ব্রত।—

দারিদ্র্য ও সংযম, বৌদ্ধমণ্ডলীর এই দুই মহাব্রত। সোনা রূপা গ্রহণ করা তাহাদের একেবারেই বারণ,—যদি কোন গৃহস্থ দান করেন, ভিক্ষু তাহা নিজের জন্ম রাখিতে পারিবেন না। হয় তাহা দাতাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, কিম্বা অন্য কোন গৃহস্থের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে, যিনি তাহার বিনিময়ে ঘৃত লবণ তৈল তণ্ডুল প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল দান করিলে, তাহা অপর ভিক্ষুদের জন্ম গ্রহণ করিতে পারিবে, নিজের জন্ম নয়। সোনা রূপার ব্যবহার লইয়া অতি প্রাচীন কাল হইতে ভিক্ষুদলে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, এবং বৈশালী সভায় এই বিষয় লইয়া বিষম আন্দোলন হয়। যে সকল ভিক্ষু এই নিয়ম পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন, অবশেষে তাহাদেরই পরাভব হইল, এবং অনেক শতাব্দী পর্য্যন্ত এই নিবৃত্তি ব্যবস্থা ভিক্ষু মণ্ডলীর মধ্যে সুরক্ষিত থাকে। ইহা ছাড়া ভূমি দাস দাসী রাখা, অথবা অন্য গো মেঘাদি পশু পালন করা ভিক্ষুদের নিবেদ্য। চাষরাস কৃষিকার্য্যও নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়। এক কথায়, ভিক্ষুর পক্ষে দারিদ্র্য ব্রত এংগপংগে পালন করা বিধেয়। তাহাদের বিষয় সম্পত্তি সব মিলিয়া অষ্টবিধ—বসনব্রত, কটিবন্ধ,



ভিক্ষাপাত্র, ক্ষুর, সূচি, জীবহত্যা নিবারণোপযোগী জল ছাঁকিবার বাসন। যদিও প্রত্যেক ভিক্ষুর জন্ম এই ব্যবস্থা, তথাপি ভিক্ষুসজ্জের কথা স্বতন্ত্র। গ্রন্থ প্রভৃতি অস্থাবর বস্তু ছাড়িয়া দেও, ভূমি বিহার প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তি, সজ্জ তাহারও অধিকারী ছিল। বুদ্ধদেব স্বয়ং সজ্জের জন্ম এই সমস্ত উপহার গ্রহণ করিতেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রত্যেকে যতই নির্ধন হউন না কেন, অনেকানেক বৌদ্ধ-ক্ষেত্র রাজা ও শ্রীমন্তু গৃহস্থের প্রসাদে বিপুল ঐশ্বর্যশালী ছিল সন্দেহ নাই; ইউরোপের মধ্যযুগের খৃষ্টীয় দেবালয় অপেক্ষা তাহাদের ধনসম্পত্তি অল্প ছিল না।

পূজা।—

আমরা দেখিয়াছি বৌদ্ধধর্ম নীতিপ্রধান ধর্ম, তাহাতে বৈদিক হোম যাগ ক্রিয়াকলাপ নাই—যজ্ঞে পশুবলি তাহার অহিংসাধর্মের অনুমোদিত নহে। ব্রাহ্মণ্যের ভজন পূজনের বিধিব্যবস্থাও তাহাতে নাই। বৌদ্ধদের দেবপূজার পাত্র ও প্রণালী স্বতন্ত্র, এবং দেবালয় প্রভৃতি পূজার উপকরণও নাই। ধর্ম সাধনের জন্ম আশ্রম চাই, তাই দেবমন্দিরের বদলে বৌদ্ধ ক্ষেত্র সাধকমণ্ডলীর বাসোপযোগী চৈত্য বিহারে সমার্ক তবে কি বৌদ্ধ শাস্ত্রে পূজার নিয়ম আদতেই নাই? প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আমরা যাহা ভাষায় পূজা বলি—কোন দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা—এরূপ সাধনা আদি বৌদ্ধধর্মের অঙ্গ ধর্মোপদেশে দেবারাধনার কোন বিধান

বুদ্ধদেব স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে—হে ইন্দ্র, হে সোম, হে বরুণ, এইরূপ প্রার্থনার কোন ফল নাই। বৌদ্ধ জগতে স্বয়ং বুদ্ধদেব দেবতার আসনে আসীন ছিলেন। তিনি যতকাল জীবিত ছিলেন, ততকাল তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া ভক্তেরা তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিত, এবং তাঁহার পরিনির্ব্বাণের পর কালক্রমে বুদ্ধই দেবাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বুদ্ধ ছাড়া বোধিসত্ত্ব-কল্পনা বৌদ্ধদের মধ্যে কিরূপে উদয় হইল, তাহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। এইক্ষণে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হিন্দু দেবদেবী আর বৌদ্ধ দেবতা, ইহাদের মধ্যে এক বিষয়ে পার্থক্য আছে। হিন্দু শাস্ত্রের মতে রাম-কৃষ্ণাদি দেবগণ মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন; বৌদ্ধ মতে মনুষ্যগণ সাধনাগুণে অর্হৎ, বোধিসত্ত্ব, বুদ্ধ এইরূপে উত্তোরোত্তর দেবত্ব-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সে যাহা হউক, মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধদের মধ্যে আমাদের মত দেবপূজার ব্যবস্থা নাই—ব্রাহ্মণ্যের দেবতার স্থানে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত—তাহাদের লইয়াই বৌদ্ধদের পূজাৰ্চনা।—এই সকল দেবতার মধ্যে বুদ্ধদেবের সর্ব্বোচ্চ আসন—ভক্তি সহকারে বুদ্ধের অর্চনা—তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষণ—তীর্থ—তাহা ছাড়া তাঁহার উপদিষ্ট ধর্ম পালন—এই সমস্তই ধর্ম।

১ ধ্যান সমাধি।—

যে যেন দেবারাধনা, স্মৃতি প্রার্থনা, ভজন পূজনের  
বুদ্ধদের সেইরূপ ভাবনা ধ্যান ও সমাধি।

বিষয় বাসনা হইতে বিরত হইয়া ভিক্ষুদিগকে বিরলে পঞ্চ ভাবনা সাধন করিতে হয় ।—মৈত্রী, করুণা, মুদিত, অশুভ ও উপেক্ষা, ভাবনা এই পাঁচ প্রকার ।

মৈত্রী—কি দেবতা কি মনুষ্য সকল জীবই সুখী হউক, শত্রুরও কল্যাণ হউক, সকলেই রোগ শোক পাপ তাপ হইতে মুক্ত হউক, এইরূপ শুভ চিন্তাকে মৈত্রী ভাবনা বলে ।

করুণা—দুঃখীর দুঃখে সমবেদনা অনুভব করা, জীবের কিসে দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন হয়, অহরহ এইরূপ চিন্তা করা করুণা ভাবনা ।

মুদিত—ভাগ্যবান ব্যক্তির সুখে সুখী হওয়া, তাহাদের সুখ সৌভাগ্য স্থায়ী হউক, এই চিন্তা মুদিত ভাবনা ।

অশুভ—শরীর ব্যাধিমন্দির, তড়িৎসম ক্ষণস্থায়ী, মরো-চিকার স্তায় অসত্য, এবং মূত্রপূরিষে পরিপূর্ণ ঘৃণিত বস্তু, মানব জীবন জন্মমৃত্যুর অধীন, দুঃখময় ও ক্ষণভঙ্গুর, এইরূপ ভাবনাকে অশুভ ভাবনা বলে ।

উপেক্ষা—সকল জীবই সমান, কোন প্রাণী অপব প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর প্রীতি বা অধিকতর ঘৃণার আশ্পদ নয় ; বল দুর্বলতা, ঘেষ মমতা, ধন দারিদ্র্য, যশ অপযশ, জরা, যৌবন সুন্দর অসুন্দর, সকল গুণ, সকল অবস্থাই সমান—এই সাম্য ভাবনা উপেক্ষা ভাবনা বলিয়া অভিহিত হয় ।

ভিক্ষুগণ প্রাতঃসন্ধ্যা বিরলে বসিয়া এই পঞ্চ ভাবনা অত্যাঁস করিতেন ।

ধ্যান ।—

বৌদ্ধমতে ধ্যান পরম পদার্থ । জীবনের মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে ধ্যান ও সমাধি দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধন একান্ত আবশ্যিক । যে সকল বিষয় চিত্তকে সেই মহান লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত করে, সেই সমস্ত দূর করিতে হইবে— “তত্রতত্রোভিনন্দিনী” চিত্তবৃত্তি, অর্থাৎ প্রজ্ঞাপতির ম্যায় ফুল হইতে ফুলে রমণ করিতে চায় এমন যে চপলা প্রবৃত্তি, তাহা বশীকৃত করিয়া বিষয়াসক্তি হইতে বিরত হইতে হইবে ; এইরূপ নির্লিপ্ত ভাবে নির্জনে ধ্যানানন্দ উপভোগ করা ধ্যানের প্রথম সোপান । ধ্যানের এইরূপ উত্তরোত্তর চারিটি সোপান আছে । উচ্চ হইতে উচ্চতর ধাপে উঠিতে হইলে চিত্তকে অধিকতর সংযত করিয়া যে বিষয়টি ভাবিতেছ তাহার সহিত একান্ত তন্ময় হইয়া বাওয়া আবশ্যিক । ধর অরূপলোকের ধ্যান করিতেছ— রূপলোকের সমুদায় কল্পনা মন হইতে দূর করিতে হইবে, এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ের অগোচর অলৌকিক ভাব ও অবস্থায় চিত্তের তন্ময়তা সাধন করিতে হইবে, যেন তুমি এ পৃথিবীর জীব নও, অরূপলোকে বাস করিতেছ । বৌদ্ধমতে কঠিন যোগ সাধনা দ্বারা কোন কোন যোগী এই প্রকার অলৌকিক শক্তি-বাহিনী সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । ধ্যানবলে ধ্যানের বিষয়ের সহিত যে পরিমাণে তন্ময়ীভাব হইবে, সেই পরিমাণে সিদ্ধিলাভ । ধ্যানের সর্বোচ্চ অবস্থা সেই, যাহাতে জীব সুখ দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শান্ত শান্তিরসে নিমগ্ন হইয়েন—যে অবস্থায় ভাবজ্ঞানও নাই, অভাব

জ্ঞানও নাই, কেবল স্মরণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, চিত্ত শান্তি-  
মিলিলে মগ্ন হয়। এই মহা ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বুদ্ধদেব নির্বাণ  
প্রাপ্ত হন।

সমাধি।—

বহির্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মার একাগ্রতা সাধনের  
নাম সমাধি। পঞ্চভূত অনিত্য ও পরিবর্তনশীল, একাগ্রচিত্ত  
হইয়া এই সমস্ত অনিত্য ভাবাদি পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিবে।  
করিতে করিতে সেই ভাব মনোমধ্যে নিতান্ত পরিষ্কৃত হইয়া  
উঠিবে। সমাধি ইহার উত্তরীয় অবস্থা। গৌতমবুদ্ধে .সমগ্র  
চারি প্রকার ধ্যানের অনুষ্ঠান করেন, তাহার দ্বিতীয় ধ্যানটী  
সমাধিজাত বলিয়া লিখিত আছে। সমাধি দ্বারা ছয় প্রকার  
অভিজ্ঞা উপার্জন করা যায়; দিব্য দর্শন, দিব্য শ্রবণ, অশ্রুত  
মনোভাব পরিজ্ঞান, পূর্বজন্ম স্মৃতি, রিপুদমন ক্ষমতা, অলৌকিক  
শক্তি ( ঋদ্ধি ) অর্জন।

তীর্থদর্শন।—

পূজার অপর অঙ্গ তীর্থদর্শন অতি প্রাচীন কাল হইতেই  
বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত দেখা যায়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে চারিটী তীর্থ  
নির্দিষ্ট আছে—

- ১। যেখানে বুদ্ধের জন্ম
- ২। যেখানে তাঁহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি
- ৩। যেখানে তিনি ধর্মচক্র প্রবর্তিত করেন
- ৪। যেখানে তাঁহার নির্বাণ

এই সকল স্থান পরিদর্শন মানসে ভিক্ষু ভিক্ষুণী উপাসক উপাসিকা তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন । বুদ্ধদেব বলিয়া গিয়াছেন যিনি এই চতুস্তীর্থ দর্শন করিয়া দেহত্যাগ করেন, তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করেন ।

এই সমস্ত বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র এখন কতক ভগ্ন, কতক ভগ্ন-প্রায়, কতক রূপান্তরিত, কতক বা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ।

### কপিলবস্তু ।—

বুদ্ধদেবের জন্মভূমি যে কপিলবস্তু, সে এখন কোথায় ? তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাহার ধ্বংস হয় । তিনি নিজে ত রাজ্যত্যাগ করিয়া ধর্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করিলেন, পরে তাঁহার পুত্র রাহুল ও আত্মীয় স্বজনকে স্বপক্ষে আনিয়া রাজ্যের স্তম্ভসকল শিথিল করিয়া দিলেন—ইহাদের বিয়োগে তাঁহার পিতার যে ভয়ানক কষ্ট হয়, তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে । কষ্টের কারণ যথার্থই ছিল । ছিদ্র পাইয়া বাহির হইতে শত্রুদল রাজ্য আক্রমণ করিল । বুদ্ধের নির্বাণের তিন বৎসর পূর্বে কোশলাধিপতি প্রসেনজিতের পুত্র ও উত্তরাধিকারী কপিলবস্তু ধ্বংস এবং শাক্যবংশ নিপাত করেন । চীন পরিব্রাজকেরা এই বিখ্যাত নগরীর ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখিয়াছিলেন । কালক্রমে তাহার চিহ্নমাত্রও রহিল না । সম্প্রতি বিস্তর অনুসন্ধানের পর প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অশোকের একটি খোদিত স্তম্ভ হইতে কপিলবস্তুর বাস্তুভূমি

নেপাল সমীপে নির্গম করিয়াছেন । ছয়েন সাঙের বর্ণনা অনুসারে ঐ স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয় ।

বুদ্ধ গয়া ।—

এই স্থানে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব পাইয়াছিলেন বলিয়া ইহা বৌদ্ধদের মহাতীর্থ; Jerusalem যেমন খৃষ্টানদের, বৌদ্ধদের পক্ষে ইহাও সেইরূপ । ইহার সঙ্গে বুদ্ধদেবের অশেষ স্মৃতিচিহ্ন জড়িত আছে । অশোক রাজা এইস্থানে এক বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেন—এই মন্দির মধ্যে মধ্যে ভগ্ন ও নবীকৃত হয়, এইক্ষণে আবার পুনর্নবীকৃত হইয়া ছয়েন সাঙের বর্ণনানুযায়ী তাহার পূর্বাকার ধারণ করিয়াছে । এইক্ষণে আর সেই বোধিবৃক্ষ নাই, যাহার তলে বুদ্ধের বোধনেত্র খুলিয়াছিল । মন্দিরের পিছনে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ এক অশ্বখ বৃক্ষ তৃতীয় খৃষ্টাব্দে রোপিত হয়, এখন তাহাই আছে । প্রবাদ এই যে, মূল বৃক্ষের এক শাখা মহেন্দ্রের ভগিনী সজ্জমিত্রা সিংহলে লইয়া যান, সেখানে তাহা প্রকাণ্ড অশ্বখে পরিণত হইয়াছে । হায়, বৌদ্ধ ধর্মেরও দশা এইরূপ ! জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া পরদেশে তাহার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া পড়িল ।

বুদ্ধ গয়ার বোধিবৃক্ষ কোথায় কি অবস্থায় ছিল, তাহা ছয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায় । বৃক্ষের পূর্বভাগে এক লক-চূড় এক বিহার ছিল, তাহার প্রবেশ-দ্বারের উত্তরে একদিকে অবলোকিতেশ্বর, অন্যদিকে মৈত্রেয়ের মূর্তি স্থাপিত । বৃক্ষের উত্তরে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব পাইবার পর পদচারণা হইল । তিনি সাতদিন ধ্যানমগ্ন থাকেন, পরে উঠিয়া



যেখানে তিনি সাতদিন পাঠচারি করিয়া বেড়ান, আবার যেখানে তিনি দুই বণিকপুত্র ত্রপুষ ও ভল্লিকের হস্ত হইতে উপোষণান্তে মধুপিষ্টকপূর্ণ পিণ্ডপাত্র গ্রহণ করেন, এই সকল স্থান ও অগ্ণ্যান্ত অনেক বিষয় ছ্যেন সাং তাঁহার গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন । এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, ত্রপুষ এবং ভল্লিক বুদ্ধের দুই প্রথম গৃহস্থ শিষ্যরূপে তাঁহার 'ধর্ম্যে' দীক্ষিত হন—'সজ্জ' তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । বুদ্ধ-গয়ায় বুদ্ধের এইরূপ কত কত কীর্ত্তি-চিহ্ন রহিয়াছে তাহার অন্ত নাই ।

সারনাথ ।—

ইহা কাশী সমীপস্থ বৌদ্ধতীর্থ; এই স্থান হইতে বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্যচক্র প্রথম প্রবর্তিত করেন । সারনাথ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের একটি প্রধান স্থান ছিল । বুদ্ধ বর্তমান থাকিতেই সারনাথ বিহার প্রস্তুত হয় । তথায় বৌদ্ধদের অনেক দেবালয় ও দেব মূর্ত্তি এবং উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় ছিল । এই সারনাথ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । তাহার চারিদিকে এরূপ প্রভূত ভস্মরাশি বিদ্যমান আছে যে, দেখিয়া বোধ হয় বৌদ্ধদেবী শক্রপক্ষীয়ে সমুদায় ভস্মীভূত করিয়াছে । এই ক্ষেত্রে অশোকের স একটি স্তূপ নির্মিত হয় ; এখনও সে স্তূপ রহিয়াছে এবং ছ্যেন সাং দেখিয়াছিলেন । এই স্তূপের অনতিদূরে বম-সাহেব একটি প্রস্তরখণ্ড আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে তন্ম, বুদ্ধ প্রাপ্তি, কাশীতে উপদেশ ও নির্বাণ, তঁার ঘটনাসম্বন্ধীয় প্রতিমূর্ত্তি সকল খোদিত আছে ।

ৱে

রাজগৃহ ।—

বিশ্বিসারের রাজধানী । বুদ্ধ কপিলবস্তু হইতে নিক্রমণ করিয়া এখানে দুইজন ব্রাহ্মণ আলাড় কালাম এবং রুদ্রকের নিকট প্রথমে ধর্মোপদেশ গ্রহণ করেন ।—যদিও তাহাদের প্রদর্শিত পথ তাঁহার মনোনীত হয় নাই, তথাপি তাহাদের শিক্ষা ও উপদেশ একেবারেই নিরর্থক হইয়াছিল বলা যায় না, সে শিক্ষার ফল ভবিষ্যতে তাঁহার নিজের উপদেশে ফলিত দেখা যায় । রাজগৃহের বেণুবন ও গৃধ্রকূট পর্বত বুদ্ধদেবের প্রিয় আবাসস্থান ছিল । বুদ্ধের জীবনী সংক্রান্ত আরও অনেক ঘটনা এই স্থানে সংঘটিত হয় । সারীপুত্র ও মুদগলায়ন, গৌতমের দুই প্রধান শিষ্যের অশ্রুজিতের সঙ্গে এখানেই প্রথম আলাপ পরিচয় । গুরুর বিরুদ্ধে দেবদত্তের ষড়যন্ত্রেরও এই স্থান । ইহার নিকটেই সপ্তপর্ণী গুহা, যেখানে বৌদ্ধ সভার প্রথম অধিবেশন হয় । বুদ্ধের শেষ বয়সে, যখন তিনি বেণুবনের বিহার হইতে রাজগৃহের গৃধ্রকূটে ফিরিয়া যান, তখন রাজা

শত্রু বৃজ্জাতীয় লোকদিগকে আক্রমণের পন্থা দেখিতে—

। ঐ জাতি গঙ্গার উত্তর পাড় মগধের সামনে বাস

। অনায়াসে বৃজ্জ জাতির সমুচ্ছেদ সাধন করিতে

বন কি না, তাহা জানিবার জন্ম অজাতশত্রু স্রীয় অমাত্য

১৫৪ রকে বুদ্ধদেবের নিকট প্রেরণ করেন । গৌতম বলিয়া—

১৫৫ ষতদিন বৃজ্জিগণ পরস্পর ঐক্য বন্ধনে বদ্ধ থাকিবে,

১৫৬ উহারা মিলিত হইয়া কার্য্য করিবে, স্বধর্ম পালনে রত

১৫৭ া, ষতদিন উহাদের মধ্যে কুলস্ত্রী ও কুলকুমারীগণ পূজিত

হইবেন, যতদিন উহারা অর্হংগণের রক্ষা ও পালন করিবে, ততদিন বৃজি জাতির স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে না। ঐ প্রসঙ্গে তাঁহার ভিক্ষু সঙ্ঘ যাহাতে ধর্মের আশ্রয়ে ঐক্যসূত্রে মিলিত হয়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটন না হয়, তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন।

পাটলীপুত্র ।—

শুরুজী গঙ্গাপার হইবার সময় দেখিলেন—অজাতশত্রু পাটলীপুত্রের ঠিকানায় বৃজিদের আক্রমণ নিরোধ উদ্দেশে এক দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিতেছেন। সেই সময়ে তিনি পাটলীপুত্রের ভাবি গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধির কথায় সকলকে আশ্বাসিত করিয়া তাহার ভাবি দুর্গতির কারণও নির্দেশ করিলেন। “নগরের তিন শত্রু, অগ্নি, জল ও গৃহ-বিচ্ছেদ।” এই ভবিষ্যদ্বাণীতে শ্রীত হইয়া, যে দ্বার দিয়া গৌতম গঙ্গাবতরণ করেন, নগরাধ্যক্ষ তাহার নাম ‘গৌতম-দ্বার’ রাখিবার আদেশ করিলেন। রাজ-গৃহের পর পাটলীপুত্রই মগধের রাজধানী হইল—অশোকের রাজধানী তাহাই। এই নগরীর আধুনিক নাম পাটনা !

কোশল ।—

নয়ঃ

কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবের একজন ছিলেন। একদা তিনি বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া :  
রাজা তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন,—“ভগবন্ ! :  
সদৃশ সদগুরু আমি কখনো দর্শন করি নাই। বিজ্ঞান :  
পৃথিবীতে যত অশাস্তির কারণ। লোকেরা তথাপি :  
আশ্রয় না করিলে তাহাদের কল্যাণ হইবে না।” বে ৯

প্রসেনজিতের ভগিনীর সহিত মগধরাজ বিশ্বিসারের বিবাহ হয়। বিশ্বিসার যৌতুক স্বরূপ শ্রাবস্তী রাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি অজাতশত্রু কর্তৃক নিহত হইলে, প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তী ফিরিয়া লয়েন। এই সূত্রে অজাতশত্রু ও প্রসেনজিৎ, এই দুই রাজার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন কালে প্রসেনজিৎ পথিমধ্যে কোন উচ্চান-পালিকা মালিনীকে দেখিতে পান। উহার নাম মল্লিকা। মল্লিকার রূপগুণে আকৃষ্ট হইয়া রাজা তাহাকে বিবাহ করেন।

কথিত আছে এই ঘটনার কিঞ্চিৎ পূর্বে বুদ্ধ পাঁচশত ভিক্ষু সহ শ্রাবস্তীতে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই বালিকা বুদ্ধকে একখানি স্তম্ভিত পিষ্টক ভিক্ষা স্বরূপ দান করিয়াছিল— তাহাতে বুদ্ধদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। সেই পুণ্যফলে বালিকাটি ভবিষ্যতে কোশলের রাজমহিষী পদে অধিকৃত হয়। মল্লিকার গর্ভে বিরুদ্ধক নামে এক পুত্র জন্মে।

প্রসেনজিতের ইচ্ছা এই যে, বুদ্ধবংশের সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ নিবন্ধ হয়, এবং কোন এক শাক্য-কন্যার পাণি-গ্রহণের অভিলাষী হইয়া তিনি বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান, কিন্তু শাক্যেরা এ বিবাহে সম্মতি প্রদান করে নাই। তাহাদের মতে কোশলরাজ জাতিকুল হিসাবে শাক্যদের সমকক্ষ নহে। পরিশেষে তাহাদের কোন এক শ্রেষ্ঠীর বাসবন্ধত্রিয়া নামে এক দাসীপুত্রীর সহিত কোশলরাজের বিবাহ সংঘটন হয়।

বিরুদ্ধক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, শাক্যেরা তাঁহার পিতাকে দাসীপুত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহাকে

কিরূপ প্রতারণা করিয়াছে, এবং কিসে শাক্যদের দর্প চূর্ণ হয়, তাহার পন্থা ভাবিতে লাগিলেন । সিংহাসন প্রাপ্তির অনতি-কাল বিলম্বে ( পূর্বে যেমন বলা হইয়াছে ) তিনি শাক্যরাজ্য আক্রমণ করিয়া, তাহাদের নগর ভূমিসাৎ এবং শাক্যবংশ সমূলে ধ্বংস করেন, ও সহস্র সহস্র দাসী-কন্যা বন্দী করিয়া লইয়া যান ।

মহাবংশ টীকায় এইরূপ কথিত আছে যে, বুদ্ধের জীবদ্দশায় কতকগুলি শাক্য বিরুদ্ধের অত্যাচার ভয়ে হিমালয়ে পলায়ন করিয়া ঐ প্রদেশে একটি সুন্দর নগর পত্তন করে, তাহার নাম মোরিয় নগর ( মোর্য্য নগর ) । সেই স্থান অনেকানেক ময়ূরের কেকা রবে প্রতিধ্বনিত বলিয়া ঐ নাম রাখা হয় । বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই যে, অশোক রাজা বুদ্ধবংশ-সম্ভূত, কেননা অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মোর্য্য নগরের কোন এক রাণীর পুত্র বলিয়া প্রখ্যাত ।\*

শ্রাবস্তী ।—

রাজগৃহে দ্বিতীয় বর্ষা যাপন করিয়া বণিক অনাথপিণ্ডদের আমন্ত্রণে বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী গমন করেন । ইহা কাশীর উত্তর পশ্চিম রাণ্ডী নদীতীরস্থিত । গৌতমের সময় ইহা কোশল-রাজ প্রসেনজিতের রাজধানী ছিল । শ্রাবস্তীর জেতবন উদ্যান অনাথপিণ্ডদের বহুমূল্য দান ; যত স্বর্ণ-মুদ্রা সেই ভূমিখণ্ডের

\* Kshatriya Clans in Buddhist India  
( The Sakyas )

উপর বিছাইয়া ঢাকিয়া দেওয়া যায়, বণিক তাহা তত মুদ্রায় ক্রয় করিয়া বৌদ্ধ সঙ্ঘে উপহার দেন । জেতবন বুদ্ধদেবের সাধের আশ্রম ছিল ; সেখান হইতে তিনি যে সকল উপদেশ দেন তাহা বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রখ্যাত । জেতবনে যে বিহার নিশ্চিত হয়, ছয়েন সাং তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া যান । ফাহিয়ান বলেন শ্রাবস্তিতে প্রসেনজিৎ বুদ্ধের এক চন্দনকাষ্ঠের বৃহৎ প্রতিমূর্তি নির্মাণ করেন । ওখানকার এক মন্দির খনন করিতে করিতে বুদ্ধের এক বড় প্রস্তরমূর্তি পাওয়া যায়, কিন্তু কাষ্ঠ মূর্তির কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই ।

বৈশালী ।—

লিচ্ছবি—বৃজী-জাতীয় লোকদের রাজধানী । সজন, সখন নগর বলিয়া বৌদ্ধ যুগে প্রখ্যাত । প্রবজ্যা গ্রহণের প্রথম কতিপয় বৎসর ইহা বুদ্ধদেবের বিহারভূমি ছিল । এই নগরীর কূটাগার শালা, অম্বপালীর আত্রবন, মহাবন প্রভৃতি স্থান হইতে তিনি অনেক সময় উপদেশ দিতেন । তিনি বৃজী-জাতীয় নাগরিকদের আচারব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন । তাহাদের প্রতি তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্য যথেষ্ট ছিল । রাজা অজাতশত্রু তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে যখন বুদ্ধের পরামর্শ চাহিতে তাঁহার নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন, তখন তিনি বৃজী-জাতি সম্বন্ধে নিজের যা মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা প্রসিদ্ধই আছে । বাহাতে এই নিরীহ জাতির স্বাধীনতা বিনষ্ট না হয়, তাঁহার মনোগত

অভিপ্রায় তাহাই ছিল, এ কথা তাঁহার উত্তরের ভাবার্থে স্পষ্টই বোঝা যায়।

যখন বুদ্ধের পৃথিবীর দিন ফুরাইয়া আসিতেছে, তখন তিনি ঐ নগরের প্রতি শেষবারের মত কি করুণভাবে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, তাহা মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বর্ণিত আছে। ঐ অঞ্চলে তাঁহার শেষ ভ্রমণকালে যখন বৈশালী ছাড়িয়া যান,—সেই নগর যাহার সহিত তাঁহার কতই সুখের স্মৃতি জড়িত—কথিত আছে তাহার প্রতি তিনি হস্তীর শ্রায় কিরিয়া তাকাইয়া দেখিলেন, এবং আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আনন্দ, শেষবারের মত এই বৈশালী দেখিয়া লইলাম—আর আমার দেখা ঘটিবে না”।

বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের পর, এই বৈশালীতে বৌদ্ধ সঙ্ঘের মহাসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচারবিচার সম্বন্ধে সঙ্ঘে যে মতভেদ হইয়াছিল, সেই বিষয় লইয়া বাদামুবাদ, বিচার ও নিষ্পত্তি হয়। সঙ্ঘ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল; এক দল বুদ্ধস্থাপিত প্রাচীন কঠোর নিয়মের পক্ষপাতী, অন্য দল সেই নিয়মের শৈথিল্য সাধনে সম্মুৎসুক। তাঁহারা একাধার নিয়মের পরিবর্তন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা চাহেন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অপরাহ্নেও তাঁহারা ইচ্ছামত পক্কান্ন ভোজন করিতে পারিবেন; ভিক্ষুদের স্বর্ণরৌপ্য গ্রহণ-নিষেধ ঘুচিয়া গিয়া সে বিষয়ে তাঁহাদের স্বেচ্ছামুরূপ চলিবার নিয়ম প্রবর্তিত হয়, ইত্যাদি। ইহা বৈশালীর দ্বিতীয় সভা, এই সভার আয়োজ-



প্রিয় সভ্যদিগের পরাভব হয়, কঠোর ব্রতধারী ভিক্ষুগণ জয় লাভ করেন ।

কপিলবস্তু হইতে ফিরিয়া আসিয়া, একদা বুদ্ধদেব বৈশালীর মহাবনস্থ কৃটাগার শালায় বাস করিতেছিলেন, এমন সময় মহাপ্রজাপতি কতিপয় শাক্য মহিলা সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া, ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব করেন । বুদ্ধ প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করেন—তাঁহার আশঙ্কা এই, ভিক্ষুণীরা সঙ্ঘে প্রবেশ করিলে তাঁহার ধর্ম দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না, শীঘ্রই লোপ পাইবে । পরে আনন্দের বহু সাধ্য সাধনায়, বিশেষ বিবেচনার পর তিনি প্রজাপতির মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন ।

বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহের ভস্মাবশেষের উপর, লিচ্ছবিরী এই স্থানে একটি স্তূপ নির্মাণ করে । বৌদ্ধ শাস্ত্রে স্তূপগুণিত এই সকল প্রদেশের সম্যক অভিজ্ঞ, জেনারেল কানিংহাম সাহেব বিস্তর গবেষণার পর ত্রিহৃত প্রদেশে মজ্জফরপুরের বসাড গ্রাম বৈশালীর বাস্তভূমি বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন ।

কৌশান্বী —

আলাহাবাদ হইতে ১৫ ক্রোশ দূর । ইহা এক প্রাচীন নগরী, রামায়ণেও ইহার উল্লেখ আছে । ইহা সেই রাণা উদয়নের স্থান, যাহার নাম মেঘনুতের এক শ্লোকে কীর্তিত আছে :—‘উদয়ন কথাকোবিদ গ্রামবুদ্ধান্’ ।

রত্নাবলী নাটকের রঙ্গভূমিও এই। বুদ্ধ এখানে অনেক সময় আসিয়া উপদেশ দিতেন। কথিত আছে বুদ্ধের এক চন্দনকাষ্ঠের প্রতিমূর্তি শ্রাবস্তীতে যেমন, এখানেও তেমনি গঠিত হয়। এটি বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই নির্মিত হইয়াছিল। যে স্থপতি ইহা নির্মাণ করে, তাহাকে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে পাঠান' হয়, সেখানে গিয়া সে বুদ্ধদেবের দর্শন পায়, তথায় তিনি তাঁহার মাতা মায়াদেবীকে ধর্মোপদেশ দিবার জন্য গমন করিয়া-ছিলেন।

নালন্দ ।—

নালন্দ বিহার বৌদ্ধদের একটি অত্যুৎকৃষ্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়। ইহার আধুনিক স্থান বারাগাঁও, বুদ্ধগয়া হইতে ৪০ মাইল দূর। জুয়েন সাং বলেন বুদ্ধ এখানে ৩ দাস অবস্থিতি করিয়া ধর্মোপদেশ করেন। জুয়েন সাং নিজে এই বিহারে ৫ বৎসর কাল থাকিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শিলাদিত্যের রাজত্ব কালে নালন্দ-বিহার পূর্ণ মহিমায় বিরাজিত ছিল। রাজকোষ হইতে ইহার ব্যয় নির্বাহ হইত। জুয়েন সাঙের বর্ণনা এই—  
“ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিহারে প্রায় ১০,০০০ ভিক্ষু অধ্যয়নে নিযুক্ত—বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অষ্টাদশ শাখা এখানে একত্রিত। এখানকার ছাত্রেরা সকলেই প্রথর-বুদ্ধি, সুপণ্ডিত ও পবিত্র-চরিত্র। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেবল ধর্মচর্চা ও ধর্মালোচনা; দূর দূর হইতে মহা মহা পণ্ডিত তাঁহাদের ধর্মবিষয়ক সন্দেহ ভঞ্জন করিতে আসিয়া থাকেন। ত্রিপিটক বাহাদের কণ্ঠস্থ নাই, তাহারা লজ্জায় মুখ হেঁট করিয়া থাকে। নালন্দ-

ছাত্রদের পাণ্ডিত্যের এমনি খ্যাতি যে, অনেকানেক ভণ্ড ভপস্বী তাহাদের উপাধি ধারণ করিয়া পাণ্ডিত্যের ভাণ করিয়া বেড়ান ।”

পাবা ও কুশীনগর ।—

বুদ্ধের সময় বৃজী-জাতির গ্যায় স্বাধীন রাজতন্ত্রসম্পন্ন, মল্ল নামক আর এক জাতি উল্লেখযোগ্য । পাবা ও কুশীনগর, মল্লদের এই দুই প্রধান নগর । বুদ্ধদেব তাঁহার শেষ জীবনে, মল্ল রাজ্যে চুন্দ নামে কর্ম্মকারের আশ্রয়নে গিয়া উপনীত হইলেন, পরে চুন্দের নিমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে বিবিধ খাচুদ্রব্য সহ বরাহ মাংস ভোজন করিয়া, রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন । সেই পীড়িত অবস্থায়, তিনি সেই স্থান হইতে কুশীনগর যাত্রা করেন । সেখানে আপনার আসন্ন মৃত্যু প্রতীক্ষা করিয়া, নগরের প্রান্তে শালবনে গিয়া বিশ্রাম করেন । অনন্তর তিনি আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আনন্দ, তুমি কুশীনগরের মল্লগণকে বল, আজ রাত্রির শেষ যামে তথাগত এই স্থানে পরিনির্বাণ লাভ করিবেন ।” তাঁহার পরিনির্বাণের পর, আনন্দ সেই সংবাদ মল্লদের নিকট লইয়া যায় । মল্লগণ আনন্দের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, শোকাভিভূত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল । অনন্তর উহারা নগরপ্রান্তে শালবনে গমন করিয়া নৃত্য গীত বাজ ও পুষ্পমাল্যের দ্বারা, ক্রমান্বয়ে সাতদিন বুদ্ধ দেহ পূজা করিল । পরে ঐ দেহ মুকুটবন্ধন নামক চৈত্রে স্থানান্তরিত করিয়া রাজচক্রবর্তীযোগ্য অস্ত্যোষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন

করিল । চিত্তানল নির্বাণিত হইলে, তাঁহার অস্থিখণ্ডসকল একত্র করিয়া, তাহাদের রক্ষাগারে সুরক্ষিত করিয়া রাখিল ।

পাবার মল্লেরাও তাঁহার দেহাংশের অংশভাগী । শুধু তাহা নয়, মগধরাজ অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, কপিলবস্তুর শাক্যগণ, ইহঁারা সকলেই বুদ্ধের শরীরংশ প্রার্থনা করিলেন ; ভগবান ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়— এই বলিয়া এক এক অংশের দাবী করিতে লাগিলেন । কুশীনগরের মল্লেরা প্রথমে তাঁহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ করিলেন । পরিশেষে সর্বসম্মতিক্রমে ধার্য্য হইল যে, বুদ্ধদেহ অষ্টমাংশে বিভক্ত হউক, ও তাহাতে যাহাদের ন্যায় অধিকার, তাহাদের এক এক অংশ বিতরণ করা হউক—এইরূপে দেহের অষ্টাংশের উপর অষ্ট স্তূপ নির্মিত হইল ।\* পাবা ও কুশীনগরের মল্লেরাও বুদ্ধদেহাংশের উপর স্তূপ নির্মাণ করিয়া প্রীতিভোজনাশু এই শুভানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিল ।

ভিক্ষুগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

দেবিন্দ নাগিন্দ নরিন্দ পূজিতো  
মমুস্‌সিন্দ-সেট্ঠেই তথৈব পূজিতো  
তং বন্দথ পঞ্জলিকা ভবিত্তা  
বুদ্ধো হবে কল্পসতে তি দুম্মভো তি ।

\* অষ্ট স্তূপ ।

- |                |                |
|----------------|----------------|
| ১ । রাজগৃহ ।   | ৫ । রামগ্রাম । |
| ২ । বৈশালী ।   | ৬ । বেট্টদাপ । |
| ৩ । কপিলবস্ত । | ৭ । পাবা ।     |
| ৪ । অন্নকল্প । | ৮ । কুশীনগর ।  |

দেবেন্দ্র নাগেন্দ্র নরেন্দ্র পূজিত,  
মনুজেন্দ্র-শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁদেরও সেবিত,  
কৃতাজ্জলিপুটে সবে করহ বন্দন,  
শতকল্পে সুদুলভ বুদ্ধের জনম ।

চীন পরিব্রাজকেরা এখানকার ভয়াবস্থা দেখিয়া যান । এই প্রসঙ্গে ছয়েন সাং বলেন, বুদ্ধের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া কাশ্যপ কুশীনগর যাত্রা করিতেছেন, এমন সময় কতকগুলি ভিক্ষু আনন্দ-প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল “তথাগত গেলেন, বাঁচা গেল ! আমরা কেহ কোন দোষ করিলে এখন কে আমাদের শাসন করিবেন ?” এই কথা শুনিয়া কাশ্যপ ধর্ম প্রতিষ্ঠার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । উপস্থিত সকলকে ডাকিয়া বলিলেন “আমাদের ধর্মশাস্ত্র বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যিক । যে-সকল ভিক্ষু বুদ্ধের বিধানসমুদয় ভালরূপ জানেন, যাঁহারা নিজে সেই ধর্মে অনুরক্ত, যাঁহারা অধীত ও সুবিচারী, তাঁহারা সভা করুন,—অপ্রবীণ নূতন শিষ্যেরা চলিয়া যান” ।

ইহা শুনিয়া অনেকে চলিয়া গেল ; ১০০০ লোক অবশিষ্ট রহিলেন—তাঁহাদের মধ্যে আনন্দ একজন । কাশ্যপ আনন্দকে গ্রহণ করিতেও সম্মত হইলেন না । তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“তোমাকে সম্পূর্ণ দোষশূন্য বলিতে পারি না । তুমিও এ সত্যের যোগ্য নও । তুমি বুদ্ধের পার্শ্ব-সহচর প্রিয় শিষ্য ছিলে, তাঁহাকে পিতার স্থায় ভক্তি করিতে ও ভাল-বাসিতে, তুমি এখনো সম্পূর্ণ আসক্তিবহীন হইতে পার না—এই আমার ধারণা ।”

আনন্দ নির্জ্ঞন অরণ্যে গিয়া যোগসাধন দ্বারা অর্হৎ-সিদ্ধি লাভ করিলেন । পরে যখন তিনি সভাস্থলে ফিরিয়া দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কাশ্যপ তাঁহাকে বলিলেন “তুমি আসক্তি-শূন্য হইয়াছ, তাহার প্রমাণ দেখাও । তুমি সূক্ষ্ম শরীরে এই রুদ্ধ দ্বার দিয়া সভায় প্রবেশ করিতে পারিলে বুঝা যাইবে ।” আনন্দ তখন দ্বারের ছিদ্র দিয়া সূক্ষ্ম শরীরে প্রবেশ করিলেন এবং উপস্থিত স্হবিরদিগকে প্রণাম করত সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন ।

এই ত ভারতের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ তীর্থের কথা বলা হইল । ইহা ছাড়া সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে বুদ্ধের স্মরণচিহ্নসকল বিক্ষিপ্ত—এই স্হলে তাহাদের বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই ।

প্রায়শ্চিত্ত বিধান ।—

খৃষ্টীয় ক্যাথলিকদের মধ্যে গুরু সন্নিধানে আত্মপাপ স্বীকার করিবার যে রীতি আছে, বৌদ্ধ সমাজে তাহার অনুরূপ একটা প্রথা প্রচলিত ছিল । প্রত্যেক ভিক্ষুকে প্রতিমাসে দুইবার, অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্তার দিনে উপবাস পর্বের প্রাতিমোক্ষের বিধানানুসারে সজ্জসন্নিধানে আত্মপাপ অঙ্গীকার করিয়া প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে হইত । দর্শপূর্ণমাসী বৈদিক বিধির অনুরূপে সম্ভবতঃ বৌদ্ধদের মধ্যে এই পাক্ষিক পর্ব প্রবর্তিত হয় । যেখানে এই পাক্ষিক সভার অধিবেশন হইত, সেখানে সেই ভাগের যত ভিক্ষুদল সকলকেই উপস্থিত হইতে হইত । ভিক্ষু সজ্জ সমবেত হইলে, পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত বিধানের মন্ত্র পাঠ করিয়া সভার কার্য আরম্ভ হইত ।

“ভিক্ষুদের মধ্যে যিনি যে-কোন পাপ করিয়াছেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করুন ; যদি কোন দোষ না করিয়া থাকেন, চুপ করিয়া থাকুন । যিনি মৌন থাকিবেন, ধরা যাইবে তিনি নিরপরাধী । যিনি পাপ করিয়া, জানিয়া শুনিয়া অস্বীকার করেন, তিনি মিথ্যাবাদী । ভগবান বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন মিথ্যাই বিনাশের মূল । অতএব যদি কোন ভিক্ষু কোন বিষয়ে অপরাধ করিয়া থাকেন, ও তাহা হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা প্রকাশ্যে স্বীকার করুন ; অনুতাপে পাপভার লঘু হইয়া যায় ।”

প্রাতিমোক্ষ নামক গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্ত বিধানগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে । কথিত আছে যে, বুদ্ধদেব প্রথম কাশী হইতে রাজ-গৃহে প্রবাস কালে এই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান বিধিবদ্ধ করেন । ভিক্ষু সঙ্ঘের পান্থিক অধিবেশনে এই প্রাতিমোক্ষের নিয়ম সকলের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যান হইত । কোন অপরাধের কি দণ্ড, প্রায়শ্চিত্তই বা কিরূপ, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইত । অপরাধ নানা শ্রেণীতে বিভক্তঃ । \* নরহত্যা, ব্যভিচার, প্রভৃতি কতক-

\*অপরাধের শ্রেণী বিভাগ ।

১। পারাজিক—

ব্যভিচার, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, জ্ঞানপূর্বক নরহত্যা, অলৌকিক ক্ষমতার বৃথা গর্ভ ।

২। সজ্জাতিদেশ—

ব্রহ্মচর্যা হানি, দূষিত অন্তঃকরণে স্ত্রীলোকের হস্ত ধারণ, হর্ভাবণ ইত্যাদি ১০ প্রকার অপরাধ ।

৩। অনিরত—

ব্যভিচার ছই প্রকার ।



গুলি গুরুপাপের দণ্ড সজ্ব হইতে বহিষ্কার। অপেক্ষাকৃত লঘু পাপ—যথা, দূষিতভাবে রমণীর অঙ্গ স্পর্শ, কোন ভিক্ষুর প্রতি অশ্রদ্ধার ব্যবহার,—তাহার বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট আছে। পরে আহার বিহার পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অনিয়ম, মিথ্যা কথা, অতিলোভ, পরনিন্দা, ভিক্ষুণীর সঙ্গে একাকী ভ্রমণ,—এই সমস্ত ছোটখাট দোষ 'দুষ্কৃত' (দুষ্কৃত) বলিয়া গণ্য, অমৃতপ্ত হৃদয়ে অঙ্গীকারেই ইহাদের খণ্ডন। 'এই সকল ছোটখাট দুষ্কৃতির স্বরূপ ও বিধান দেখিলে বোঝা যায় ভিক্ষু সজ্ব কি কঠোর ধর্মশাসনে নিয়ন্ত্রিত ছিল! কোন কুটীর নির্মাণ করিতে হইলে তাহার কি মাপ হইবে, ছাতা দর্পণ ব্যবহার্য কি না, দাস্ত্রনের মাপ কি, ভিক্ষা পাত্র কিরূপ, বসিবার আসন

৪। নিসর্গীয় প্রায়শ্চিত্তায়—

আহার, পরিচ্ছদ, শয্যা, ভিক্ষাপাত্র, স্বর্ণ রৌপ্য গ্রহণ সম্বন্ধীয় ৩০টি অপরাধ।

৫। প্রায়শ্চিত্তীয়—

মিথ্যা কথা, পিণ্ডন বাক্য, নিন্দা, বাগবিতণ্ডা, প্রতারণা, অত্যাচার, ভিক্ষু ভিক্ষুণীর পরস্পর চূর্ন্যব্যবহার, অসময়ে ভিক্ষা, ভোজন বিষয়ে অনিয়ম, সুরাপান, অকারণে অগ্নিসেবা, জ্ঞানপূর্বক প্রাণীহত্যা, বহিষ্কৃত ভ্রমণের সহিত একত্রে আহার শয়ন, ভিক্ষুগণের পরস্পর ব্যবহার, অশ্রদ্ধাপূর্বক সত্ত্বের সম্পত্তি ভোগ, শয্যা বা পর্যাক্কে তুলা দ্বারা কোমল বিছানায় শয়ন, প্রভৃতি ৯২ প্রকার অপরাধ।

৬। প্রতিদেশনীয়—

ভিক্ষুণীর হস্ত হইতে আহার গ্রহণ, নিমন্ত্রিত না হইয়া কোন গৃহস্থের বাড়ী বাইরা খাণ্ডজ্বা বা পানীর গ্রহণ, ইত্যাদি চারিটি লঘু অপরাধে দোষ স্বীকারে প্রায়শ্চিত্ত।

৭। কঠকগুলি শিক্ষনীয় ধর্ম—

কত বৎসর চালাইতে হইবে, হাঁচিলে 'দীর্ঘজীবী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করা বিধেয় কিনা, কি উপায়ে 'আরাম' বিহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, কিরূপে স্নান আহার করিবে—ওঠা বসা ভোজন শয়ন নিদ্রা, জীবনের প্রত্যেক কার্যের জন্ত বুদ্ধদেব নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধের উপদেশ কোন্ ভাষায় প্রচারিত হওয়া উচিত, এই লইয়া অনেক সময় কথা উঠিত। একবার দুই জন ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবের নিকট প্রস্তাব করিলেন, “প্রভু, আপনার উপদেশ চলিত ভাষায় লোকের মুখে মুখে অশুদ্ধ ও নষ্ট হইয়া যায়, আমাদের ইচ্ছা বুদ্ধের উপদেশগুলি সংস্কৃত ছন্দে রচিত হইয়া প্রচারিত হয়।” বুদ্ধ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি কহিলেন, “এরূপ হইলে ধর্মপ্রচারের সাহায্য হইবে না, বরং তাহার উল্টা হইবে। লোকেদের অবোধ্য দুর্ভূহ ভাষায় ধর্ম প্রচারের ব্যাঘাত জন্মিবে। ভিক্ষুগণ! তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ মাতৃ-ভাষায় বুদ্ধ-বচন গ্রহণ কর, এই আমার উপদেশ।” (চুল্লবগ্গ)

এই সমস্ত নিয়মাবলীর পাঠ ও আবৃত্তি সমাপ্ত হইলে পাঠক নিবেদন করেন—“ভগবান বুদ্ধের বিধানানুসারে পাঠাবৃত্তি সমাপ্ত হইল, তোমরা সকলে শাস্ত্রসমাহিত চিত্তে, সদ্ভাবে নির্বিবাদে ইহার মর্ম গ্রহণ কর।”

পঞ্চায়ৎ ।—

কিন্তু এই সদুপদেশ সত্ত্বেও সত্ত্বে অনেক সময় বাদানুবাদ ও মতভেদ উপস্থিত হইত; চুল্লবগ্গে সমস্ত বিবাদভণ্ডনের অনেক প্রকার নিয়ম পরিকল্পিত দেখা যায়। তাহার মধ্যে

বিবাদ মীমাংসার জন্য পঞ্চায়তের ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া পঞ্চায়তে সমর্পিত হইলে, অধিকাংশ লোকের মতে তাহার নিষ্পত্তি হইত। যে সকল ভিক্ষু পঞ্চায়তে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদের কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যিক। অপক্ষপাতী, রাগদ্বेषভয়শূন্য, বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুরাই এই পঞ্চায়তে বিচার করিতেন। মত গ্রহণের তিন প্রকার রীতি ছিল—গুপ্ত, অপ্রকাশ্য, প্রকাশ্য। যখন নিঃসংশয়ে জানা যায় যে, কোন একটী বিষয় সাধারণ মতে ধর্মনিয়মের অনুবর্তী, তখন আর গুপ্তমত গ্রহণের আবশ্যিক নাই, প্রকাশ্য ভাবে গ্রহণ করিলেই হইল। তর্ক বা সন্দেহস্থলে মত-গ্রাহক ভিক্ষু দুই রঙের টিকিট প্রস্তুত করিবেন, ও যিনি মত দিতে আসিবেন তাঁহাকে বলিবেন “এই মতের লোকের জন্য এই টিকিট ; অন্য মতের লোকের জন্য এই অন্য টিকিট ; যেটা ইচ্ছা গ্রহণ কর। অন্য কাহাকেও দেখাইও না।” বিজ্ঞাপক যদি বিবেচনা পূর্বক স্থির করেন যে, ধর্মবিরুদ্ধ পক্ষের মত বলবত্তর, তাহা হইলে সে মত অগ্রাহ্য করিবেন। আর ধর্মের অনুযায়ী স্থির হইলে, সে মত গ্রাহ্য করিবেন। মত গ্রহণের এই গুপ্তরীতি ( ব্যালট )। অপ্রকাশ্য রীতি হচ্ছে ভিক্ষুর কানে কানে বলা, “এই টিকিট এই মতের পোষক, এই অন্য টিকিট অন্য মতের পোষক—যেটা ইচ্ছা গ্রহণ কর। তুমি কোন্ মতে মত দিবে আর কাহাকেও বলিও না।” বিজ্ঞাপক যদি বিবেচনা পূর্বক স্থির করেন যে ধর্মবিরোধী মত বলবত্তর, তাহা হইলে সে মত অগ্রাহ্য করিবেন ; অধিকাংশের মত ধর্মের অনুযায়ী স্থির

জানিলে, সে মত গ্রাহ্য করিবেন । অপ্রকাশ্য ভাবে মত গ্রহণের এই নিয়ম । ( চুল্লবগ্গ )

বর্ষার ৩ মাস ভিক্ষুদের সম্মিলন ও উৎসবের সময় । বিহার ও অন্যান্য আশ্রমে তাঁহারা এই উৎসবের মাসত্রয় যাপন করিতেন ; তখন ধর্ম্মালাপ, শাস্ত্রালোচনা, আবৃত্তি প্রভৃতির ধূম লাগিয়া যাইত । শ্রাবকেরা দেশদেশান্তর হইতে আসিয়া বুদ্ধের জাতক উপাখ্যান শ্রবণের পুণ্যার্জন করিতেন, এবং সকলে সম্ভাবে মিলিত হইয়া উৎসবে যোগদান করিতেন । আমার স্মরণ হয়, যখন বোম্বায়ে আমার সার্ভিসের প্রথম ভাগে আহমদাবাদে কর্ম্ম করিতাম, তখন অনেক সময় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐরূপ বর্ষার উৎসবে উপস্থিত হইতাম । উহা জৈনোৎসব, বৌদ্ধদের উৎসব নহে, কিন্তু অনেক বিষয়ে এই উভয়ের সাদৃশ্য আছে । আহমদাবাদও অঞ্চলের জৈন সম্প্রদায়ের প্রধান স্থান । চাতুর্মাস্য যাপন, ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও শ্রবণ, উপবাস ব্রত ধারণ প্রভৃতি বৌদ্ধ রীতি অনুসারে জৈনদের মধ্যেও বর্ষার উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হইত ।

বর্ষোৎসবের শেষে এবং প্রব্রজনের আরম্ভে বৌদ্ধদের এক বার্ষিক সভা হইত, তাহার নাম 'প্রবারণ' অর্থাৎ আমন্ত্রণ । এই আমন্ত্রণে ভিক্ষুদল মিলিত হইলে উল্লিখিত প্রকার পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক কথাবার্ত্তা চলিত । যিনি প্রায়শ্চিত্ত-প্রার্থী, তিনি ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন—

—“হে ভিক্ষুগণ ! আমার বিরুদ্ধে যদি আপনারা কেহ কিছু দেখিয়া থাকেন, শুনিয়া থাকেন, আমার চরিত্র বিষয়ে কাহারো

কোন সন্দেহ থাকে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন । যদি সত্য হয়, আমি তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ।”

ক্রমশঃ গৃহী লোকের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত হয় ; কিন্তু তাহার অসুবিধা সংঘটন প্রযুক্ত অশোক রাজা পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনার্থ একটা মহোৎসব প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে প্রথম আত্মদোষ স্বীকার ও সঙ্গে সঙ্গে দান ধর্মের অনুষ্ঠান, উভয়ই প্রচলিত ছিল । ঐ দানোৎসবটি ৫ বৎসর অন্তর সম্পন্ন হইত । খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে প্রয়াগক্ষেত্রে একবার ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান হয় ; চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন সাং তাহা দর্শন করিয়া যান । তাহার বর্ণনা এইরূপ আছে :—

“ঐ সুবিস্তৃত উৎসব ক্ষেত্র একটা আনন্দক্ষেত্র ছিল, চারিদিকে সহস্র সহস্র গোলাপ গাছের সুরম্য বৃতি, তাহাতে অপরিয়াপ্ত মনোহর পুষ্পশ্রেণী অহরহ প্রস্ফুটিত, এবং মধ্যস্থলে স্বর্ণ রজত পটুবস্ত্র ও অপরাপর বহুমূল্য দান দ্রব্যে পরিপূর্ণ সুসজ্জ গৃহশ্রেণী । তাহার সমীপে সারি সারি একশত একরূপ ভোজন-গৃহ ছিল, যাহার প্রত্যেক গৃহে শত ব্যক্তি ভোজন করিতে পারিত । শিলাদিত্য (হর্ষবর্দ্ধন) তখন ঐ অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন । বৌদ্ধধর্মের তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল, অথচ তাঁহার রাজ্যে ব্রাহ্মণ্যের প্রতিপত্তিও সামান্য নহে । শিলাদিত্যের আধ্বানক্রমে বিংশতি রাজ্যের রাজারা ব্রাহ্মণ শ্রমণ সৈন্য সামন্ত সহ পঞ্চাশ সহস্র লোক সমভিব্যাবহারে তথায় আগমন করেন । সার্ক দুই মাস ব্যাপিয়া দান ভোজনাদি সহকারে ঐ উৎসব ব্যাপার সম্পন্ন হয় । এই ধর্ম-মহামণ্ডলীর

পশ্চিমে এক বৃহৎ সজ্জারাম ও পূর্বে ৬০ হস্ত উচ্চ এক স্তম্ভ নির্মিত হয়। মধ্য ভাগে বুদ্ধের স্বর্ণ মূর্তি মনুষ্যাকৃতিপ্রমিত স্থাপিত। বুদ্ধ, সবিতা ও শিব, এই তিনেরই প্রতিমূর্তি একে একে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ সমস্ত সমাগত ব্যক্তিদিগকে বহুমূল্য সামগ্রী দান করা এবং চর্ক্যা চোষ্য লেছ পেয় নানাবিধ সুস্বাদ সামগ্রী ভোজন করান হয়। বুদ্ধের এক ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি এক সুসজ্জিত গজপৃষ্ঠে স্থাপিত, শিলাদিত্য ইন্দ্রবেশে বামপার্শ্বে এবং কামরূপের রাজা দক্ষিণে, ৫০০ রণহস্তী প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। শিলাদিত্য চতুঃপার্শ্বে মুক্তা রজত কাঞ্চন ও অগ্ন্যাশ্রয় বহুমূল্য জিনিস ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছেন। বুদ্ধ মূর্তি ধৌত হইলে শিলাদিত্য তাহা নিজ স্বন্ধে উঠাইয়া পশ্চিম স্তম্ভে লইয়া যান, ও তদুপরি বহুমূল্য বেশভূষা স্থাপন করেন। ভোজনের পর ব্রাহ্মণ শ্রমণ মিলিয়া একত্রে ধর্ম চর্চা ও বাদানুবাদ হয়। এদিকে ব্রাহ্মণ শ্রমণে বাক্যবুদ্ধ, অন্যদিকে মহাযানী হীনযানীদের মধ্যেও ঘোর তর্ক বিতর্ক বাধিয়া যায়। এই উৎসবে রাজা স্বীয় রাজকোষ নিঃশেষিত করিয়া প্রায় সমস্ত ধনই বিতরণ করিতেন। এমন কি, তাঁহার নিজের পরিচ্ছদ, কর্ণকুণ্ডল, রত্নমালা প্রভৃতি বেশভূষা সমুদয়ও দেহ হইতে উন্মোচন করিয়া দিতেন।”\* অবশেষে পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র পরিধান পূর্বক দীন বেশে বুদ্ধদেবের মহাভিনয়ক্রমণ অভিনয় করিতেন।

\* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগ। অক্ষয় কুমার দত্ত।



হিউয়েন সাং বলেন যে, উৎসবের শেষে স্তম্ভে আগুন জ্বালাইয়া যায়; তাঁহার বিশ্বাস এই যে, রাজা শিলাদিত্যের বৌদ্ধধর্মে শ্রদ্ধা দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা ঈর্ষাবশে এই অঘোর কৃত্য ঘটাইয়া দেন, এবং রাজহত্যারও চেষ্টায় ফেরেন—ভাগ্যক্রমে সে চেষ্টা সফল হয় নাই ।

### ভিক্ষুণী সঙ্ঘ ( বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী )

বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রথম পত্তন কালে তাহা কেবল ভিক্ষুদলে পরিপুষ্ট হয় । প্রথমে স্ত্রীলোকের সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার ছিল না । বুদ্ধদেব, যিনি মানব প্রকৃতির দুর্বলতা সম্যক অবগত ছিলেন, যিনি সংঘম দ্বারা কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি ষড়রিপুর উপর জয়লাভের উপদেশ প্রদান করিতেন, তিনি যে সঙ্ঘ-গণ্ডীর ভিতর রমণীর প্রবেশে বীতরাগ হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি ? স্ত্রীজাতিকে সন্ন্যাসী দলে মিশিতে দিলে তাহার অশুভ পরিণাম হইবে, ইহা তাঁহার বিলক্ষণ আশঙ্কা ছিল । যখন বুদ্ধদেবের নিকট আনন্দ প্রথমে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তখন বুদ্ধ বলিলেন, “স্ত্রীলোকেরা যদি গৃহত্যাগিনী হইয়া সন্ন্যাসিনী না হয়, তাহা হইলে এই ধর্ম সহস্র বৎসর অব্যাহত থাকিবে; আর তাহাদের বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দিলে এ ধর্মের পবিত্রতা শীঘ্রই নষ্ট হইবে, অল্পকালের মধ্যে সত্য ধর্ম লোপ হইবে” । বৌদ্ধ সঙ্ঘে স্ত্রীজাতির প্রবেশাধিকার সহজে অর্জিত হয় নাই; অনেক সাধ্যসাধনার পর বুদ্ধদেব রমণীগণকে ভিক্ষুদলে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন, এবং স্ত্রী ধাত্রী মহাপ্রজ্ঞাপতিকে তাঁহার প্রথম স্ত্রী শিষ্যরূপে বরণ করেন ।



স্ত্রীসংসর্গ হইতে দূরে থাকিবার জগু আটঘাট বতই বাঁধিয়া রাখা যায়, তাহার ফলে তাহাদের সংঘর্ষ এড়াইবার উপায় নাই। ভিক্ষায় বাহির হইয়া দ্বারে দ্বারে পর্যটন কর, অথবা গৃহস্থের গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণে যাও, হে ভিক্ষু ! রমণী সমাগম হইতে তোমার কিছুতেই নিস্তার নাই। তুমি চাও আর না চাও, তাহাদের দয়া মায়া তোমাকে বেষ্টিত করিয়া থাকিবে। বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতে যখন অবরোধ প্রথা তেমন কঠোর ভাবে প্রচলিত ছিল না, লোকসমাজে স্ত্রীলোকেরও মেলামেশা ছিল, যখন জাতীয় উত্তমে স্ত্রীলোকেরাও যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—তখনকার ত কথাই নাই। রমণীর সুন্দর ছবি আমরা প্রথম হইতেই বৌদ্ধ সমাজে চিত্রিত দেখিতে পাই। বুদ্ধের বুদ্ধহ লাভের পূর্বেই সৃজাতার বৃত্তান্ত দেখ। বুদ্ধদেব যখন ৬ বৎসর ধরিয়া কঠোর তপশ্চর্যায় মিয়মাণ হইয়া পড়িলেন, তখন কে তাঁহাকে অন্নদানে সজ্জাব করিল ?

অম্বপালী গণিকা।—

বুদ্ধদেব যখন বৈশালীতে অম্বপালী গণিকার আশ্রমেনে বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময় অম্বপালী তাঁর দর্শনার্থ আগমন করিল। তাহার বেশভূষা সামান্য, অথচ সুন্দর মোহন মূর্তি ! তাহাকে দেখিয়া বুদ্ধেরও ক্ষণভর তাক লাগিয়া গেল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন “স্ত্রীলোকটী কি পরমাসুন্দরী ! রাজ পুরুষেরাও ইহার রূপলাবণ্যে মোহিত ও বশীকৃত, অথচ এ কেমন সুধীর শাস্ত্র, সচরাচর স্ত্রীলোকের ন্যায় যৌবন-মদ-মত্ত চঞ্চলস্বভাব নহে। জগতে একরূপ নারী-রত্ন দুর্লভ।” অম্বপালী

বুদ্ধের পার্শ্বে আসিয়া বসিল । বুদ্ধদেব তাহাকে ধর্মোপদেশ দিতে তাহার মন বিগলিত হইল, ধর্ম্মে তাহার মতি স্থির হইল । গণিকা বুদ্ধের শরণপ্রার্থী হইয়া তাঁহাকে কহিল—“প্রভু, কন্যা ভ্রাতৃমণ্ডলী সহ আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া আহারাদি করিলে আমি অনুগৃহীত হইব ।” বুদ্ধদেব মৌনভাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন ।

এই সময়ে লিচ্ছবি নাগরিক যুবকেরা রথারোহণ পূর্বক সেই আম্রবনে উপন্যাত হইল । তাহারা কেহ শুভ্র, কেহ রঙীন বেশে, নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত । বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগকে তাহাদের দেখাইয়া কহিলেন, দেখ ইহাদের কেমন সাজসজ্জা, ঠিক যেন দেবতারা ভূতলে ক্রীড়াকাননে অবতীর্ণ হইয়াছেন । তাঁহারা আসিয়া বুদ্ধকে পুনর্ব্বার ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু তিনি পূর্বেই গণিকার নিকট প্রতিশ্রুত বলিয়া তাহাদের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইলেন । তাঁহারা চা'ন অম্বপালী তার আমন্ত্রণবাক্য প্রত্যাহার করে—তাহাকে হাত করিবার জন্য কত সাধ্য সাধনা কাকুতি মিনতি করিলেন, কত ধনলোভ দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই সে সম্মত হইল না । সে বলিল “তোমরা সমস্ত বৈশালী নগর উপনগর সর্ব্বশুদ্ধ আমাকে দান কর, তাহা হইলেও আমি নিমন্ত্রণ বারণ করিয়া পাঠাইতে পারিব না ।” লিচ্ছবিগণ অম্বপালীকে ধিক্কার দিতে দিতে অধোবদনে ফিরিয়া গেলেন ।

পরদিন প্রাতে বুদ্ধদেব গাত্রোখান করত বসনত্রয় পরিধান পূর্ব্বক অম্বপালীর ভবনে সশিষ্য সমাগত হইলেন ।

অশ্বপালী নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা তাহাদের পরিতোষ সাধন করিল ; এবং আহাৰাস্ত্রে ভগবান বুদ্ধকে করযোড়ে নিবেদন করিল—“আমার এই উদ্যানগৃহ ভগবান বুদ্ধ ও তাঁহার সঙ্ঘে সমর্পণ করিতেছি—এই সামান্য উপহার গ্রহণ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন ।” বুদ্ধদেব গণিকার সেই প্রীতির উপহার গ্রহণ করিলেন, ও তাহাকে বহুতর ধর্মোপদেশ-দানে শিষ্যত্বে বরণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ।

বিশাখা ।—

বৌদ্ধ শাস্ত্রে যে-সকল সাধ্বী কুলস্ত্রীর উল্লেখ আছে বিশাখা তাহাদের শীর্ষস্থানীয় । তিনি ধনে পুত্রে সৌভাগ্যবতী— দানশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন । গৃহ কর্মে ও অনুষ্ঠানে সর্বত্র তাঁহার প্রধান আসন ছিল— তাঁহার মত অতিথির আতিথ্য সংকারে বহু পুণ্য উপার্জিত হয়, লোকের এই ধারণা । বুদ্ধ যখন তাঁহার শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কোশল রাজধানী শ্রাবস্তীতে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন বিশাখা ভিক্ষুদের অভ্যর্থনা জন্য প্রচুর আয়োজন করেন । একদিন বিশাখার গৃহে বুদ্ধদেব শিষ্য-মণ্ডলী সহ ভোজন করেন । ভোজনাশ্ত্রে বিশাখা কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন—“ভগবন, আমার কয়েকটা নিবেদন আছে, শ্রবণ করুন ।” বুদ্ধ কহিলেন,—বল, কিন্তু সকলগুলি গ্রাহ্য হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না ।

বিশাখা কহিলেন :—

“আমার ইচ্ছা আমি যতদিন জীবিত থাকি ভিক্ষুদিগকে বর্ষায় বহু দান করিব, নবাগত ভ্রাতৃগণকে অন্নদান করিব ।

পীড়িত ব্যক্তিদিগকে ঔষধ পথা প্রদান, তাহাদের অনুচরবর্গকে অন্নদান, ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষালব্ধ বিতরণ, ভিক্ষুণীদিগকে বস্ত্রদান, এই সকল সৎপাত্রে দান করি আমার একান্ত ইচ্ছা ।”

বুদ্ধ কহিলেন “তোমার কি অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়া বল ।”

তখন বিশাখা তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন :—

“ভগবন, বিদেশ হইতে এখানে অনেক ভিক্ষু আসেন, তাঁহারা এখানকার পথ ঘাট কিছুই জানেন না। তাঁহাদের ভিক্ষা সংগ্রহ বহু আয়াসসাধ্য। এই সমস্ত আগন্তুক ভিক্ষুদিগকে আমি যে অন্নদান করিব, তাঁহারা তাহা আহা করিয়া ইচ্ছামত নগর পরিদর্শন করিতে পারবেন। আমি ইহাদিগকে অন্নদান করিতে ইচ্ছা করি। কোন পরিব্রাজক ভ্রমণ ভ্রমণের সময় যদি অন্নসংস্থানে ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে তিনি হয়ত তাঁহার দলের পিছনে পড়িয়া থাকিবেন, নাহয়ত তাঁহার গম্যস্থানে সময়মত পৌঁছিতে পারিবেন না। তিনি যদি আমার অন্নছত্র হইতে প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিতে পান, তাহা হইলে এইরূপ কষ্টভোগ হয় না, তিনি ইচ্ছামত ভ্রমণ ও বিশ্রাম করিতে পারেন। পরিব্রাজকদিগকে অন্নদান, এই আমার দ্বিতীয় ইচ্ছা। প্রভো! আবার দেখুন, অনেক সময় এইরূপ ঘটে, যে, অচির-বর্তী নদীতে ভিক্ষুণীরা স্নান করিতে নামে, আর বৃষ্টি পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে অনেক বারান্দাও একই সময়ে স্নান করিতে আসে। এই নির্লজ্জ স্ত্রীরা উপহাস করিয়া বলে, ‘এই বয়সে তোমরা ধর্মসাধনে কেন এত কষ্ট করিতেছ? এই বেলা মনের সাথে হেসে খেলে নেও—শেষ বয়সে যা ধর্ম করিবার করিও—ইহকাল পরকাল

দুর্দিক রক্ষা হইবে।' এইরূপ উপহাসে বেচারী ভিক্ষুণীরা বড়ই লজ্জিত ও বিরক্ত হয়। লজ্জাই স্ত্রীলোকের ভূষণ, বিবস্ত্রা হইয়া নির্লজ্জ ভাবে নদীতে স্নান করিতে নামা তাহাদের পক্ষে শোভন নহে। তাহাদের স্নান-বস্ত্র যোগাইতে পারি, এই আমার তৃতীয় ভিক্ষা।”

বুদ্ধ কহিলেন “আচ্ছা, তোমার এই সকল সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আর আশীর্ব্বাদ করি ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, তৃষ্ণাতুরে পানীয় দান, পরিশ্রান্ত জনে আসন, রোগীকে ঔষধ পথ্য প্রদান—অশন বসন ঔষধ পথ্য যাহার যা চাই তাহা যথেষ্ট দান করিবার ক্ষমতা তোমার অক্ষয় থাকুক। পরের দুঃখ হরণ ও কুশল বর্দ্ধন—এই সকল পুণ্য কার্য্যে নিরন্তর রত থাকিয়া পরত্রে তোমার সুকৃতির ফল ভোগ করিতে থাক।”

বিশাখার নিকট বৌদ্ধ সঙ্ঘ অনেক বিষয়ে ঋণী; তিনি নগরের পূর্ব্বদিকস্থ একটা সুরম্য উদ্যান সঙ্ঘে উৎসর্গ করেন, তাহার নাম “পূর্ব্বারাম।”

সুজাতা।—

উপরে এক সতী সাধ্বী সুজাতার কথা বলিয়াছি, এঘর আর এক ধরণের স্ত্রী “ঘরের কত্রী রক্ষা মূর্ত্তি” রঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণা দেখিবেন! ইনি একজন বড়মানুষের ঘরের আত্মরে মেয়ে, ইহার নামও সুজাতা। বুদ্ধদেব ইহার প্রতি কিরূপ বন্দীকরণ মন্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তাহার বৃত্তান্ত এই।—তিনি একদিন ভিক্ষা-পর্য্যটনে বণিক অনাথপিণ্ডদের বাড়ী আসিয়া শুনিতে পাইলেন,

সেই গৃহে মহা কলরব উপস্থিত । বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কিসের গোল, মনে হয় যেন মেছুনীদেব মৎস্য চুরি গিয়াছে ।” অনাথপিণ্ড তঁহার দুঃখের কাহিনী বুদ্ধের নিকট খুলিয়া কহিলেন :—“আমার একটি পুত্রবধু বড় ঘরের মেয়ে, সে আজ আমার বাড়ী আসিয়াছে । মেয়েটি বড় অবাধ্য, কাহারো কথা শুনে না, স্বামীর কথা মানে না, শ্বশুর শ্বশুড়ীর অবমাননা করে—বুদ্ধের পরেও তার কোন অনুরাগ নাই ।” বুদ্ধ স্ত্রীজাতাকে ডাকিয়া কহিলেন, “এস হে স্ত্রীজাতা, কাছে এস ।” স্ত্রীজাতা নিকটে আসিলে বুদ্ধদেব কহিলেন, “স্ত্রীজাতা, স্ত্রী সাত প্রকার,—কেহ ভীমা উগ্রচণ্ডা, কেহ কুটিলা কলহপ্রিয়া, কেহ প্রিয়স্বদা, কেহ স্নানীলা, কেহ স্নগৃহিণী, কেহ প্রিয়সখী, কেহ সেবিকা । তুমি কোন্ ধরণের স্ত্রী ?” স্ত্রীজাতা তখন তাঁর মান অভিমান ভুলিয়া গিয়া উত্তর করিলেন, “প্রভু, যে প্রশ্ন করিতেছেন আমি তার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না—আমাকে বুঝাইয়া বলুন ।” বুদ্ধ—“আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি, প্রণিধান পূর্বক শ্রবণ কর ।” পরে তিনি সাত প্রকার স্ত্রীর বর্ণনা করিলেন,—অসতী স্ত্রী, চপলস্বভাবা, কুলকলঙ্কিনী, স্বামীকে যিনি ভাল বাসেন না, এই অধম হইতে আরম্ভ করিয়া, উত্তমা সতীলক্ষ্মী পতিব্রতা, পতি যাঁর একমাত্র ধন, যিনি দাসীর ম্যায় পতিসেবাতৎপর ও পতির একান্ত বাধ্য এবং আচ্ছাবহ । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই সাত প্রকার স্ত্রীর মধ্যে তুমি কার মতন ?” তখন স্ত্রীজাতার চৈতন্য হইল, তিনি কহিলেন, “ভগবন, আমাকে পতিব্রতা সতী স্ত্রীর মত মনে করুন, আমি অন্য কোনরূপ স্ত্রী হইতে ইচ্ছা করি না ।”



এই সকল গল্পের শ্রোতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, এখন ফিরিয়া গিয়া আসল কথা পাড়া কর্তব্য ।

পূর্বের বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধ সজে স্ত্রীজাতির প্রবেশাধিকার অনেক সাধ্য সাধনার ফল । প্রথমে গৌতমী মহাপ্রজাপতি স্ত্রীলোকদিগের জন্ম এই অধিকার প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাঁহার সেই আবেদন অগ্রাহ হয় । পরে আনন্দ আবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বুদ্ধদেবের নিকট নিবেদন করিলেন, “স্ত্রীলোক সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিলে কি তাহার ফললাভে সক্ষম হয় না ? তাহারা কি আর্য্য মার্গ অনুসরণ করিয়া অর্হৎ হইবার অধিকারিণী নহে ?” বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, “তাহারা অধিকারিণী, সত্য ।” “তবে কেন মহাপ্রজাপতিকে সজ্জভুক্ত করা না হয় ? ভগবন, তিনি আপনার মাতৃবিয়োগে স্বীয় স্তন্যদুগ্ধ দিয়া আপনাকে লালন পালন করিয়াছেন, তিনি প্রভুর পরম ভক্ত, পরম উপকারিণী সেবিকা, তাঁহাকে এ অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা কি উচিত হয় ?” পরে বুদ্ধদেব বৌদ্ধ তপস্বিনীদের জন্ম কর্তৃকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন, তাহার সারাংশ এই যে, ভিক্ষুগীরা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন না করিয়া সর্বতোভাবে ভিক্ষুগণুলীর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন । মনুর যে বিধান—“শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে পতির অধীন, বৃদ্ধ বয়সে সম্বানের অধীন, স্ত্রীলোক কোন কালেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবেন না”—ভিক্ষুগীর প্রতি বুদ্ধানুশাসন ইহারই অনুযায়ী । সন্ন্যাসিনী হইয়াও স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই । তাঁহাদের প্রতি যে অষ্টানুশাসন আছে, তাহা এই :—

১ । ভিক্ষুদিগকে সন্ত্রম ও ভক্তিপ্রদা করিবে ।



২। যে প্রদেশে ভিক্ষু নাই, ভিক্ষুণী সেখানে বর্ষাষাপন করিবেন না ।

৩। প্রত্যেক পক্ষে ভিক্ষুণী ভিক্ষু-সঙ্ঘের অনুমতি লইয়া উপবাসাদি ধর্ম্যানুষ্ঠান করিবেন, ও সঙ্ঘের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবেন ।

৪। বর্ষার উৎসব উদযাপিত হইলে ভিক্ষু-সঙ্ঘ ও ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ উভয়ের সমক্ষে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ( প্রবারণ ) ত্রত পালন করিবেন ।

৫। উভয় সঙ্ঘ হইতে 'মানত' শাসন গ্রহণ করিবেন ।

৬। দুই বৎসর অধ্যয়নের পর উভয় সঙ্ঘ হইতে উপসম্পদা দীক্ষা লাভ করিবেন ।

৭। শ্রমণদের নিন্দা ও তাহাদের প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করিবেন না ।

৮। ভিক্ষুরা তাঁহাদের দোষ বলিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সংপথে রক্ষা করিবেন, কিন্তু ভিক্ষুদের প্রকাশ্যে দোষ ধরা ভিক্ষুণীদের সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ।

মহাপ্রজাপতি এই ধর্ম্যানুশাসন গ্রহণ করিয়া বুদ্ধের প্রথমা শিষ্যা রূপে দীক্ষিতা হইলেন । পরে তিনি এক সময়ে ভিক্ষু ভিক্ষুণী যাহাতে গুণ ও কর্ম্যানুসারে সমান মানমর্যাদার অধিকারী হয়, এইরূপ প্রস্তাব করেন ; কিন্তু বুদ্ধদেব তাহাতে সম্মত হইলেন না । কালক্রমে ভিক্ষুণীদের উপযোগী স্বতন্ত্র নিয়মাবলী প্রস্তুত হইল । ভিক্ষুণী ভিক্ষুমণ্ডলীর সহচরী হইয়া ফিরিবেন, স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া কুত্রাপি গমনাগমন করিবেন না । বুদ্ধের

আদর্শ সন্ন্যাসিনী কিরূপে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবেন, তাহা মহাপ্রজ্ঞাপতির প্রতি তাঁহার যে উপদেশ, তাহাতেই ব্যক্ত হইয়াছে । তৃষ্ণা পরিহার, অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকা, বৃথা আমোদ প্রমোদ হইতে দূরে থাকিয়া নির্জ্ঞানে ধ্যান ধারণা ধর্মসাধন করা, আলস্য ত্যাগ করিয়া শ্রমশীলা হওয়া, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া স্নেহী, বিনয়ী ও নম্র হওয়া, সকলের সহিত সন্তোষে সন্তোষের সহিত জীবন যাপন করা,—বৌদ্ধ তপস্বিনী এইরূপ শুদ্ধাচার অবলম্বন পূর্বক স্বকীয় ব্রত পালন করিবেন ।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর সংখ্যা ভিক্ষুদের তুলনায় অনেক কম, তাঁহাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্তের বল বৌদ্ধ সমাজে সেই পরিমাণে অল্প হইবারই কথা । অথচ এদিকে দেখা যায় বৌদ্ধতাপসীগণ জনসমাজে বহুমানের পাত্র ছিলেন । তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, নম্রকৌশল, সম্ভ্রান্ত পরিবারে গতিবিধি, তাঁহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার পরিচয়, মালতী-মাধব প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় । বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা নিজ বিদ্যা বুদ্ধি পূর্ণাবলে শ্রমণাপদে আকৃষ্ট হইতে পারিতেন ; এমন কি, তিনি অর্হৎ হইবারও অধিকারিণী ছিলেন । ক্ষেমা প্রভৃতি অনেকানেক বৌদ্ধতপস্বিনীদের প্রখর বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যগুণে বৌদ্ধসমাজে বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয় ।

ক্ষেমার সন্ন্যাস গ্রহণ ।--

ভিক্ষুণী-সম্ব প্রতীষ্ঠা হইবার পর বিম্বিসার-পত্নী ক্ষেমার সন্ন্যাস গ্রহণ উল্লেখযোগ্য । বুদ্ধদেব যখন শ্রাবস্তী হইতে রাজ-গৃহে ফিরিয়া গিয়া বেণুবনে ষষ্ঠ বর্ষা যাপন করিতেছিলেন, সেই

সময়ে ক্ষেমা রাণীর দীক্ষা হয় । তিনি অপরূপ রূপ লাভ্য গর্বে গর্বিত হইয়া বুদ্ধদেবের দর্শন লাভ কখন মনেও স্থান দেন নাই । একদিন দৈবক্রমে তিনি বেণুবনে বেড়াইতে বেড়াইতে বুদ্ধের আশ্রমের নিকট গিয়া উপস্থিত হন । বুদ্ধদেব দিব্যজ্ঞানে তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার গর্ব খর্ব করিবার মানসে মায়া-বলে স্বর্গ হইতে এক পরমা সুন্দরী অপরূপ আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন — রাণী তাহার প্রতি এক দৃষ্টি চাহিয়া রহিলেন । দেখিতে দেখিতে সেই রমণী যৌবন, বার্দ্ধক্য, জরা একে একে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল । এই দৃশ্য দেখিয়া ক্ষেমার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় ও গুরুমন্ত্র গ্রহণের জন্য তাঁহার মানসক্ষেত্র প্রস্তুত হয় । ঐ অবসরে ভগবান বুদ্ধ কতিপয় মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক তাঁহার কানে যেন মধু বর্ষণ করিয়া দিলেন । অতঃপর তথাগতের সদুপদেশ শ্রবণে ক্ষেমা সংসার ত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুমতি গ্রহণ পূর্বক ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হন এবং অচিরাৎ অর্হৎ পদবী অর্জন করেন । তিনি তথাগতের অগ্রশ্রাবিকা মধ্যে পরিগণিত হইয়া সর্বদা তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান পাইতেন । এই হেতু তাঁহাকে ‘দক্ষিণ হস্ত’ শ্রাবিকা বলিত ।

উৎপলবর্ণা ।—

উৎপলবর্ণা কোন এক ধনবান গৃহপতির কন্যা ছিলেন—এই প্রসঙ্গে তাঁহার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে । এই কন্যাটী রূপে গুণে অদ্বিতীয় ছিলেন । তাঁহার পাণিগ্রহণের প্রার্থীরও অভাব ছিল না । তাঁহার পিতা মনে মনে ভাবিলেন,—যদি ইহাকে

কোন রাজা বা যুদ্ধরাজের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহার শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, প্রার্থীদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব বাধিয়া যাইবে। এই ভাবিয়া তিনি তাহাকে চিরকুমারী রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করাইলেন। এই কুমারী স্বীয় তপস্যার প্রভাবে অচিরাৎ অর্হৎ পদ লাভ করিলেন। উৎপলবর্ণা বুদ্ধের এক অগ্রশ্রাবিকা। ইনি সর্বদাই গুরুদেবের বামপার্শ্বে বসিতেন বলিয়া, ‘বামহস্ত’ শ্রাবিকা নামে অভিহিত হইতেন।

খেরীগাথায় নিম্নলিখিত খেরীগণের নামোল্লেখ আছে :—

পূর্ণা, ভিষ্মা, ধীরা, মিত্রা, ভদ্রা, উপশমা, মুক্তা, ধর্মদণ্ডা, বিশাখা, সুমনা, উত্তরা, ধর্ম্মা, সজ্জা, জয়ন্তী, আঢাকাশী, চিত্রা, মৈত্রিকা, অভয়া, শ্যামা, উত্তমা, দাম্বিকা, শুক্লা, শেলা, সোমা, কপিলা, বিমলা, সিংহা, নন্দা, মিত্রকালী, বকুলা, সোনা, চন্দ্রা, পটাচারা, বাশিষ্ঠী, ক্ষেমা, সূজাতা, অনুপমা, মহাপ্রজাপতি, গৌতমী, গুপ্তা, বিজয়া, চালা, বৃকমাতা, কুশাগৌতমী, উৎপলবর্ণা, পূর্ণিমা, অম্বপালী, রোহিনী, চম্পা, সুন্দরী, শুভা, ঋষিদাসী, সুমেধা ইত্যাদি।

সূত্রপিটকে খেরাগাথা ও খেরীগাথা নামক দুইখানি গাথা সংগ্রহ পুস্তক আছে, তাহাদের ভাষ্যে রচয়িতা রচয়িত্রীদের নাম ও জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যায় যে, অনেকানেক স্ত্রীরা তপস্বিনী গৌতমের জীবদ্দশায় খেরীগাথা রচনা করেন। অনেকগুলি গাথা অতি সুন্দর, ও লেখিকার স্বেচ্ছা এবং ধর্ম্মশীলতার পরিচয় প্রদান করে। এই

সকল তপস্বিনী বৌদ্ধ ধর্মের উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন, ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণ সেই উপদেশ শ্রবণ করিতে আসিত, ও শুনিয়া মোহিত হইত। খেরীভ'য়ে সোমা নামক একটা তাপসীর কথা আছে, তিনি রাজা বিশ্বিসারের সভাপণ্ডিতের কন্যা, দীক্ষালাভের পর ধ্যান ধারণা সাধনার দ্বারা অর্হৎপনা লাভ করেন। তিনি শ্রাবস্তীর নিকটস্থ এক উপবনে বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্না আছেন, এমন সময় 'মার' আসিয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিবার মানসে ভয় দেখাইতে লাগিল—

বহু তপস্যার ফলে যোগী ঋষি লভয়ে যে স্থান,  
তুমি নারী, কেমনে পাইবে বল তাহার সন্ধান !  
চিবকাল রাঁধ বাড়, তবুও ত পাকিল না হাত,  
টিপিয়া দেখিতে হয় বার বার ফুটেছে কি ভাত !

তখন শ্রবীর উত্তর করিলেন—

নারীজন্ম লভিয়াছি, বল তাহে ক্ষতি কি আমার,  
নরনারী সবাচার সত্বালাভে তুল্য অধিকার ।  
একাগ্র করিয়া চিত্ত, আপনায় করিয়া নির্ভর,  
অর্হতের পথ ধরি, ধীবে ধীবে হব অগ্রসর ।  
বিষয় বাসনা যত, কালে হবে ছিন্ন মূল তার,  
সত্যের আলোকে আর ঘুচে যাবে অজ্ঞান অঁধার ।  
জান্ ওরে ভাল করে, আপনারে দেখ্ ছুরাশয়,  
আমিও চিনেছি তোরে, নাহি আর নাহি কোন ভয় ।

বৌদ্ধ গৃহস্থ ।—

বৌদ্ধধর্ম গৃহস্থাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে. এ তাহার এক প্রধান দোষ, কেন না ইহা কে না স্বীকার করিবে যে, উদাসীন সম্প্রদায় বিস্তৃত হইলে সমাজ রক্ষা সুকঠিন । সকলেই সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইলে মনুষ্যকুল ধ্বংস হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং সন্ন্যাসী দলও বিনষ্ট হইয়া যায় ! দেখুন ভিক্ষুদের ধনোপার্জনের পথ বন্ধ—তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন, রক্ষণাবেক্ষণ সকলি গৃহস্থের বদান্যতার উপর নির্ভর । ভিক্ষু গৃহীর অল্পেই প্রতিপালিত, গৃহীর প্রসাদেই তাহার বাস পরিচ্ছদের সংস্থান । গৃহস্থেরা যদি গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়া বাহির হয়, তাহা হইলে সংসার যন্ত্রের কল বন্ধ হইয়া যায়, অন্নভাবে সম্ভাভাবে মনুষ্যসমাজ—বৌদ্ধ সঙ্ঘ—সকলি উচ্ছন্ন হইয়া যায় । বুদ্ধদেব স্বয়ং ইহা সম্যকরূপে অবগত ছিলেন, এই হেতু ভিক্ষু ছাড়া গৃহস্থ শিষ্যও বৌদ্ধ সমাজের অঙ্গীভূত ছিল । কিন্তু বৌদ্ধ সঙ্ঘের সহিত বৌদ্ধ গৃহস্থের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না । গৃহস্থকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিবার এক ত্রিশংগ মন্ত্র ভিন্ন আর কোন বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল না । আচারবিচারে বৌদ্ধ গৃহস্থ স্বধর্ম রক্ষা করিয়া চলুন, তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি নাই—বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে অন্নচ্ছাদনে পোষণ করাই তাঁহাদের কার্য্য । বৌদ্ধ গৃহস্থের নাম উপাসক উপাসিকা, তাঁহারা একপ্রকার কনিষ্ঠ অধিকারী । বুদ্ধের খাস শিষ্যমণ্ডলীতে প্রবেশ করিতে গেলে সজ্বভুক্ত হওয়া আবশ্যিক—তাঁহারা

অনেকে ততদূর বাইতে প্রস্তুত ছিলেন না ; তিস্কুদিগকে সংরক্ষণ করাই তাঁহাদের বুদ্ধত্বের লক্ষণ ।

তিস্কুদের জগৎ বুদ্ধদেব যে সকল নিয়ম বাঁধিয়া দেন, তাহার কতকগুলি নিয়ম গৃহস্থের পালনীয় । ধার্মিক সূত্রে গৃহস্থের কুলধর্ম বলিয়া যে সকল বিধান দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে জীবহত্যা, চুরি, মিথ্যাভাষণ, ব্যভিচার ও সুরাপান, এই পঞ্চ নিষেধ সর্বসাধারণ—ইহা ছাড়া আরো কতকগুলি অনুশাসন আছে, যথা—

অকাল ভোজন করিবে না ।

মাল্য গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি ব্যবহার করিবে না ।

মাদুর বিছাইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে ।

এই তিনটি বিধান গৃহস্থের প্রতি ততটা বন্ধনকারী নয়, তথাপি শুদ্ধাচারী গৃহস্থের পালনীয় ।

উপবাস ।—

অমাবস্তা পূর্ণিমা ও আর দুই দিন—মাসের মধ্যে এই চার দিন উপবাস । তা ছাড়া প্রতিহার পক্ষও রক্ষণীয় ।

প্রতিহার পক্ষ কি, না বর্ষার ৩ মাস এবং বর্ষার পর-মাস, বাহাকে চীবর মাস বলে, অর্থাৎ নূতন চীবর ধারণের সময় । চীবর ধারণের অর্ধমাস উপবাস প্রভৃতি ব্রত পালনের প্রশস্ত কাল ।

এই সমস্ত নিয়ম ও ব্রত পালন তিস্কু ও গৃহস্থের পক্ষে সমান, প্রত্যেক এই যে কতকগুলি বিধান, বাহা তিস্কুদের অবশ্য



পালনীয়, গৃহস্থের উপর তাহার ততটা বন্ধন নাই ; আর দুইটি নিষেধ ভিক্ষুদের জগ্ৰহী করা হইয়াছে - অর্থাৎ নৃত্য গীত নাট্যাদি দর্শন না করা, এবং সোণা রূপা গ্রহণ না করা - এই দুই গৃহস্থ সমাজে খাটে না। তেমনি আবার গৃহীদের প্রতি কতকগুলি বিশেষ বিধান আছে, যথা, সাধুজীবিকা অবলম্বন করা, পিতা মাতাকে ভক্তি করা, গুরুজনকে মান্য করা, ভিক্ষুদিগকে অন্ন বস্ত্র দান দ্বারা পোষণ করা, ইত্যাদি। শৃগালবাদ সূত্রে গৃহীধর্ম আরো বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সারাংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বুদ্ধদেব রাজগৃহের নিকটবর্তী বেণুবনে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। ভিক্ষায় বাহির হইবার সময় দেখিলেন শৃগাল নামক জনৈক গৃহস্থ আর্দ্রবেশে কৃতাঞ্জলিপুটে, উপরে আকাশ নীচে পাতাল, চারিদিক নিরীক্ষণ করত নমস্কার করিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে শৃগাল বলিলেন—“ভগবন, পিতৃকুলের তর্পণ উদ্দেশে এইরূপ করিতেছি।” পরে এই আট দিক কি উপায়ে সুরক্ষিত হইতে পারে, বুদ্ধদেব সেই বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিলেন :—

জলসিঞ্চনে নয়, কিন্তু শুভ চিন্তা ও কর্তব্য পালনে সর্বদিক সুরক্ষিত হয়। পূর্ব দিকে আলোক সঞ্চার হয়, পূর্বমুখী হইয়া পিতা মাতার প্রতি কর্তব্যে মনোনিবেশ করিবে। দক্ষিণে ধনাগম, দক্ষিণ মুখে গুরুর প্রতি কর্তব্য চিন্তন করিবে। পশ্চিমে দ্বিষাবসানের সুরাগ ও শান্তি—পশ্চিমমুখী হইয়া স্ত্রীপুত্রের মঙ্গল চিন্তা করিবে। উত্তরে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন, উর্ধ্বে

ত্রাফণ শ্রমণ সাধু সঙ্ঘন, অধোতে দাস পরিজনের প্রতি কর্তব্য  
স্মরণ ও মনন করিলে ছয় দিক সুরক্ষিত থাকিবে—সর্ব অমঙ্গল  
দূর হইবে।

মনুষ্যের পরস্পারের প্রতি কর্তব্য সাধনের নিয়ম এই—

পিতা পুত্র—

পুত্রের প্রতি পিতার কর্তব্য

- ১। পুত্রকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করা
- ২। ধর্ম শিক্ষা দান
- ৩। বিদ্যা দান
- ৪। পুত্রের বিবাহ—সৎপাত্রে কন্যাদান
- ৫। বিষয়াধিকার প্রদান

পুত্রের কর্তব্য

- ১। পিতা মাতার ভরণপোষণ করা
- ২। কুলধর্ম রক্ষণ
- ৩। বিষয় রক্ষা
- ৪। পিতার যোগ্য পুত্র হইবার চেষ্টা
- ৫। পিতা মাতার স্মৃতি রক্ষা

গুরু শিষ্য—

গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্তব্য

- ১। গুরুভক্তি
- ২। গুরুর সেবাশ্রদ্ধা
- ৩। আজ্ঞা পালন

## বৌদ্ধধর্ম ।

৪। গুরুদক্ষিণা দান

৫। বিদ্যাভ্যাস

শিষ্যের প্রতি গুরুর কর্তব্য

১। স্নেহ ও শিষ্টাচার

২। ধর্মশিক্ষা ও উপদেশ প্রদান

৩। আপদ বিপদ হইতে সংরক্ষণ

স্বামী দ্বী—

দ্বীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য

১। সম্মান প্রদর্শন

২। ভালবাসা

৩। একনিষ্ঠতা

৪। ভরণপোষণ বেশভূষায় তুষ্টি সাধন

স্বামীর প্রতি দ্বীর কর্তব্য

১। গৃহকার্যে দক্ষতা

২। অতিথি সেবা

৩। সতীহ রক্ষা

৪। নিতব্যয়ী হওয়া

৫। শ্রমশীলতা

বন্ধুর প্রতি বন্ধুর কর্তব্য

১। উপহার দান

২। মধুরালাপ

## বৌদ্ধধর্ম ।

- ক্রম ৩। কল্যাণ-কামনা  
৪। আত্মবৎ ব্যবহার  
৫। সুখ-সম্পত্তি বাঁটিয়া ভোগ করা

### সখ্য-লক্ষণ

- ১। বিপদে রক্ষা করা  
২। বিষয় রক্ষা  
৩। আশ্রয় দান  
৪। বিপদ কালে বন্ধুকে পরিত্যাগ না করা  
৫। পরিবার পোষণ

### প্রভু-ভৃত্য—

#### ভৃত্যের প্রতি প্রভুর কর্তব্য

- ১। যথাশক্তি তাহার কর্ম বিভাগ করিয়া দেওয়া  
২। অন্ন, বেতন, পারিতোষিক দান  
৩। ঔষধ পথ্য প্রদান  
৪। ভাল জিনিস পাইলে বাঁটিয়া দেওয়া  
৫। কর্ম হইতে মধ্যে মধ্যে অবকাশ দান

#### প্রভুর প্রতি ভৃত্যের কর্তব্য

- ১। উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শন  
২। সকলের শেষে বিশ্রাম করা  
৩। সন্তোষ অবলম্বন  
৪। কায়মনে প্রভু-সেবা করা  
৫। সবিনয় সস্তাষণ

ব্রাহ্মণ শ্রমণের প্রতি গৃহীর কর্তব্য

- ১। কায়মনোবাক্যে প্রিয়কার্য সাধন
- ২। আতিথ্য
- ৩। অন্ন বস্ত্র দান

গৃহীর প্রতি ভিক্ষুর কর্তব্য

- ১। পাপ হইতে নিবৃত্ত করা
- ২। ধর্মোপদেশ প্রদান
- ৩। শিক্ষাচার
- ৪। ধর্ম বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন
- ৫। মুক্তিপথ প্রদর্শন

এইরূপে পরস্পর কর্তব্য পালন করিলে ছয় দিক সুরক্ষিত  
ও গৃহস্থের সর্বপ্রকার কল্যাণ হয় ।

দান সৌজন্য দয়া দাক্ষিণ্য নিঃস্বার্থতা গৃহস্থ জীবনের পরম  
সম্বল ।

শৃগাল বৌদ্ধধর্মে উপাসকরূপে গৃহীত হইলেন ।

এই সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান আষ্টাঙ্গিক আর্ধ্যমার্গের প্রথম  
সোপান । এই পথে চলিতে চলিতে মুমুকু ব্যক্তি কালক্রমে  
অর্হৎমগুলীর সহবাসের যোগ্য হইয়া সেই শান্তিধামে উপনীত  
হয়েন, যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, মৃত্যু নাই, সকল পাপের  
ক্ষয়, সর্ব দুঃখের অবসান হয় । সেই নির্বাণ—সে অবস্থা  
দেবতানিগেরও স্পৃহণীয় ।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

### বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ।

শাক্যসিংহ কোন লিখিত গ্রন্থ রাখিয়া যান নাই; বৌদ্ধ-শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিতেরা বলেন যে তাঁহার কথাবার্তা উপদেশ নিয়মাদি ঐতিহ্যপরাম্পরায় শিষ্যমুখে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে, পরে কোন সময়ে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়। বুদ্ধের মরণোত্তর বৌদ্ধদের চারিটি মহাসভার উল্লেখ করা গিয়াছে, এই স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি করা ষাইতে পারে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কিছু গরেই মহাকাশ্যপের মন্ত্রণায় রাজা অজাতশত্রুর আশ্রয়ে রাজগৃহে সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সভার অধিবেশন হয়। উহার এক শতাব্দী পরে কালাশোক, তৎপরে অশোক রাজা, এবং খ্রিস্ট-পূর্ব ১৪৩ শতাব্দে কাশ্মীরের শকজাতীয় রাজা কণিক যথাক্রমে বৈশালী, পাটলিপুত্র ও জালন্ধরে এক একটি সভা করেন। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় সভায় বুদ্ধের উপদেশ ও কথাবার্তা সংকলিত হইয়া বৌদ্ধশাস্ত্র প্রস্তুত ও অশোকের সভায় সেই শাস্ত্র পুনর্ব্বার সমালোচিত ও স্থিরীকৃত হয়। ঐ শাস্ত্র তিন প্রকার—বিনয় পিটক, সূত্র পিটক এবং অভিধর্ম পিটক। এই তিনের সমবেত নাম ত্রিপিটক। ইহাতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত ও বিশ্বাস, অনুষ্ঠান প্রণালী, প্রায়শ্চিত্ত বিধান, নীতি, উপাখ্যান, দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি বিনিবেশিত আছে।

পালিভাষায়\* লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি সমধিক প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। তথাপি ত্রিপিটক শাস্ত্র ঠিক কোন্ সময়ে পুঁথি ও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রবাদ এই যে, পাটলিপুত্রে যে ত্রিপিটক শাস্ত্র প্রণীত হয়, অশোকপুত্র মহেন্দ্র তাহা লইয়া সিংহলে গমন করেন, এবং তিনি ঐ সময়ে ত্রিপিটকের পালি ভাষ্যও মগধ হইতে আনহিয়া সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করেন। কেহ কেহ বলেন ত্রিপিটকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কণ্ঠস্থ করিয়া তিনি সিংহল যাত্রা করেন। সে যাহা হউক, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, রাজা বস্তুগামনীর রাজত্বকালে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পালি শাস্ত্র সিংহলে প্রথম লিপিবদ্ধ হয়, এবং বুদ্ধঘোষের সময় অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দে যে ঐ শাস্ত্রের পালি পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল, ইহাও একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত।\* খুব সম্ভব ঐ পাণ্ডুলিপি মহেন্দ্রের সময়ে বিদ্যমান ছিল। এখন বিবেচ্য এই—তাহার কত পূর্বে উহা প্রস্তুত হয়? এই বিষয়ের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ এক এই পাওয়া যায় যে, প্রচলিত ত্রিপিটকের ভিতরে রাজগৃহ ও বৈশালী সভার উল্লেখ আছে, অতএব তাহার উদ্ভবকালে ত্রিপিটক রচনা হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আর এক কথা এই যে, ত্রিপিটকের মধ্যে পাটলিপুত্র সভার কোন উল্লেখ নাই, অতএব তৎপূর্বে ইহার রচনাকাল নির্দ্ধারিত হইতে পারে। ইহা হইতে নিদান এইটুকু স্থির বলা যায় যে, বৈশালী এবং পাটলিপুত্র সভার মাঝামাঝি কোন সময়ে

\* Introduction to Sacred Books of the East, Vol. X.



ত্রিপিটক শাস্ত্র প্রথম প্রস্তুত হয় । আবার ঐ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তাহার কিয়দংশ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, যেমন বিনয়ের প্রাতিমোক্ষ ভাগ, এবং বুদ্ধ উপদেশের কিয়দংশ । এই সমস্ত কারণে ত্রিপিটকের কিয়দংশ ধর খৃষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দে, কতক বা তাহারও পূর্বের বিরচিত । দক্ষিণ অঞ্চলের বৌদ্ধেরা ঐ শাস্ত্র সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করেন, ও পরে তাহা ব্রহ্মদেশাদির ভাষায় অনুবাদিত হয় । এ ভিন্ন উহা ভোট, চীন, মোগল, কালমুখ প্রভৃতি উত্তর দেশীয় অন্যান্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে ।

বৌদ্ধ শাস্ত্রাস্তর্গত গ্রন্থাবলীর তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

### বিনয় পিটক ( সঙ্ঘ-নিয়মাবলী )

- |                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| ১। সূত্র বিভাগ            | { | পারাজিকা<br>প্রায়শ্চিত্ত বিধান            |
| ২। খন্ধক                  | { | মহাবগ্গ, মহাবর্গ<br>চুল্লবগ্গ, ক্ষুদ্ৰবর্গ |
| ৩। পরিবার পাঠ, পরিশিষ্ট । |   |  |

### সূত্রপিটক ( বুদ্ধের উপদেশ )

- ১। দীঘ নিকায়, ৩৪ দীর্ঘ সূত্রসংগ্রহ ( মহাপরিনির্বাণ সূত্র প্রভৃতি )

২ । মধ্যম নিকায়, ১৫২ মধ্যম সূত্র-সংগ্রহ ।

৩ । সংযুক্ত নিকায়, সংযুক্ত সূত্র-সংগ্রহ ।

৪ । অঙ্গুত্তর নিকায়, বিবিধ সূত্র-সংগ্রহ ।

৫ । ক্ষুদ্রক নিকায়, ক্ষুদ্র সূত্র-সংগ্রহ, ইহার মধ্যে

নিম্নোক্ত ১৫ খানি গ্রন্থ সন্নিবেশিত :—

১ । ক্ষুদ্রক পাঠ ।

২ । ধম্মপদ ।

৩ । উদান, স্তুতি ( ৮২ সূত্র )

৪ । ইতিবৃত্তক, বুদ্ধ কথাবলী ।

৫ । স্তুতি নিপাত, ৭০ সূত্র ।

৬ । বিমান বথু, স্বর্গ কথা ।

৭ । পেত বথু, প্রেত কথা ।

৮ । থেরাগাথা, স্থবির-গাথা ।

৯ । থেরীগাথা, স্থবির-গাথা ।

১০ । জাতক, পূর্বজন্ম কাহিনী ।

১১ । নিদ্দেশ, সারীপুত্রের ব্যাখ্যান ।

১২ । পতিসস্তিধামগ্গ, প্রতিসম্বোধমার্গ ।

১৩ । অপদান, অর্হৎ চরিত্র ।

১৪ । বুদ্ধবংশ, গৌতম ও পূর্ববর্তী ২৪ জন বুদ্ধের  
জীবনবৃত্ত ।

১৫ । চরিয়া পিটক, বুদ্ধ-চরিত ।

## অভিধম্ম পিটক ( দর্শন )

- ১। ধম্মসঙ্গি ।
- ২। বিভঙ্গ ।
- ৩। কথাবন্ধুপকরণ ।
- ৪। পুগ্গলপদ্ধতি !
- ৫। ধাতুকথা ।
- ৬। যমক, ( পরম্পর বিরোধী যুগল কথা সংগ্রহ ) ।
- ৭। পট্টানপকরণ ( কার্য্যকারণ নির্ণয় ) ।

চুল্লবর্গের শেষ দুই খণ্ডে রাজগৃহ ও বৈশালী সভার বিবরণ বর্ণিত আছে, এবং কথিত হইয়াছে যে, প্রথম সভায় উপালী 'বিনয়' আবৃত্তি করেন, আনন্দ 'ধর্ম্ম' পাঠ করেন । ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐ সময়ে শাস্ত্রের দুই অঙ্গই ছিল, তৎপরে 'ধর্ম্ম' দুই ভাগে বিভক্ত হয়—সূত্র এবং অভিধর্ম্ম । এই অভিধর্ম্ম খণ্ড ক্রমে অপর দুই পিটকের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়ায় ।

সূত্র বিভঙ্গ ।—

বৌদ্ধ সঙ্ঘে অমাবস্থা পূর্ণিমায় যে দোষ ও প্রায়শ্চিত্ত-বিধান পঠিত হয়, সেই ব্যবস্থাগুলি ইহার মূল সূত্রে গ্রথিত । ক্রমে ভাষ্যের উপর ভাষ্য ও টীকা সংযুক্ত হইয়া গ্রন্থখানি বাড়িয়া গিয়াছে । এই সমস্ত নিয়মাবলী সূত্রবিভঙ্গের অনঙ্গীভূত ।

প্রাতিমোক্ষ ।—

প্রায়শ্চিত্ত-বিধানগুলি স্বতন্ত্র আকারে প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থে প্রকাশিত হয় । ইহা বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ, সঙ্ঘের নিঃস্যাধলী বুদ্ধ স্বয়ং ইহা প্রবর্তিত করেন, তাহা ইহার মধ্যে থাকাই সম্ভব । তথাপি আশ্চর্য্য এই যে, বৌদ্ধেরা ইহার শাস্ত্রীয় মর্যাদা সূত্র বিভক্তের সমান জ্ঞান করেন না ।

মহাবগ্গ } কালক্রমে নানা প্রক্ষিপ্ত অংশে পুষ্টিলাভ  
চুল্লবগ্গ } করিয়া বর্দ্ধিত আকার ধারণ করিয়াছে ।  
পরিবার পাঠ পরবর্তী কালে সঙ্কলিত ।

মহাপরিনির্বাণ সূত্র সূত্র-পিটকের দীর্ঘনিকায়ে অস্তর্গত । ইহাতে বুদ্ধজীবনের শেষ ৩ মাসের ঘটনাবলী ও মরণবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে । ইহাতে বুদ্ধের মুখে পাটলিপুত্রের ভাবি উন্নতি বিষয়ের যে কথাগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে ইহার রচনাকাল, পাটলিপুত্র মগধ-রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার উত্তরকালে বলিয়া অনুমান হয়, — খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দী ধরা যাইতে পারে

ধর্মপদ ।—

সূত্র-পিটকের অস্তর্ভূত ক্ষুদ্রক নিকায়ে পঞ্চদশ গ্রন্থের একটা গ্রন্থ । ইহার নাম হইতেই বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ধর্ম-নীতি বিষয়ক পদাবলী । ইহাতে যে সকল ধর্ম-প্রবচন ও হিতোপদেশ আছে, আমাদের মহাভারত, গীতা, এবং অন্যান্য নীতিশাস্ত্রে তাহার অনুরূপ কথার অপ্রতুল নাই, কতক

বিষয়ে অবিকল সাদৃশ্যও উপলব্ধিত হয়—তথাপি ইহার কোন কোন ভাগে বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্ব উপলব্ধি করা যায়, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । ইহার কতিপয় শ্লোক নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি, তাহা হইতেই ইহার স্বরূপ ও ম. মত কতকটা বুঝিতে পারিবেন ।

এইখানে প্রথমে দুইটা শ্লোক বলিব, তাহা বুদ্ধদেব প্রবুদ্ধ হইবামাত্র উচ্চারণ করেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস ।

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্‌সং অনিবিবসং  
 গহকারকং গবেসন্তো দুঃখা জাতি পুনপ্পুনং ।  
 গহকারক ! দিট্ঠোহসি, পুন গেহং ন কাহসি  
 সব্বা তে ফাঙ্গুকা ভগ্গুগা গহকূটং বিসংখিতং ।  
 বিসঙ্খারগতং চিত্তং ত্‌হানং খয়মজ্জ্বগা ।

অর্থ—জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান,  
 সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ ।  
 পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার—  
 হে গৃহকারক ! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর ।  
 ভেঙ্গেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়,  
 সংস্কারবিগত চিত্ত, তুম্বা আজি পাইয়াছে ক্ষয় ।

মনেতেই ধর্ম । ১, ২

মনেতেই ধর্ম ; ধর্ম মনোগামী । যে ব্যক্তি মন্দভাবে  
 আলাপ ও কার্য করে, টানা গাড়ী যেমন বলদের পিছনে  
 পিছনে যায় দুঃখ সেইরূপ তার অনুগামী হয় ।

মনেতেই ধর্ম; ধর্ম মনোগামী । যিনি ভাল ভাবে  
আলাপ ও কার্য করেন, ছায়ার স্থায় সুখ তাঁর অনুগামী হয় ।

যে যা করে, সে তা হয়; উল্টে না কদাপি,  
সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী ।

( পড়ে ব্রাহ্মধর্ম )

পাপ পুণ্য । ১৭, ১৮ .

পাপকারী ইহলোক পরলোক উভয়ত্র দুঃখ ভোগ করে ।  
ইহলোকে পাপাচরণ করিয়া সন্তাপ, পরলোকে দুর্গতি প্রাপ্ত  
হইয়া আরো যন্ত্রণা ।

পুণ্যবান ইহলোকে পরলোকে উভয়ত্র সুখ ভোগ করেন ।  
ইহলোকে পুণ্য কর্ম করিয়া আনন্দিত, পরলোকে সদগতি প্রাপ্ত  
হইয়া অধিকতর আনন্দ উপভোগ করেন ।

পাপ করি পাপকীর্তি দহে পাপানলে,  
পুণ্য করি পুণ্যকীর্তি বাড়ে পুণ্য ফলে ।  
পুণ্য আচরণে আত্মা হয় পুণ্যময়,  
পাপ আচরণে হয় পাপের আলায় ॥ ঐ

১২১ । পাপ আসিবে না মনে করিয়া পাপ বর্জনে অবজ্ঞা  
করিবেক না; জলবিন্দুপাতে অল্পে অল্পে জলকুন্ত পূর্ণ হয়,  
অল্পে অল্পে সঞ্চয় করিয়া মূর্খ পান<sup>য়</sup> পূর্ণ হয় ।

ক্ষরিলে ইন্দ্রিয় কোনো, বুদ্ধিও ক্ষরিতে শুরু করে  
কলসের ছিদ্র দিয়া জল যথা ক্রমশঃ নিঃসরে । ঐ

১২২। পুণ্য আসিবে না মনে করিয়া পুণ্যার্জনে অবজ্ঞা করিবেক না। জলবিন্দুপাতে অল্পে অল্পে জলকুন্ত পূর্ণ হয়, ধীর ব্যক্তি অল্পে অল্পে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পুণ্যে পূর্ণ হয়েন।

ক্ষুদ্রকীট পুস্তিকা বিরচে যথা প্রকাণ্ড আलय,  
অল্পে অল্পে তেমনি ধরম ধন করিবে সঞ্চয়। ঐ

১৬৫। মনুষ্য আপনিই পাপ করে, আপনিই তার ফল ভোগ করে। আপনি পাপ কর্ম হইতে বিরত হয়, আপনিই শুদ্ধি লাভ করে। পাপ পুণ্য আমার নিজেরই জিনিস, আপনি ভিন্ন আর কেহ আমাকে পরিত্রাণ করিতে সক্ষম নহে।

একাই জনমে নর, একা হয় মৃত ;  
একাই সুকৃত ভুঞ্জে, একাই দুকৃত। ঐ

২১৯-২২০

চির-প্রবাসী দূর হইতে নির্বিঘ্নে প্রত্যাগত হইলে আত্মীয় স্বজন বন্ধু তাহাকে স্বাগত বলিয়া অভ্যর্থনা করে, সেইরূপ পুণ্যবান ব্যক্তি পুণ্য কর্ম করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলে পর তাঁহার পুণ্য তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় প্রতিগ্রহণ করেন।

চিরপ্রবাসিঃ পুরিসঃ দূরতো সোথিমাগতং,  
এগতি মিত্তা সুহজ্জা চ অভিনন্দন্তি আগতং ।  
তথেষ কত পুণ্ণম্পি অস্মা লোকা পরং গতং  
পুণ্ণানি পতিগ্গহন্তি পিয়ং এগতীব আগতং ।

( পালি )



অহিংসা ১৩০, ১৩১

সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবিত সকলেরই প্রিয় । তুমিও আপনাকে তাহাদের উপমাঙ্ঘলে আনিয়া কাহাকেও বধ বা হিংসা করিবে না ।

যিনি আত্মসুখ কামনায় অন্য সুখকামী জীবের হিংসা করেন, তিনি ইহলোকে হইতে অবসৃত হইয়া সুখ প্রাপ্ত হন না ।

সবেব তসস্তু দণ্ডস্‌স সবেবসং জীবিতং পিয়ং,  
অন্তানং উপমং কহ্মা ন হনেম্ম ন ঘাতয়ে ।  
সুখ কামানি ভূতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি,  
অন্তনো সুখমেসানো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং ।

( পালি )

প্রাণা যথাত্তনোহভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা,  
আত্তোপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্কবন্তি সাধবঃ ।

( হিতোপদেশ )

রিপুদমন । ৩, ৪, ৫, ২২২, ২২৩

“ও আমাকে মারিয়াছে, ও আমায় গালি দিয়াছে, আমার চুরি করিয়াছে” এই সকল চিন্তা মনে স্থান না দিলে বৈরী আপনাপনি প্রশমিত হয়; কেননা হিংসা প্রতিহিংসা দ্বারা জিত হয় না, প্রেম দ্বারা জিত হয় ।

ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা জয় করিবে, অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবে, কৃপণকে দান দ্বারা, অসৎকে সত্য দ্বারা জয় করিবে ।

অকোথেন জিনে কোথং অসাধুং সাধুনা জিনে,  
জিনে কদরিয়ং দানেন, সচেন অলিকবাদিনং । ( পালি )

অক্রোধে জিনিবে ক্রোধ

অসাধুতা সাধু আচরণে,

অসত্য জিনিবে সত্য

কদর্ঘো করিবে বশ—ধনে । (পড়ে ব্রাহ্মধর্ম)

সেই সারথী, যে ক্রোধকে আপনার বশে রাখিতে পারে,—

অপর ব্যক্তি কেবল রাশ-রজ্জু-ধারী ।

বুদ্ধিহীন যেই জন, মন যার সতত অস্থির,

তাহার ইন্দ্রিয়গণ দুর্ভ্রম যেন সারথীর ।

যেই জন স্ববুদ্ধি, কর্তব্যে যার নাহিক আলস্য,

তাহার ইন্দ্রিয়গণ সারথীর বশীভূত অশ্ব । ঐ

আত্ম সংযম । ৮০, ১০৩

উদকং হি নয়ন্তি নেত্তিকা, উসুকারা নময়ন্তি তেজনং, ( বেণুং )

দারুং নময়ন্তি তচ্ছকা, অন্তানং দময়ন্তি পণ্ডিতা ।

কৃপথস্তা জলের গতি নিয়ন্ত্রিত করে, ইষুকার মনের মত  
বাণ গড়িয়া লয়, সূতার কাষ্ঠ বাঁকা সোজা ইচ্ছামত গড়ে,  
জ্ঞানী ব্যক্তি আপনাকে আপনি নিয়মিত করেন ।

যিনি যুদ্ধে সহস্র লোকের উপর জয়লাভ করেন তিনি জয়ী  
নহেন, যিনি আপনাকে আপনি জয় করেন তিনিই যথার্থ বিজয়ী ।

সংসার । ১৭০, ১৭১

যথা বুব্বুলকং পস্‌সে যথা পস্‌সে মরীচিকং,

এবং লোকং অবেক্‌খন্তং মচ্চুরাচ্ছা ন পস্‌সতি ( পালি )

## বৌদ্ধধর্ম ।

সংসার জলবিশ্বপ্রায় দেখিবে, মরীচিকা-সম,  
করিবে; যিনি সংসারকে এইরূপে দেখেন, মৃত্যুরাজ  
কাছে ঘেসিতে পারে না ।

এই চাকচিক্যময় সংসার যেন রাজার রথ, বাহির হইবে  
দেখিবার জিনিস । মূঢ় ইহার প্রতি আসক্ত, জ্ঞানী ব্যক্তি  
ইহাকে স্পর্শ করেন না ।

মৃত্যু । ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯

“এইখানে শীত গ্রীষ্ম কাটাইব, এখানে বর্ষা ষাপন করিব”  
মূঢ় ব্যক্তি এই ভাবনায় অস্থির—মৃত্যুর অন্তরায় স্মরণ করে না ।  
শুশ্রূ গ্রামের উপর বন্যার ঞায় মৃত্যু আসিয়া পুত্র কলত্র শুদ্ধ  
তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়—তাহার মন বিপর্যাস্ত করিয়া  
ফেলে । পিতা পুত্র জ্ঞাতি বন্ধু কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে  
পারে না । ইহা জানিয়া জ্ঞানী ও সাধুপুরুষ শীঘ্রই নির্বাণ পথের  
কঠক মোচন করিবেন ।

পরলোকে সহায় হইয়া কেহ নাহি দিবে দেখা,

পিতামাতা, পুত্রদার, জ্ঞাতি বন্ধু ; ধর্ম্য রবে একা ।

কাষ্ঠ লোষ্ট্র সমান ভূতলে ত্যজি মৃত কলেবর

বন্ধুগণ যায় চলি, ধর্ম্য হয় পথের দোসর ।

( পড়ে ব্রাহ্মধর্ম )

জরা, মৃত্যু । ১৪৩, ১৪৮

এত হাসি, এত আমোদ প্রমোদ কিসের জন্ম ? সংসারের  
জ্বালা যন্ত্রণা অবিশ্রান্ত রহিয়াছে । তোমরা অন্ধকারে বাস  
করিয়া কেন না আলো অন্বেষণ কর ?

## বৌদ্ধধর্ম ।

অনহ ব্যাধিতে শীর্ণ, জরাজীর্ণ হইয়া ভগ্ন হইয়া যায়,  
সেই জীবনকে গ্রাস করিয়া ফেলে ।

আত্মদোষ পরচ্ছিন্ন । ২৫২

পরের দোষে সহজেই দৃষ্টি পড়ে, আপনার দোষ দেখিবার  
দেখি না । প্রতিবেশীর দোষগুলি ভূসির ন্যায় বাহিরে ফেলিয়া  
দি—নিজের দোষ যত্নে ঢাকিয়া রাখি, যেমন শিকারী পক্ষী হইতে  
আপনাকে ঢাকিয়া রাখে ।

কথা ও কাজ । ৫১, ৫২

কথা মধুর, কাজ বিপরীত,—নির্গন্ধ ফুলের ন্যায় দেখিতে  
রংচঙে, অথচ গুণ নাই ।

ভাল কথা, ভাল কাজ—সুগন্ধ সুবর্ণ পুষ্পের ন্যায় সর্বত্র  
সুন্দর ।

সুখ । ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯

আমরা সুখে থাকিব, আমাদের যে ঘৃণা করে আমরা  
তাহাকে ঘৃণা করিব না । আমাদের যারা ঘৃণা, আমরা  
তাহাদের মধ্যে ঘৃণাশূন্য হইয়া বাস করিব । আতুরের মধ্যে  
অনাতুর হইয়া থাকিব, লোভীর মধ্যে নিরোভী হইয়া বাস  
করিব । আমাদের আপনার কিছুই নাই, অথচ প্রীতিভোক্তা  
দেবতাদের ন্যায় আমরা সদানন্দ ।

স্ববির কে ? ২৭০, ২৬১

যাঁহার গুরুকেশ, তিনি বৃদ্ধ নহেন ; বয়সে বিজ্ঞ হয় না,  
বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে । সত্য প্রেম ক্রমা দয়া যাঁর, যিনি জ্ঞানবান  
শুদ্ধচিত্ত, তিনিই স্ববির ।

শুক্লকেশ ষাহার, সে নহে বৃদ্ধ ;

দেবতা সকলে

তাহারেই জানে বৃদ্ধ,

যৌবনেই বিছা যার ফলে ।

( পড়ে ব্রাহ্মধর্ম )

মুনি কে ? ২৬৮, ২৭৯

মুর্থ যে, সে মৌন হইলেই মুনি হয় না । জ্ঞানী ব্যক্তি  
নিষ্কির ওজনে সদসৎ বিবেচনা করিয়া, যাহা শ্রেয় তাহা গ্রহণ  
করেন, যাহা অসৎ তাহা পরিত্যাগ করেন।—তিনিই মুনি ।  
যিনি সংসারের ভাল মন্দ দুই দিক বিচার পূর্বক দেখেন,  
তিনিই মুনি ।

মৌনে মুনি না হয়

না হয় মুনি জটাজুট ভারে,

আপনাকে পছানে যে বিলক্ষণ—

মুনি বলি তারে ।

শ্রেয় আর প্রেয় ফিরে মনুষ্য মাঝারে,

ধীর ব্যক্তি উভয়ের প্রভেদ বিচারে ।

শ্রেয় যে গ্রহণ করে, বিপত্তি এড়ায়,

প্রেয় যে বরণ করে, সর্বস্ব হারায় । (পড়ে ব্রাহ্মধর্ম)

তৃষ্ণা । ২৭১, ২৭২

ব্রত অনুষ্ঠানে, শাস্ত্র অধ্যয়নে, ধ্যান বা বিবিক্ত শয়নে,  
সংসারীর দুঃপ্রাপ্য মোক্ষ লাভ হয় না । হে তিস্কু ! তৃষ্ণা  
নিবৃত্তি না হইলে এই সমস্ত সাধনার আশ্বাসযুক্ত হইও না ।

কামনা যে ত্যজে তার সব ধন মিলে,  
সুখের প্রবাহ বহে লোভ তেয়াগিলে ।

( পড়ে ব্রাহ্মধর্ম )

ভিক্ষু কে ? ৯, ১০, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০

যে ব্যক্তি কশায় ( পাপ ) হইতে বিমুক্ত না হইয়া কাষায় ( গেরুয়া বসন ) পরিধান করিতে চান, যিনি মিতাচারী ও সত্যবান নহেন, তিনি কাষায়ের যোগ্য নহেন । যিনি 'কশায়' হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যিনি ধর্মনিষ্ঠ, মিতাচারী ও সত্যপরায়ণ, তিনিই কাষায় বসনের উপযুক্ত ।

যিনি হস্ত পদ বাক্য বশে রাখেন, যিনি সংযত ও জিতেন্দ্রিয়, যিনি আপনাতে আপনি আনন্দময়, যিনি সন্তুষ্টচিত্তে বিজনে বাস করেন—তিনিই ভিক্ষু ।

হে ভিক্ষু ! নৌকার বোঝাই ফেলিয়া দিয়া ইহাকে হাল্কা কর, হাল্কা হইলে দ্রুত চলিবে । রাগ ঘেঁষ দূরে ফেলিয়া নির্বাণ পথের যাত্রী হও ।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের বন্ধন ছেদন কর ; যিনি এই পঞ্চ শিকল ভাঙ্গিয়াছেন, তিনিই 'ওঘোস্তীর্ণ' ভিক্ষু ।

৩৩০ । মুখের সহবাস অপেক্ষা একাকী বিজনে বাস ভাল । পাপাচরণ করিও না, অরণ্যে যেমন হস্তী চরিয়া বেড়ায়, তুমিও সেইরূপ একা একা মনের সুখে ফিরিয়া বেড়াও ।

২৭৬ । মুক্তি সাধনে তোমার আপনার চেষ্টা চাই, তথাগত উপদেষ্টা মাত্র । নির্বাণ পথে সাবধান হইয়া চল, নহিলে মায়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই ।

৩৩৭-৩৩৮ । বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিলেই নষ্ট হয় না, তাহার মূল যতক্ষণ অক্ষত থাকে ততক্ষণ সে মরে না, আবার বাড়িয়া ওঠে; তৃষ্ণার বিষয় বিনষ্ট হইলেও দুঃখ পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসে । মারের হস্ত হইতে যদি পরিত্রাণ চাও, তৃষ্ণা সমূলে উৎপাটন কর ।

একটা গাছ কাটিলে কি হইল? সমুদয় বন কাটিয়া ফেলা চাই । হে ভিক্ষু! সমস্ত বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত হও ।

যে ব্যক্তি সদাচারী শাস্ত্র সমাহিত হইয়া বুদ্ধের আদেশ পালন করেন, তিনি বাসনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া শাস্ত্র ও নির্ব্বাণানন্দ উপভোগ করেন ।

উলঙ্গ হইয়া ভ্রমণ, জটা ধারণ, ভস্ম লেপন, ভূমি-শয়ন, এ সকলি নিষ্ফল—যতক্ষণ অন্তরে বাসনানল প্রদীপ্ত রহিয়াছে ।

ব্রাহ্মণ কে? ৩৯১, ৩৯৬, ৩৯৯, ৪০১, ৪২২

জটাজুট ধারণ করিলে ব্রাহ্মণ হয় না, ব্রাহ্মণকূলে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণ হয় না; ঘাঁহাতে ন্যায় সত্য অধিষ্ঠান করে, তিনিই ব্রাহ্মণ ।

রে মূর্খ! জটাধারণে কি ফল? অজ্ঞান বসন পরিয়া কি লাভ? ভিতরে লোভ ভরপুর, বাহিরের চাকচিক্যে কি হইবে?

যিনি লোভী ও অহঙ্কারী, ব্রাহ্মণ জন্মিয়াই তিনি ব্রাহ্মণ নহেন । যিনি নির্ধন অথচ বিষয়সুখে নির্লিপ্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ ।



তিনিই ব্রাহ্মণ, যিনি সকল শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া নির্ভয় হইয়াছেন —  
যিনি মুক্ত ও স্বাধীন ।

যিনি বিনাদোষেও দণ্ড তিরস্কার অবমাননা অকাতরে  
সহ করেন, ক্ষমা যাঁর বল, তিতিক্ষা যাঁর সেনা, তিনিই ব্রাহ্মণ ।

যিনি পদ্মপত্রে জলবিন্দুর ন্যায়, সূচি অগ্রে সরিষার বীজের  
ন্যায় সংসারের সুখ দুঃখে নিলিপ্ত থাকেন, তিনিই ব্রাহ্মণ ।

৩৯১ । মনোবাক্ কর্মে যিনি দুষ্কৃতশূণ্য, এই তিনেতেই  
যিনি সংবৃত্ত ও শুদ্ধাচারী, তিনিই ব্রাহ্মণ ।

মনোবাক্যে কর্মে যাঁরা

না করেন পাপ আচরণ,

তাঁহারা হই তপস্বী, তপস্যা নহে

দেহের শোষণ । ( পড়ে ব্রাহ্মধর্ম )

জন্মিয়া যিনি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি না—সে ত  
ধনবান, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে ভো ভো বলিয়া বেড়ায় ( ভো-বাদী ) ;  
কিন্তু যিনি আসক্তিশীন অকিঞ্চন, তিনিই ব্রাহ্মণ ।

রাগ দ্বেষ মদমাৎসর্য্য সূচি অগ্রে সরিষার বীজের ন্যায় যাঁহা  
হইতে পতিত হইয়াছে, তিনিই ব্রাহ্মণ ।

যস্ম রাগো চ দোসো চ মানো মক্খো চ পাতিতো,

সাসপো রিব আরগ্গে তমহম্ ক্রমি ব্রাহ্মণং ।

যিনি সংসারের মোহময় দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া পরপারে  
উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যিনি ধ্যানশীল, অকপট, শুদ্ধ-ভাবী, অনাসক্ত,  
সম্বুদ্ধচিত্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ ।

আদিত্য দিবসে দীপ্তি পান, চন্দ্রমা রাত্রে প্রকাশ পান,  
ক্ষত্রিয়ের তপস্যা কবচ ধারণ, ব্রাহ্মণের তপস্যা ধ্যান, বুদ্ধ অহো-  
রাত্রি স্বকীয় তেজে প্রকাশিত ।

ব্রাহ্মণ কি, না বাহিত পাপ ; শমচর্য্যা হইতে শ্রমণ ; যিনি  
মালিন্য পরিবর্জন করেন, তিনি পরিব্রাজক ।

যিনি আপনার পূর্ব নিবাস জানেন, স্বর্গ নরক দিব্য চক্ষু  
দ্বারা দেখিতে পান, যাঁর জন্মবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, সত্ত্বগুণের  
আধার যে মুনি, তিনিই ব্রাহ্মণ ।

নির্ব্বাণ ।—

নখি রাগসমো অগ্নি, নখি দোসসমো কলি,  
নখি খন্কাদিসা দুঃখা, নখি সন্তিপরং সুখং ।  
জিঘচ্ছা পরমা রোগা, সন্তোষা পরমা দুখা,  
এতং এত্ত্বা যথাভূতং নিব্বানং পরমং সুখং ।  
আরোগা পরমা লাভা, সন্তুট্ঠি পরমং ধনং,  
বিস্‌সাস পরমা এগাতী, নিব্বানং পরমং সুখং ।  
রাগ সমান অগ্নি নাই, হিংসার ন্যায় পাপ নাই,  
শরীরের ন্যায় দুঃখ নাই, শান্তির ন্যায় সুখ নাই ।  
হিংসা পরম ব্যাধি, সংস্কার পরম দুঃখ,  
নির্ব্বাণ পরম সুখ, যিনি এই জানেন তিনি সত্য জানেন ।  
আরোগ্য পরম লাভ, সন্তোষ পরম ধন,  
বিশ্বাস পরমাত্মীয়, নির্ব্বাণই পরম সুখ ।  
“সন্তোষ সুখের মূল, ইথে নাই ভুল ।  
অসন্তোষই যত কিছু অসুখের মূল ।

অস্তু কভু নাহি জানে দুঃস্তু পিয়াস,  
সন্তোষ কেবলি এক স্ত্খের নিবাস ।  
ক্ষমাই পরম শান্তি, ধর্মই কল্যাণ মূর্ত্তিমান,  
বিছাই পরম তৃপ্তি, অহিংসাই স্ত্খের নিদান ।”

( পড়ে ব্রাহ্মধর্ম )

শরৎ-কুমুদের ন্যায় আপন হাতে স্নেহ মমতা ছিঁড়িয়া ফেল,  
শান্তি-মার্গ অনুসরণ কর; স্ত্খত ( বুদ্ধ ) নির্বারণরূপ স্ত্খগতি  
প্রদর্শন করিয়াছেন ।

যিনি দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখনাশ, দুঃখান্তকারী অষ্টাঙ্গ  
মার্গ, এই চতুরার্য্য সত্য সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করিয়া  
বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্জের শরণাপন্ন হন, তিনি ক্ষেম পদ, পরম শবণ  
লাভ করেন । এই শরণ লাভ করিয়া জীব সর্বদুঃখ হইতে  
মুক্ত হইবেন—ইহাই ধর্মপদ সার সংগ্রহ ।

এই সকল শাস্ত্র ভিন্ন অনেকানেক ভাষ্য, টীকা, গাথা,  
ইতিবৃত্ত ব্যাকরণাদি পালি ও সিংহলী ভাষায় বিরচিত হইয়াছে ।  
ভাষ্যকারের মধ্যে বুদ্ধঘোষের নাম সর্বপ্রাধান্য । ইনি বৌদ্ধদের  
সায়নাচার্য্য । বুদ্ধগয়ার ব্রাহ্মণকুলে ইঁহার জন্ম—রেবত  
নামক এক মহাস্ত্খবিরের উপদেশে ইনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন ।  
ইঁহার ঘনঘোর কণ্ঠরব বুদ্ধের অনুরূপ কল্পনায় ‘বুদ্ধঘোষ’  
ইঁহার নামকরণ হয় । এই বৌদ্ধাচার্য্য চুড়ামণি পঞ্চম খৃষ্টাব্দে  
সিংহলে গমন করত রাজা মহানামের রাজত্ব কালে অনুরাধাপুরে  
বাস করেন ( খৃঃ ৪১০—৪৩২ ), ও তথায় ত্রিপিটকের মহাভাষ্য  
( অর্থকথা ) রচনা করেন । তাঁহার প্রণীত ‘বিশুদ্ধি মার্গ’, ধর্ম-

পদ-ভাষ্য, ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক অন্যান্য অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে ।

মিলিন্দ প্রশ্ন ।—

যবনরাজ মিলিন্দ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাগসেন, ধর্ম বিষয়ে ইহাদের পরস্পর কথোপকথন । খৃষ্টাব্দের দ্বিশতাব্দী পূর্বে এই গ্রীক রাজের রাজত্বকাল । বুদ্ধঘোষের গ্রন্থে মিলিন্দ প্রশ্নের উল্লেখ আছে, অতএব ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে গণনীয় । খৃষ্টাব্দের প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থ রচনার কাল নির্দিষ্ট হইতে পারে ।

আমরা যে আকারে মিলিন্দ প্রশ্ন পাইয়াছি, তাহা মূলগ্রন্থ কিম্বা অণ্ড কোন মূলগ্রন্থের পরিবর্তিত সংস্করণ, সে বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয় ।

দ্বীপবংশ এবং মহাবংশ ।—

সিংহলের দুই প্রখ্যাত পালিগ্রন্থ । এই গ্রন্থদ্বয় খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে বিরচিত, ও ইহাদের মধ্যে সিংহলের ধারাবাহিক ইতিহাস এবং বৌদ্ধধর্মের ইতিবৃত্ত আছোপান্ত লিখিত আছে ।

দাক্ষিণাত্যের হীনযান বৌদ্ধ শাস্ত্র উত্তরদেশীয় মহাযানীদের সর্ববাংশে গ্রাহ্য নহে । তাঁহারা ত্রিপিটক মান্য করেন বটে, কিন্তু তাহার উপরে নিজস্ব অনেক ধর্ম ও দর্শনতত্ত্ব যোগ করিয়া দেন, সে সমস্ত অধিকাংশ সংস্কৃতে রচিত । চীন ও জাপান দেশীয় বৌদ্ধদের মধ্যে যে গ্রন্থত্রয় সমধিক আদরণীয় তাহা

সুখাবতী ব্যূহ—দুইভাগ ।

অমিতায়ুর্ধ্যান সূত্র ।

দুই ব্যূহের একটি 'সুখাবতী' স্বর্গবর্ণনা, অন্যটি অমিতাভের স্বর্গবর্ণনা ; স্বয়ং বুদ্ধ তাঁহার শেষবয়সে এই গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে । অমিতায়ুর্ধ্যান সূত্রে রাজা অজাতশত্রুর জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁহার প্রতি উপদেশ আছে ।

‘বজ্রচ্ছেদিকা নামক মায়াবাদ গ্রন্থখানি জাপানে বহু আদরের বস্তু, বুদ্ধের মুখ হইতে ইহার ধর্মোপদেশ উদ্গীরিত ; “সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক” প্রভৃতি অপরাপর সংস্কৃত গ্রন্থ উত্তর শাখার অন্তর্গত ।

ললিত বিস্তর ।—

ইতিপূর্বে যে সমস্ত গ্রন্থের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা ছাড়া বুদ্ধ-জীবনী সংক্রান্ত এই গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য । ইহা সংস্কৃত গদ্যপদ্য-বিরচিত, পদ্য ভাগ প্রাচীনতর বোধ হয়; আর ইহার মধ্যে কতকগুলি অধিকতর প্রাচীন পালি গাথা সন্নিবেশিত । এই গ্রন্থ তিব্বতী ও চীন ভাষায় সম্ভবতঃ একাধিকবার অনুবাদিত হইয়াছে । ফরাসী পণ্ডিত ফুকো (Foucaux) এই তিব্বতী অনুবাদের ফরাসী অনুবাদ করেন । তাঁহার মতে তিব্বতী অনুবাদের কাল ষষ্ঠ শতাব্দী । চীনদেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই গ্রন্থ ৭৬ খৃষ্টাব্দে চীনভাষায় অনুবাদিত হয় । তাহা হইলে খৃষ্টাব্দ প্রবর্তনের পূর্বেই ঐ গ্রন্থ ভারতবর্ষে প্রচারিত ছিল বলিতে হয় । ললিত বিস্তরে বুদ্ধের জন্ম হইতে ধর্মপ্রচার আরম্ভ পর্য্যন্ত জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে । গ্রন্থখানি পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক কলিকাতায় এসিয়াটিক্ সোসাইটি হইতে প্রথম প্রকাশিত হয় ।

এতদ্ভিন্ন তিব্বতী শাস্ত্র, সংখ্যা ভার ও বিস্তৃতি হিসাবে এমনি প্রকাণ্ড ন্যাপার যে, অন্যান্য দেশের সমুদায় ধর্মশাস্ত্র অতিক্রম করিয়া উঠে। কিন্তু উহার কোন গ্রন্থ মৌলিক নহে, পালি ও চীন ভাষা হইতে অনুবাদিত।

পালি ভাষা।—

ভারতবর্ষীয় ভাষাবলী সামান্যতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) আৰ্যভাষা, (২) দ্রাবিড়, (৩) অপর ভাষা। যে সকল ভাষায় ঋগ্বেদ সংহিতার মন্ত্র সমুদায় বিরচিত হয়, সেই যে বৈদিক সংস্কৃত, যাহা কিছু কিছু রূপান্তর হইয়া উত্তর কালে সাহিত্য কাব্যের ভাষা, রামায়ণ মহাভারত মনু-সংহিতা কালিদাসের ভাষা লৌকিক সংস্কৃত হইয়া দাঁড়ায়,— সেই সুপ্রাচীন আৰ্যভাষা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া পালি ও প্রাকৃত ভাষা সমুদায় উৎপন্ন হয় ; সেই সমস্ত পুনরায় ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া অধুনাতন হিন্দী বাঙ্গলা মারাঠী, গুজরাতী প্রভৃতি বিভিন্ন দেশ-ভাষায় পরিণত হইয়াছে, এ কথা প্রধান প্রধান ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এবং এতদেশীয় আচার্য্যেরাও প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সমস্ত চলিত দেশভাষার প্রসূতি প্রাচীন প্রাকৃত, ইহার ব্যাকরণ কাব্য সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থসকল আমাদের হস্তগত হইয়াছে ; এই প্রাচীন প্রাকৃত এখন আমাদের নিকট সংস্কৃতের স্থায় পণ্ডিতদের পাঠ্য ভাষা, মৃতভাষা হইয়া পড়িয়াছে। পালি এই প্রাচীন প্রাকৃতের শাখাবিশেষ। গৌতমের অভ্যুদয়

কালে পালি এবং মাগধী সম্ভবতঃ একই ভাষা ছিল । কাত্যাযনী, যিনি পালি ভাষার প্রথম ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, তিনি প্রকারান্তরে তাহাই বলিয়াছেন । এই মাগধী পরিবর্তিত হইয়া হিন্দি, বাঙ্গলা, বেহারী ও অন্যান্য উপভাষার রূপ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু পালির কোন পরিবর্তন হয় নাই । গৌতমের সময় তাঁহার ভ্রমণক্ষেত্রে সম্ভবতঃ এই ভাষা অথবা ইহার অনুরূপ কোন ভাষা প্রচলিত ছিল । বৌদ্ধশাস্ত্রের মূল গ্রন্থাবলী এই ভাষায় বিরচিত । অশোকের অনুশাসনগুলি যে ভাষায় প্রচারিত, তাহার মধ্যে পরস্পর কিছু কিছু বিভিন্নতা সত্ত্বেও মোটামুটি সে ভাষা পালি বলা যাইতে পারে । এই পালিভাষা ব্যাকরণ নিয়মে ও সৃবিস্তীর্ণ বৌদ্ধ শাস্ত্রে বদ্ধ হইয়া চলৎশক্তি-রহিত হইয়া পড়িল ও মৃতভাষার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গেল । একদিকে সংস্কৃত, অপরদিকে আধুনিক প্রাকৃত, পালি এই উভয়ের মধ্যবর্তী । বৈদিক সংস্কৃত ছাড়িয়া দিলে ইহা ভারতের প্রাচীন ভাষার মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে । সম্প্রতি এই মহানগরীতে মহাবোধি সমাজ হইতে পালি শিক্ষার উপযোগী একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইতেছে, সেই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য । কি ভাষা-তত্ত্ব, কি তত্ত্ব-বিদ্যা, কি আদি বৌদ্ধধর্মের মত ও বিশ্বাস, কি বুদ্ধের জীবনবৃত্ত ও উপদেশ, কি তৎকালবর্তী ভারতের ইতিবৃত্ত ও সামাজিক অবস্থা—ইহাদের যে কোন বিষয় বলুন, তার সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পালি ভাষা শিক্ষা



ও আয়ত্ত করা অতীব প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই । বাঙ্গলার মূল প্রস্রবন যখন মাগধী, তখন পালি আয়ত্ত করা যে আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য, তাহা বলা বাহুল্য ।

সংস্কৃতের অপভ্রংশে যে সকল প্রাকৃত উৎপন্ন হয়, তাহা আর্য্যাবর্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে ।

প্রচলিত আর্য্য দেশ-ভাষাগুলি নিম্নলিখিত রূপে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে ।

১। পশ্চিম শাখা ।

(ক) উত্তর পশ্চিম শ্রেণী

	লোক সংখ্যা
সিন্ধী	২৫,৯০,০০০
কাশ্মীরী	৪০,৯০,০০০

(খ) মধ্য পশ্চিম শ্রেণী

পঞ্জাবী	১,৭৭,২০,০০০
গুজরাটী	১,১০,৬০,০০০
রাজপুতানী	১,৩১,৫০,০০০
হিন্দি	৩,৫৮,২০,০০০

(গ) উত্তর শ্রেণী

পাহাড়ী	১১,৫০,০০০
নেপালী	৩০,২০,০০০

## প্রাচ্য শাখা

## ( চ ) মধ্য প্রাচ্য শ্রেণী

বৈশ্বারী		২,০০,০০,০০০
বিহারী	” ”	৩,০০,০০,০০০,

## ( ছ ) দক্ষিণ শ্রেণী

মারাঠী	” ”	১,৮৯,৩০,০০০
--------	-----	-------------

## ( জ ) প্রাচ্য শ্রেণী

বঙ্গলা	” ”	৪,১৩,৪০,০০০
আসামী	” ”	১৪,৪০,০০০
উড়িয়া	” ”	৯,১০,০০০

---

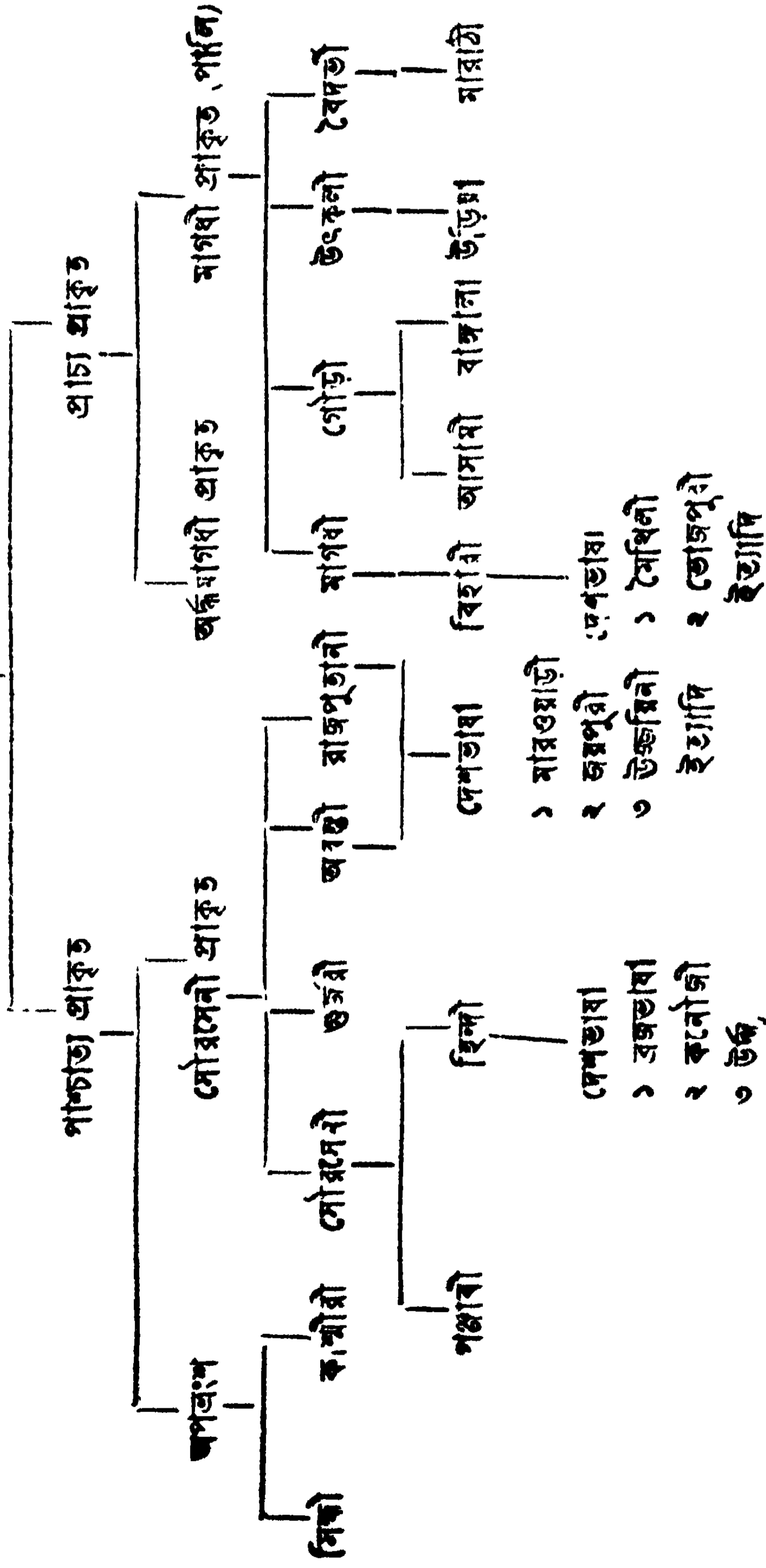
২০,৯৩,২০,০০০

এই সকল উপভাষার মূল যে প্রাকৃত, তাহাও দেশ-ভেদে বহুরূপী হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। আর্য্যাবর্তের পূর্ব খণ্ডে ( দক্ষিণ বেহারে ) পালি ও মাগধী ; পশ্চিমে অর্থাৎ গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থানে সৌরসেনী। এই দুই প্রদেশের মধ্যভাগে যে ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহা ঐ উভয় ভাষার সম্মিশ্রণে ‘অর্দ্ধ মাগধী’ নামে অভিহিত। এই আর্য্য ভাষাগুলির বহির্ভূত উদ্ভূত পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত যে ভাষা, তাহা ‘অপভ্রংশ’ বলিয়া পরিচিত। প্রাকৃতির এই চতুরঙ্গ হইতে আধুনিক গ্রাম্য ভাষা সমুদায় বিনিঃসৃত। অগ্ণ্য প্রাকৃতির সঙ্গে পালি ভাষার বিরূপ সম্বন্ধ, তাহা নিম্নলিখিত লতিকা দৃষ্টে অনায়াসে বোধগম্য হইবে।

# ভারতবর্ষীয় আৰ্য্যভাষা লতিকা।

বৈদিক সংস্কৃত।

পুরাতন প্রাকৃত



বৌদ্ধধর্ম।



## সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

### বৌদ্ধধর্মের রূপান্তর ও বিকৃতি ।

মহাযান ও হীনযান ।—

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান দুই শাখা হীনযান ও মহাযান, ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই দুই শাখার সৃষ্টি হয় নাই। রাজা কণিকের সময় হইতে এই প্রভেদের সূত্রপাত হয়। তিনি সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে পালি যেমন শাস্ত্রীয় ভাষারূপে গৃহীত হইল, তিনি সেরূপ না করিয়া সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র রচনার আদেশ করিলেন এবং সেই আদেশানুসারে তাঁহার জালন্ধর সভায় বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষ্যত্রয়, ১। সূত্র পিটকের উপদেশ, ২। বিনয়-বিভাষা-শাস্ত্র, ৩। অভিধর্ম-বিভাষা-শাস্ত্র, সংস্কৃতেই বিরচিত হয়। কণিকের প্রবর্তিত শাস্ত্র মহাযান নামে অভিহিত এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ মত হীনযান বলিয়া পরিগণিত। দক্ষিণের বৌদ্ধরা এই নামে আপনাদের পরিচয় দিতে প্রস্তুত কি না বলিতে পারি না—বৌদ্ধাচার্য্য ধর্ম্মপাল এ বিষয়ের খাঁটী খবর বলিতে পারেন। সে যাহা হউক, ‘মহাযান’ ‘হীনযান’ এই নাম-করণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে মহাযানীরা হীনযানকে

নিকৃষ্ট পন্থা বিবেচনা করেন ও তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে মনুষ্যের সদগতি-সাধন পক্ষে মহাযানই উত্তম সাধন । মহাযান মত যে সমগ্র আক্ষিবর্ত্তে প্রচারিত হয় তাহা বলা যায় না, ঐ প্রদেশেও হীনযান মতাবলম্বী লোক দেখিতে পাওয়া যায়; আবার দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধেরাও অনেকে কণিক্ষের প্রভাবে মহাযান মত গ্রহণ করেন । তবে এই কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়িয়া দিলে সামান্যতঃ বলা যাইতে পারে যে, সিংহল শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে হীনযান মত প্রচলিত; চীন, জাপান, নেপাল, তিব্বতীয় উত্তর-বাসীগণ মহাযান মতাবলম্বী । অশ্বঘোষি, বসুমিত্র, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরা মহাযান মতের প্রধান পোষক ছিলেন । কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যত দূর বুদ্ধিতে পারিয়াছি, আমার মতে নামকরণ উল্টা হইয়াছে । বুদ্ধোপদিষ্ট মূল ধর্মের আভাস যদি কোথাও থাকে তাহা পালি ধর্মশাস্ত্রে থাকাই সম্ভব, আর হীনযান মত যদি সেই শাস্ত্র-সম্মত হয় তাহা হইলে ঐ মতটাই আদিম ধর্মের অনুযায়ী হওয়া সম্ভব । উহারই নাম “মহাযান” হওয়া সঙ্গত বোধ হয় ।

ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম ।—

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পদে পদে প্রতিভাত হয়; বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষায় মহাযান শাস্ত্ররচনা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ উভয় ধর্মের সম্মিশ্রণ ও একীকরণ আরো ঘনীভূত হইয়া আসে । বৈদিক দেবতা অগ্নি ইন্দ্রাদি বৌদ্ধ দেব-রাজ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন ।

ইন্দ্র অনেক সময় মর্ত্যলোকে নামিয়া আসিয়া সাধু পুরুষদের ধর্মকার্যে সহায়তা করেন। পৌরাণিক ত্রিমূর্তি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাব্রহ্মার জন্ম বৌদ্ধ দেবমণ্ডলীর মধ্যে প্রথম হইতেই আসন নিদিষ্ট ছিল। ব্রহ্মা সহস্রপতি বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় তাঁহার পরম হিতকারী বন্ধুরূপে সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছেন। বুদ্ধের মৃত্যুকালে প্রথমেই যে বিলাপধ্বনি সমুখিত হয়, সে ব্রহ্মারই আকাশবাণী। উত্তরকালে বিষ্ণুও বৌদ্ধ দেবাসন গ্রহণ করেন। পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর একপ্রকার বিষ্ণু-অবতার। অধ্যাপক মোনিয়র উইলিয়ম্‌স্ বলেন তিনি সিংহলের বিখ্যাত নগরী ক্যাণ্ডিতে মহাবিষ্ণুর মন্দির দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বিষ্ণুদেবের এক রূপার প্রতিমা আছে। ঐ সকল স্থানে কিন্তু বিষ্ণুর অন্য অবতার কৃষ্ণের কোন নামগন্ধ নাই। শিব তাঁহার পত্নীসহ বৌদ্ধরাজ্যে অবাধে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। শিব মহাযোগী, মহাকাল, ভৈরব ও ভীমরূপে, এবং তাঁহার পত্নী পার্বতী দুর্গারূপে, উত্তরদেশীয় বৌদ্ধদের মধ্যে অর্চিত হইয়া থাকেন। নেপালে শিবের মন্দির এবং বুদ্ধের মন্দির পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে—এক দেবতার প্রীত্যর্থ রীতিমত পশুবলি চলে, অন্য দেবতা না জানি তাহা কি ভাবে দৃষ্টি করেন। দেবীগণের মধ্যে তারাদেবী প্রধান, হইয়া সাং মগধে তাঁহার মন্দির ও প্রতিমূর্তি দর্শন করেন। নেপালে পঞ্চশক্তির উপাসনা প্রচলিত—বজ্রধাত্রী, লোচনা, মামকী, পাণ্ডুরা, তারাদেবী—এই পঞ্চদেবী। দেবদেবীর সঙ্গে সঙ্গে ভূত, প্রেত, রাক্ষস, পিশাচ, নাগ, ক, কিম্বর, গন্ধর্ব্ব, গরুড়, কুম্ভাণ্ড প্রভৃতি জীবেরাও বৌদ্ধধর্ম মশিয়া গিয়াছে।



মার ।—

বৌদ্ধদের যদি কোন নিজস্ব দেবতা থাকে, তাহা 'মার' । যদিও 'মার' শব্দের বাৎপত্তি ধরিতে গেলে মৃত্যুর সঙ্গে তাহার বিশেষ যোগ, কিন্তু মৃত্যুরাজ যমের সহিত তাহার তেমন সাদৃশ্য নাই । মারকে বৌদ্ধ ময়তান অথবা পারসিদের অমঙ্গল দেবতা অহ্রিমান বলা যাইতে পারে,—কতকটা শনি বা কলির প্রতি-রূপ । ইঁহার এক নাম কামদেব । ইনি ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করিয়া কামাদি রিপুসকল উত্তেজিত করেন । বুদ্ধ পাইবার পূর্বে গৌতম যখন বোধিবৃক্ষতলে যোগাসনে আসীন ছিলেন, তখন 'মার' স্বীয় পুত্রকন্যা দলবল লইয়া কত ভয়, কতপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহার ধ্যান-ভঙ্গে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারে নাই । বুদ্ধদেব যোগাসনে অটল রহিলেন, অপর্যাগণের সহস্র মায়া পরাহত হইল । আবার বুদ্ধ প্রাপ্তির পরেও 'মার' বুদ্ধকে অশেষ কুমন্ত্রণা দিয়া ধর্ম প্রচারের শুভ সংকল্প হইতে ফিরাইবার কত চেষ্টা পায়, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া মধুর স্বরে ফুসলাইতে থাকে "ভগবন্ ! আপনি অনেক সাধ্য সাধনায় এই দিব্যজ্ঞান উপার্জন করিয়াছেন, তাহা লোকের মধ্যে প্রচারে কি ফল ? সাংসারী যারা, তারা সকলেই বিষয়মোহে মুগ্ধ, কেহই আপনার কথায় কর্ণপাত করিবে না, তাহার মর্মে কিছুই বুঝিতে পারিবে না । আপনি কিন্তু আপন মনে একা নির্বাণানন্দ উপভোগ করুন ।" বুদ্ধে 'চিন্তা বিচলিত দেখিয়া ব্রহ্মা

সহাস্পতি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিলেন ও বুদ্ধের সম্মুখে  
আবিভূত হইয়া নিবেদন করিলেন :—

দেখ গো মগধ রাজ্য হ'ল ছারখার,  
দুরাচার, অনাচার, অধর্মের জয় ;  
প্রভু হে তার হে ভবে, খোল স্বর্গদ্বার,  
শুনাও তোমার ধর্ম, বিনাশি সংশয় ।  
দেখাও হে পুণ্যপথ, পবিত্র, সরল ;  
অভ্রভেদী গিরি লজ্জি-দাঁড়ায় যে জন  
শৈলশৃঙ্গে, দৃষ্টি তার স্থির, অচপল ।  
সত্যের শিখরে তুমি উঠেছ যখন,  
কৃপাদৃষ্টি কর, প্রভু, মানবের পরে,  
রোগ শোক করা মৃত্যু গ্রাসে চরাচর ।  
জয়হস্ত তুলি, বীর, চল পথ ধরে',  
জাগাও ভারতে, মর্ত্যে গৌরবে বিচর ।  
প্রচারো সত্যের যশ দুন্দুভি-নিঃস্বনে,  
পরিভ্রাণ কর সবে সুর-নরগণে ।

বুদ্ধদেব ব্রহ্মার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া ধর্ম প্রচারে বাহির  
হইলেন । 'মার' আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল ।

'মারে'র প্রলোভন মন্ত্রতন্ত্র এড়াইতে হইলে কচ্ছপের ন্যায়  
সর্বদা সতর্ক থাকা আবশ্যিক । বুদ্ধদেব গল্পচ্ছলে এই বিষয়ের  
উপদেশ দিতেন । "একটা কচ্ছপ সন্ধ্যার সময় পানার্থে নদীতীরে  
গমন করে । সেই একই সময়ে একটা শৃগাল তাহার আহার

অশ্বেষেণে যায় । শৃগালকে দেখিয়া কচ্ছপ আপন খোলার ভিতরে লুকায়িত থাকিয়া নির্ভয়ে জলে সম্ভরণ করিতে লাগিল । কখন সে তাহার কোষের মধ্য হইতে গ্রীবা বাহির করিলে, শৃগাল তাহা প্রতীক্ষা করিয়া রহিল । কিন্তু কচ্ছপ কিছুতেই তাহার কোটরের বাহিরে মুখ বাড়ায় না, শৃগাল অনেকক্ষণ বসিয়া অবশেষে শিকার ছাড়িয়া চলিয়া গেল । হে ভিক্ষুগণ ! ‘মার’ এইরূপ তোমাদের ছিদ্রাশ্বেষেণে ফিরিতেছে—তোমাদের চক্ষুদ্বার, কর্ণদ্বার, নাসিকা, গ্রিহ্বা, দেহ-মনোদ্বার কখন কোন্ দরজা খোলা পায় সেই অবসর খুজিতেছে, সন্ধি পাইলেই প্রবেশ করিবে । অতএব সাবধান ! ইন্দ্রিয়দ্বারের উপর নিয়ত প্রহরী নিযুক্ত রাখ, তাহা হইলে পাপাত্মা ‘মার’ বিফল-প্রযত্ন হইয়া তোমাদের ছাড়িয়া দূরে যাইবে, শৃগাল যেমন কচ্ছপ হইতে দূরে যাইতে বাধ্য হইয়াছিল ।”

বুদ্ধতত্ত্ব ।—

আদিম বৌদ্ধধর্মের নিরীশ্বর কঠোর ধর্মনীতি বৌদ্ধ সমাজে অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে নাই । সে ধর্ম যে যে দেশে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সেই সেই দেশের প্রচলিত ধর্ম ও রীতি নীতি আচার ব্যবহারের সহিত সন্মিশ্রণে নব নব রূপ ধারণ করিয়াছে । সেই আদিধর্ম কালসহকারে পরিবর্তিত হইয়া কোথায় কোন্ মূর্তি ধারণ করিয়াছে,—নেপালে শৈব শাক্ত তান্ত্রিক ধর্মে মিশিয়া একরূপ, তিব্বতে বাহু ভূত প্রেতে বিশ্বাস-

মিশ্রিত অন্তরূপ, এক ঐতিহাসিক বুদ্ধ হইতে অগণ্য কাল্পনিক বুদ্ধের সৃষ্টিপ্রণালীই বা কিরূপ—সে এক অপূর্ব কথা । তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে গেলে এক স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয়, আর ঐ গ্রন্থের বিষয় সংগ্রহও সামান্য পরিশ্রম ও গবেষণার কার্য্য নহে । মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যেমন স্বয়ং নেপালে অবস্থিতি করিয়া তথাকার পুরাতন পুঁথি অন্বেষণ ও বৌদ্ধধর্মের রহস্য অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার মত শ্রম, অধ্যবসায় ও স্থানীয় গবেষণা ভিন্ন ওরূপ কার্য্যে ফললাভ করা অসম্ভব । সে যাহা হউক, এই স্থলে বুদ্ধতত্ত্ব সম্বন্ধীয় স্কুল স্কুল গুটিকতক কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে বুদ্ধ-কাহিনী সম্বন্ধে একটি কৌতুকজনক বিষয় বলিবার আছে, তাহা বলিয়া রাখি । সেটি এই যে, খৃষ্টীয় সেন্ট্ মণ্ডলীর মধ্যেও বুদ্ধদেবের আসন নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

সেন্ট জোসাফৎ ।—

জোসাফৎ নামে একজন গ্রীক গ্রন্থকার 'বালাম ও জোসাফৎ' বলিয়া গ্রীক ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন । সে উপাখ্যানটী বুদ্ধচরিতের অবিকল চিত্র । রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানেরা ঐ জোসাফৎকে আপনাদের সেন্ট্ রূপে আত্মসাৎ করিয়া লন ; এমন কি, ৩০শে নবেম্বর তাঁহার মৃত্যুর দিন বলিয়া পালিত হইয়া থাকে । তাঁহার এই উপাখ্যান নানা

ভাষায় অনুবাদিত হইয়া এক সময়ে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা মধ্যও মহাসমাদরে পরিগৃহীত হয় । পরে আনা গেল এই জোসাফৎ বোধিসত্ত্বের নামান্তর,—ইনি আর কেহ নন, স্বয়ং বুদ্ধদেব । উল্লিখিত গ্রীক গ্রন্থকারের পিতা খালিফ আলমান-সুরের একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন, সুতরাং তিনি অষ্টম খৃষ্টাব্দের লোক । গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, আমি ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগত লোকদিগের মুখে এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছি । পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন যে, জাতক-ভাষ্য বা ললিতবিস্তর হইতে উহার অনেক কথা রচিত হওয়া সম্ভব । “অতএব অবনীমণ্ডলে বুদ্ধের মহিমা যেমন ব্যক্তভাবে, সেইরূপ অব্যক্ত ভাবেও পরিব্যাপ্ত হইয়া যায় ।”

বুদ্ধতত্ত্ব—হীনযান মত ।—

হীনযান ও মহাযান, এই দুই শাখার মধ্যে বুদ্ধতত্ত্ব বিষয়ে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয় । বিষয়টির স্পষ্টীকরণ জন্য বৌদ্ধধর্মের গোড়ার কথা হইতে আরম্ভ করা আবশ্যিক ।

বৌদ্ধধর্মের মত ও বিশ্বাস আলোচনা করিবার সময় বলা হইয়াছে যে, ঐ ধর্মে ভজন পূজনের কোন ব্যবস্থা নাই । বৌদ্ধধর্ম চা'ন সাধন । বৌদ্ধধর্মের উপদেশ এই যে, আত্ম-প্রভাব দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া অস্তুরকরণকে কাম, ক্রোধ, ঘেঘহিংসা মদমাৎসর্য হইতে বিনির্মুক্ত কর, তাহা হইলেই স্বর্গাৎ স্বর্গে আরোহণ করত যাত্রার চরম সীমা যে নির্ব্বাণ, সেখানে গিয়া পৌঁছিতে পারিবে । নির্ব্বাণে উঠিবার চারি

ধাপ ও পথের বিঘ্নকারী দশ 'সংযোজন', বন্ধন বা শৃঙ্খল\* আছে । এক এক ধাপে উঠিতে উঠিতে এই শৃঙ্খলগুলি ক্রিয়ৎ পরিমাণে খসিয়া যায় । যিনি প্রথম ধাপে উঠিয়াছেন, তিনি 'সোতাপন্নো' ( স্রোত-আপন্ন ), মনুষ্যের নীচে পশুাদি যোনিতে তাঁহার জন্ম হয় না । দ্বিতীয় ধাপে কতকগুলি শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যায়, যিনি সেই ধাপে চড়িয়াছেন তিনি আরো উন্নত, তথাপি সংসার-বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই ; তাঁহাকে আর একবার ফিরিতে হইবে, তিনি সক্রৎ আগামী । তাহার উর্দ্ধে উঠিতে পারিলে কাম ক্রোধ বিচিকিৎসা প্রভৃতি পঞ্চ বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ হয়, তখন সাধক 'অনাগামী' পদ লাভ করেন, তাঁহার এই মর্ত্যালোকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না । এই হচ্ছে তৃতীয় ধাপ । যিনি চতুর্থ সোপানে

\* দশ সংযোজন ( শৃঙ্খল ) :—

- ১ । সকার দৃষ্টি, অহমিকা
- ২ । বিচিকিৎসা, সংশয়
- ৩ । শীলব্রত, কর্মকাণ্ডে আস্থা
- ৪ । কাম ।
- ৫ । প্রতিঘ, ক্রোধ
- ৬ । রূপরাগ, বিষয়কাম
- ৭ । অরূপরাগ, স্বর্গ
- ৮ । মান, অতি
- ৯ । ঔদ্ধত্য
- ১০ ।

আরোহণ করেন, তাঁহার সমুদায় বন্ধন ছিন্ন হয়—জন্মান্তর-  
স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও সিদ্ধিলাভ হয়, তখন তিনি জীবমুক্ত  
অর্হৎ ।

প্রত্যেক বুদ্ধ ।—

অর্হতেরা হাজার হোক অপূর্ণ জীব । আধ্যাত্মিক জগতে  
ইহাঁদের নূতন পাখা উঠিয়াছে, ইহাঁরা সবেমাত্র উড়িতে  
শিখিয়াছেন । ইহাঁদের লক্ষ্যস্থান, গম্যস্থান এখনো বহু দূর ।  
বুদ্ধ এবং ইহাঁদের মধ্যে ব্যবধান বিস্তর । যে মহাত্মারা ইহাঁদের  
অপেক্ষাও জ্ঞানধর্মের উচ্চতর পদবীতে আরুঢ় হইয়াছেন,  
তাঁহাদের নাম প্রত্যেক বুদ্ধ, অর্থাৎ তাঁহারা নিজ নিজ সাধনা ও  
পুণ্যগুণে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ হইয়াছেন, অর্থাৎ লোক-  
মাঝে সেই জ্ঞান বিতরণে অক্ষম । তাঁহারা প্রত্যেকে আপনার  
মহিমাতেই আপনি বিরাজ করেন । মহাবুদ্ধের সহিত প্রত্যেক  
বুদ্ধের তুলনা হয় না । মহাবুদ্ধের আবির্ভাব কালে পৃথিবীতে  
তাঁহাদের আবির্ভাব হয় না । আর তাঁহারা তথাগত, সিদ্ধার্থ,  
ঈ প্রভৃতি বুদ্ধ-উপাধি ধারণের যোগ্য নহেন ।

সত্ত্ব ।—

বুদ্ধের উপরের শ্রেণীতে বোধিসত্ত্বকে স্থাপন  
করা হয় । তিনি অব্যক্ত বুদ্ধ । বোধিসত্ত্বের  
বীজ নিহিত আছে, কালক্রমে সে  
প্রকটিত হয় । বুদ্ধেরা পূর্বজন্মে  
যে বুদ্ধ সত্যধর্ম পুনঃ স্থাপন  
করেন, সেই বুদ্ধরূপে বিরাজমান ।



বুদ্ধদেব ।—

এই সপ্ততল গৃহের সর্বোচ্চ চূড়ায় স্বয়ং বুদ্ধদেব আসীন । ইনিই সজ্জ-স্থাপয়িতা সম্যক্-সম্মুখ সাক্ষাৎ ভগবান । ইনি এবং ইহার সমতুল্য আর আর বুদ্ধ নষ্টধর্ম উদ্ধারের নিমিত্ত, লোকপরিত্রাণের নিমিত্ত, স্মরণের কল্যাণ উদ্দেশে যুগে যুগে আবির্ভূত হইলেন ।

হীনযান মতে গৌতম বুদ্ধের পূর্বের সর্বশুদ্ধ চতুর্বিংশতি বুদ্ধ উদয় হইয়াছেন,—বর্তমান কল্পে তার মধ্যে চার জন । গৌতম শেষ বুদ্ধ ; ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি ও কাশ্যপ, এই তিন বুদ্ধ তাঁহার অগ্রবর্তী । করুণা ও মৈত্রীপুণের আধার যে মৈত্রেয়, তিনি ভবিষ্যতে বুদ্ধরূপে উদয় হইবেন, এখনো তার কাল-বিলম্ব আছে । ৫০০০ বৎসর পরে যখন লোকেরা নীতিভ্রষ্ট হইবে, গৌতমের ধর্ম নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন সেই বিশ্ববিজয়ী মহাবীর জগৎ উদ্ধারের নিমিত্ত অভূদিত হইবেন । তাঁহার সে দিগ্বিজয় সৈন্য সামন্ত অস্ত্রবলে নয়, ধর্ম ও প্রেম বলে । মৈত্রেয়ী এইরূপে বোধিসত্ত্বরূপে তুষিত স্বর্গে বাস করিতেছেন । সূত্র পিটকের অন্তর্গত 'বুদ্ধ বংশে' গৌতম ও তাঁহার পূর্ববর্তী ২৪ বুদ্ধের জীবনবৃত্ত বর্ণিত আছে, এবং জাতক-ভাষ্যে তাঁহাদের প্রত্যেকের আরো বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । হীনযান শাস্ত্র এইখানেই থামিয়া গিয়াছে । পূর্ব পূর্ব কল্পের একবিংশতি বুদ্ধ, বর্তমান ভদ্র কল্পের চারি বুদ্ধ, এবং বোধিসত্ত্ব লইয়াই হীনযানীরা সন্তুষ্ট । অর্হৎ তাঁহাদের আদর্শ-সাধু, সাধুদের আরো উচ্চ স্তরে উঠিতে তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা নাই ।

বুদ্ধতত্ত্ব । মহাযান মত—

মহাযানগ্রন্থে বৌদ্ধদের বুদ্ধ-কল্পনার আরো বিস্তৃত বিচিত্র গতি ! হীনযানের সহিত ইহাদের বীজমন্ত্রে অনৈক্য নাই । ইহারাও বলেন মনুষ্য জ্ঞানধর্ম্যে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিয়া, ভিক্ষু হইতে অর্হৎ, অর্হৎ হইতে বোধিসত্ত্ব হইতে পারেন । কিন্তু যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে জল দাঁড়ায় কোথায় ? দু একটা বোধিসত্ত্ব গড়িয়া কেনই বা স্থির থাকিবে ? অনেকানেক ভক্ত সিদ্ধি লাভ করিয়া অর্হৎ হইয়াছেন—অনেকানেক অর্হৎ বোধিসত্ত্ব পদে উন্নত হইয়াছেন, তাঁহারা কি আমাদের শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র নহেন ? এই মতের অব্যর্থ পরিণাম নর-দেবতা পূজা—এবং এই পূজায় মহাযানীরা সিদ্ধহস্ত । এইরূপে অসংখ্য অসংখ্য বোধিসত্ত্ব মহাযানীদের আরাধ্য দেবতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন । বুদ্ধের প্রথম দুই শিষ্য সারীপুত্র ও মুদগল্লায়ন ; কাশ্যপ আনন্দ উপালী প্রভৃতি সজ্জের পিতামহগণ ; গৌতম ও রাহুল ; মহাযানীদের প্রধান আচার্য্য নাগার্জ্জুন, আচার্য্য অশ্বঘোষ—এইরূপ কত কত সাধু সজ্জনকে তাঁহারা বোধিসত্ত্ব পদে তুলিয়া পূজা করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই । শুধু তা নয়—এদিকে যেমন মানুষী বোধিসত্ত্ব, তেমনি আবার গুণাত্মক ধ্যানাত্মক নানা ধরনের কাল্পনিক বোধিসত্ত্ব নিশ্চিত হইয়াছে । গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণ আর মৈত্রেয়ী বুদ্ধের আবির্ভাব, এই দুয়ের মধ্যকালে মনুষ্যের ত আরাধ্য দেবতা চাই, বৌদ্ধসজ্জের রক্ষাকর্তা আবশ্যিক,—বোধিসত্ত্বেরা এই অভাব পূর্ণ করিতেছেন । আর এক লাভ এই যে, বোধিসত্ত্ব পদলাভের আকাঙ্ক্ষায় মনুষ্যের মনে

ধর্ম্যানুষ্ঠানে অধিকতর উৎসাহ সঞ্চার হইতেছে । বোধিসত্ত্বের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে । ইহারা তুষিত স্বর্গে দিব্য আরামে কাল-হরণ করিতেছেন । পরিনির্বাণে নিবিয়া যাওয়া অপেক্ষা ইহাদের স্বর্গকামনা বোধহয় যেন বলবন্তর, স্তুরাং ইহারা নির্বাণ-পথ খুঁজিয়া বেড়াইবার কষ্ট ভোগ অপেক্ষা, যেমন সুখে আছেন তেমনি থাকিতেই ভালবাসেন ।

বোধিসত্ত্বের বেলায় মহাযানীরা যেমন কল্পনার লাগাম ছাড়িয়া দিয়াছেন, বুদ্ধ বিষয়েও সেইরূপ । হীনযানীরা বুদ্ধসংখ্যা সর্বশুদ্ধ ২৫ জন নির্দিষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কেন ? তোমরা স্বীকার করিতেছ লোকপরিত্রাণার্থ যুগে যুগে বুদ্ধোদয় হইয়া থাকে । তবে ২৫ কেন,—কত কত লোকে, কত যুগে, কত শত বুদ্ধের অভ্যুদয় হইয়াছে, কে বলিতে পারে ? কেন না,

“কালোহয়ং নিরবধিবিপুলা চ পৃথ্বী”  
কালের নাহিক সীমা, বিপুলা ধরণী ।

মহাযান মতানুসারে সমুদায়ে কত বুদ্ধ, স্থির করা কঠিন । হজ্জসন সাহেব ললিতবিস্তর ও অপরাপর গ্রন্থ হইতে ১৪৩ জন তথাগতের নাম সংগ্রহ করিয়াছেন ।

শুধু বুদ্ধ-সংখ্যা নয়, ক্রমে বুদ্ধস্বরূপেরও অশেষ পরিবর্তন ঘটিয়াছে । পরিবর্তনের প্রণালী আমার যাহা সঙ্গত মনে ? তাহা এই—

বুদ্ধদেব আপনাতে কখনই ঐশীশক্তি আরোপ করেন এমন কি, শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ তাঁহাকে ঈশ্বরবিষয়ক

জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নিরন্তর থাকাই শ্রেয়বোধে মৌনাবলম্বন করিয়া নিস্তব্ধ থাকিতেন । তিনি তাঁহার ধর্ম এবং তাঁহার সজ্জ, মৃত্যুর সময় এই দুইকে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ রাখিয়া গেলেন । কিন্তু পৃথিবী হইতে যেমনি তিনি অপমৃত হইলেন, তাহার কিয়ৎ পরে বৌদ্ধেরা তাঁহাকেই ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করিল—মমুষ্য-বুদ্ধকে দেবতা-বুদ্ধ গড়িয়া তুলিল । তাঁহার জীবনের সকল ঘটনা,—পূর্বজন্মকাহিনী, স্বর্গ হইতে অবতরণ, গর্ভে বাস, জন্ম, শৈশবে বিদ্যাভ্যাস, যৌবনের লীলাখেলা, মহাভিনিক্ষমণ, তপশ্চর্যা, মারের সহিত সংগ্রাম, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, ধর্মপ্রচার, নির্বাণ,—ইহার প্রত্যেকটি ইন্দ্রজালে সংগঠিত হইল । এই গেল প্রথমাবস্থা । পরে ভাবিবুদ্ধ যে মৈত্রেয়, তাঁহার পূজাও প্রবর্তিত হইল । বুদ্ধদেব ত পরিনির্বাণগত হইয়াছেন, যাইবার সময় তিনি মৈত্রেয়কেই আপন উত্তরাধিকারী নির্দেশ করিয়া যান । মৈত্রেয় এখন জাগ্রত জীবন্ত দেবতা, তাঁহার প্রসাদলাভ ভক্তের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় । তিনি করুণার সাগর, সৌন্দর্যের সার, প্রিয়দর্শী, মধুরভাষী ; তাঁহার তুষিত স্বর্গে গিয়া ভক্তেরা তাঁহার স্বরূপ দর্শন, মধুর বাণী শ্রবণ, তাঁহার সহবাসজনিত আনন্দ সম্ভোগ, এই জগৎ লালায়িত ; উত্তর দক্ষিণ ঊভয় সম্প্রদায়ী বৌদ্ধেরাই তাঁহাকে মানিয়া চলিতেছে ।

নকানেক সিংহল বৌদ্ধমন্দিরে বুদ্ধ ও মৈত্রেয়ের মূর্তি পাশা-

অবস্থাপিত । ছয়েন সাং ও তাঁহার পূর্বাপর অন্যান্য

মৃত্যুশয্যায় মৈত্রেয়ের তুষিত স্বর্গলাভের জগৎ প্রার্থনা

## বৌদ্ধধর্ম।

অতঃপর আমরা আর এক চিত্র দেখিতে পাই,—এক হইতে তিনে গিয়া পড়ি, মৈত্রেয় ছাড়া তিন বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব দেখি। তাঁহাদের নাম—

- ১। মঞ্জুশ্রী অথবা বাগীশ্বর
- ২। পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বর
- ৩। বজ্রপাণি কিনা শক্তিরূপী মহেশ্বর

এই জ্ঞান শক্তি মঙ্গলের আধার বৌদ্ধ ত্রিমূর্তি কালক্রমে কল্পিত হইল। বৌদ্ধধর্মের আদি যুগে ইহাদের নাম শুনা যায় না, ললিতবিস্তর প্রভৃতি উত্তরশাখার প্রাচীন গ্রন্থেও ইহাদের নাম নাই, যদিও সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক ও আর কতকগুলি গ্রন্থে ইহাদের কথা পাওয়া যায়, আর ফাহিয়ানের তীর্থযাত্রার সময় এই ত্রিদেবতার অর্চনা কোন কোন বৌদ্ধক্ষেত্রে প্রচলিত ছিল, তাহাও দেখা যায়। তিনের অঙ্কে কি এক মোহিনীশক্তি আছে, তাহার আদর সর্বত্রই; বিশেষতঃ আমাদের দেশে ত্রয়ীবিद्या, ত্রিগুণ, ত্রিবর্গ, ত্রিলোক, ত্রিকাল, ত্রিমূর্তি—অনেক জিনিসেই ত্রিই আসিয়া পড়ে; এমন কি, পরব্রহ্ম যিনি তিনিও সৎ-চিত্ত-আনন্দ ত্রিগুণাত্মক। বৌদ্ধদের মধ্যেও এই তিনের গৌরব রক্ষিত হইয়াছে। প্রথম, বুদ্ধ ধর্ম সংজ্ঞ ত্রিরত্ন— পরে মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর, বজ্রপাণি ত্রিদেব। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই তিন দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবেরই রূপান্তর। মঞ্জুশ্রী হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্ম, বাগীশ্বর বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—এই ত গেল ব্রহ্মা-সরস্বতী। অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি বিষ্ণু, তাঁহাতে বিষ্ণুর পালনীশক্তি

## বৌদ্ধধর্ম ।

আরোপিত । বজ্রপাণি বজ্রধর ইন্দ্র অথবা শূলপাণি মহেশ্বর, সর্বশক্তির মুলাধার । বোধিসত্ত্ব-শ্রেণীর মধ্যে অবলোকিতেশ্বরের বিশেষ মাহাত্ম্য । তিনি করুণার্ণব, লোকপাল, সকলের শরণ্য সম্ভজনীয় দেবতা রূপে বর্ণিত । ফাহিয়ান, ছুয়েন সাংএর ভ্রমণ বৃত্তান্তে বৌদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার পূজার বহুল প্রচার লক্ষিত হয় । তাঁহারা নিজেও যে ঐ দেবতার পরম ভক্ত ছিলেন, তাহারও অনেক নিদর্শন পাওয়া যায় । ফাহিয়ান বলেন সমুদ্রে একবার ঝড় উঠিয়া তাঁহার জাহাজ ডুবিবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন তিনি অবলোকিতেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া রক্ষা পাইলেন । চীন ও জাপানে অবলোকিতেশ্বরের করুণাময়ী নারীপ্রকৃতি কান্ ইন এবং কানন্ নামে অর্চিত হয় ।

ইহার উত্তরকালে একপ্রকার ধ্যানীবুদ্ধের সৃষ্টি হইল । ধ্যানীবুদ্ধ মনুষ্যবুদ্ধের অশরীরী প্রকৃতি, তাঁহারা অরূপ-লোকে বাস করেন । পঞ্চ অরূপ-লোকের অধিষ্ঠাতা পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ । তাঁহারা প্রত্যেকে ধ্যানপ্রভাবে আত্ম-স্বরূপ হইতে এক একটা বোধিসত্ত্ব উৎসৃষ্ট করেন, আবার প্রত্যেক বোধিসত্ত্ব পর্যায়ক্রমে রূপলোক সৃষ্টি করিয়া থাকেন । এইরূপে চতুর্থ বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অধিকার যাইতেছে,—আমাদের এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা তিনিই ।

এই বহুদেবতার পূজায় পরিতৃপ্ত না হইয়া বৌদ্ধেরা ক্রমে এক আদিদেবে গিয়া পৌঁছিলেন, ইনি নিত্য, নিরাকার, ন্যায় ও করুণার আধার, স্তানময় আদি বুদ্ধ—ইনিই পরব্রহ্ম । নেপালী বৌদ্ধদের মধ্যে দশম শতাব্দে এই আদি বুদ্ধের প্রতিষ্ঠা হয় ।



আদি বুদ্ধ ইচ্ছানুসারে আত্মস্বরূপ হইতে অশ্রু পাঁচটি ধ্যানীবুদ্ধ উৎপন্ন করেন । তাঁহারা আবার পাঁচটি বোধিসত্ত্বের জন্মদাতা । এই পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ, পঞ্চ বোধিসত্ত্ব এবং গৌতম, মৈত্রেয় প্রভৃতি পঞ্চ মানুষী বুদ্ধসম্বলিত এক অপূর্ব ত্রিপঞ্চক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

ধ্যানীবুদ্ধ	বোধিসত্ত্ব	মানুষীবুদ্ধ
১ বিরোচন	১ সামন্তভদ্র	১ ক্রকুচ্ছন্দ
২ অক্ষোভ	২ বজ্রপাণি	২ কনকমুনি
৩ রত্নসম্ভব	৩ রত্নপাণি	৩ কাশ্যপ
৪ অমিতাভ	৪ অবলোকিতেশ্বর	৪ গৌতম
৫ অমোঘ সিদ্ধি	৫ বিশ্বপাণি	৫ মৈত্রেয়

দেখিবেন ইহাদের মধ্যে প্রকৃত ঐতিহাসিক বুদ্ধ একমাত্র গৌতম, আর সকলেই মন-গড়া কাল্পনিক বুদ্ধ । এই প্রত্যেক পঞ্চকের চতুর্থ দেবতাই বাছিয়া লইবার যোগ্য । বাছিয়া বাছিয়া যে তিন দেবতা বৌদ্ধদের বিশেষ পূজার্ত হইয়াছেন, তাঁহারা হচ্ছেন ১ । অমিতাভ, ২ । অবলোকিতেশ্বর, ৩ । গৌতম । গোড়ার অপরিমিত জ্যোতিঃ অমিতাভ, মধ্যে তাঁহার অধ্যাক্ষ-সুত, শেষে তাঁহার ছায়াময়ী প্রকৃতি । ধ্যানী বুদ্ধের মধ্যে কি জানি কেন মঞ্জুশ্রী স্থান পায় নাই । আপাততঃ ধরিয়। নেওয়া যাইতে পারে বৌদ্ধজগতের কোন কোন ভাগে অমিতাভই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা । মহাযান শাস্ত্র তাঁহার 'সুখাবতী' স্বর্গ বর্ণনায় পরিপূর্ণ । সে স্বর্গ মহম্মদী স্বর্গের স্তার ইন্দ্রিয়-সুখ



ভোগের স্থান নয়, তাহা ধ্যানস্থ মুনিঋষির আশ্রম তুল্য। সেখানে 'হরী' অপ্সরাগণ তাহাদের মায়াজাল বিস্তার করে না, সেই অরূপ-লোকে জ্যোতির্শ্বর্য ধ্যানী বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব-মণ্ডলে পরিবৃত হইয়া ধ্যানানন্দ উপভোগ করিতেছেন।

সহজ সত্য ছাড়িয়া কল্পনায় ঈশ্বর গড়িতে গেলে মনুষ্য-কল্পনা যে, কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করা যায়।

তান্ত্রিক মত প্রচার।—

মহাযান মতের উৎপত্তি ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরখণ্ডে ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধধর্মের সম্মিশ্রণ আরম্ভ হয়, এই যে বলা হইল— নেপাল তাহার মুখ্য দৃষ্টান্তস্থল। বৌদ্ধ ও হিন্দুদের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে সেদেশে বৌদ্ধধর্মের গণ্ডীর ভিতরে তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রবেশ লাভ করিয়াছে। হিন্দুদিগের যে ধর্ম প্রণালী সর্বাপেক্ষা আধুনিক, নেপালী বৌদ্ধেরা সেই তান্ত্রিক পদ্ধতি নিজ ধর্ম মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইঁহারা শিব শক্তি গণেশ, কুমার ভৈরব হনুমান, রুদ্র মহারুদ্র, মহাকাল মহাকালী, অজিতা অপরিজিতা, উমা জয়া চণ্ডী, খড়্গহস্তা, ত্রিদশেশ্বরী, ইন্দ্রী কপালিনী কন্বোজিনী, ঘোরী ঘোররূপ মহারূপা, মালিনী কপালমালা, খট্টাঙ্গা পরশুহস্তা বজ্রহস্তা, মাতৃকা যোগিনী পঞ্চ-ডাকিনী, বজ্র গন্ধর্ব্ব গৃহদেবতা, ভূত পিশাচ দৈত্য প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত দেবদেবীগণকে স্ব-সম্প্রদায়ে স্থান দান করিয়াছেন। কেবল তন্ত্রোক্ত দেবাদি গ্রহণ করিয়া নিরস্ত হন নাই, তন্ত্র শাস্ত্রের মন্ত্রাদি

এবং সাক্ষেতিক ঐকজ্জৌকও গ্রহণ করিয়াছেন। ক্রিয়াস্থলে তন্ত্রোক্ত যন্ত্রমণ্ডল অঙ্কিত করিবার রীতি আছে। হিন্দু ক্রিয়াতে হিন্দুদেবতারই মণ্ডল করা হয়। বৌদ্ধ ক্রিয়াতে বুদ্ধমণ্ডলও অঙ্কিত হইয়া থাকে। নেপালী বৌদ্ধেরা শুরু কৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে অষ্টমী ব্রত নামে একটি ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। প্রথমে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, দিকপাল প্রভৃতির পূজার পর উল্লিখিত দেবদেবীর আহ্বান ও অর্চনা হইয়া থাকে। ( ভারত-বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত । )

নেপালের এই তান্ত্রিকমতের আদিগুরু পেশওয়ার-নিবাসী অসঙ্গ নামক একজন সন্ন্যাসী। ইনি ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া “যোগাচার ভূমি শাস্ত্র” ও যোগ-দর্শন সংক্রান্ত বহু গ্রন্থ লিখিয়া উক্ত দর্শনের বহুল প্রচার করেন। ছয়েন সাং তাঁহার মঠের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া যান। তিনি শৈব দেবদেবী, ভূত, পিশাচ, বৌদ্ধধর্ম্মে মিলাইয়া সেই পার্বত্য অধিবাসীদের উপাদেয় এক অপূর্ব খিচুড়ী প্রস্তুত করেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রভাবে নেপালীদের মধ্যে বুদ্ধদেবের সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত শৈব ও শাক্ত দেবদেবীর অর্চনা আরম্ভ হয়, এবং তাঁহারা বুদ্ধদেবের সরল নীতিমার্গ ছাড়িয়া অলৌকিক সিদ্ধিলাভ মানসে, ধারণী মণ্ডল প্রভৃতি তান্ত্রিক অনুষ্ঠান অবলম্বন করেন। তাঁহাদের মঠ মন্দিরে এই সকল তান্ত্রিক দেবদেবীর প্রতিমূর্তি দেখা যায়।

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম ।—

নেপাল ভোট সিকিম ঐ সকল প্রদেশের বৌদ্ধধর্ম্ম যেমন পৌরাণিক তান্ত্রিক সংস্পর্শে রূপান্তরিত হইয়াছে, তিব্বতের

ধর্মও অশান্তি কারণে অশেষ কুসংস্কার জালে আচ্ছন্ন হইয়াছে। জপমালায় মন্ত্র উচ্চারণ তাঁহারা ধর্মসাধনের এক প্রধান অঙ্গ বিবেচনা করেন; শব্দসংখ্যার উপর পুণ্যের ফলাফল নির্ভর করে, যতবার আবৃত্তি ততই বেশী পুণ্য। আরাধনার সময় যেমন সমস্বরে শ্লোকাবৃত্তির নিয়ম আছে, তেমনি আবার ভিন্ন ভিন্ন বচন অনেকে মিলিয়া একত্রে পাঠ করিয়া থাকেন—অল্প সময়ের মধ্যে যত অধিক শব্দ উচ্চারিত হয় ততই ভাল। এই সকল বৌদ্ধের প্রার্থনা-মন্ত্র হচ্ছে—

\* ওঁ মণি পদ্মে হুঁ ।

এ প্রার্থনা-অঙ্কিত চক্রধ্বজাদি যেখানে যাও চারিদিকে ছড়াছড়ি। “পদ্মে মণি” এই দুই শব্দের যে কি নিগূঢ় অর্থ তাঁহারা জানেন, এবং তাঁহাদের বিশ্বাস যে এই প্রার্থনায় দেবতার প্রসন্নতা লাভ ও মহাপুণ্য উপার্জন হয়। এই উদ্দেশে তাঁহারা অগণ্য অগণ্য প্রার্থনা-চক্র নগরে নগরে গ্রামে পথে ঘাটে যেখানে সেখানে স্থাপন করেন, পথযাত্রীরা তাহা একবার ঘুরাইয়া প্রার্থনার ফললাভ করেন। কল ফিরাইয়া প্রার্থনা করা, তিব্বতীরা এই এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই চক্র ঘোরানো লইয়া অনেক সময়ে দুই প্রতিযোগী ভক্তদলের

---

\* হুংপদ্মে ধর্মের মণি। কেহ বলেন, পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রার্থনা মন্ত্র রচিত।

এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ ধর্মপাল মহাশয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিবেন

মধ্যে দাক্ষা হাক্ষামা বাধিয়া যায় । জনকত ফরাসী খৃষ্ট মিসনরি এই বিষয়ে এক মজার গল্প করেন । একদিন তাঁহারা এক মঠের নিকটস্থ একটী প্রার্থনা-চক্রের কাছ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন দুই জন লামার মধ্যে মহাগণ্ডগোল উপস্থিত । ব্যাপারখানা এই যে, তাঁহাদের একজন চাকা ঘুরাইয়া নিশ্চিন্তু মনে ঘরে ফিরিয়া যাইতেছেন, মুখ ফিরাইয়া দেখেন আর একজন লামা সে চাকা থামাইয়া নিজের খানায় পুণ্যের ঝাঁক পাড়িবার অভিপ্রায়ে চাকা ঘুরাইয়া দিতেছে— দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ পিছু ফিরিয়া তার চাকা বন্ধ করিয়া পুনর্বার আপনি ফিরাইয়া দেয় । এ বলে আমি ঘুরাইব, আমার চাকায় তুমি কেন হাত দেও ? ও বলে আমি ঘুরাইব, তুমি কেন হাত দেও ? ক্রমে উভয়তঃ গালাগালি, গালাগালি হইতে মারামারি । অবশেষে একজন বৃদ্ধ লামা বিবাদস্থলে আসিয়া উভয় পুণ্যোচ্চুর কল্যাণার্থস্বহস্তে চাকা ঘুরাইয়া উহাদের কলহ মিটাইয়া দেয় । (Buddhism—Monier Williams.)

প্রার্থনা-চক্র ভিন্ন ঐ সকল প্রদেশে প্রার্থনার নিশান উড়িতে দেখা যায়—বোধ করি দার্জিলিং পাহাড়ে ঐ দৃশ্য অনেকে দেখিয়া থাকিবেন ; নিশান বাতাসে উড়িয়া যেমন আকাশাভিমুখে যায়, তন্ত্রজন অমনি মন্তোচ্চারণের পুণ্য উপার্জন করেন ।

লামাধর্ম ।—

তিব্বতী বৌদ্ধদের আচার অনুষ্ঠান মত ও বিশ্বাস, মূল ধর্মের সাহিত ইহার কোন বিষয়েই মিল নাই ; উহাদের পৌরোহিত্য-

প্রধান জনসমাজও স্বতন্ত্রভাবে গঠিত । তিব্বতী ভিক্ষুর নাম লামা, জনপদের প্রায় পঞ্চমাংশ এই লামা শ্রেণীভুক্ত । লামাদের মধ্যে দুই জন প্রধান লামা, দালাই লামা এবং পঞ্চম লামা ; একটীর রাজধানী লহাসা, অন্য লামার মঠ ভারতের প্রান্তসীমার অদূরবর্তী তাসি-লুন্পো নামক নগরে প্রতিষ্ঠিত । প্রধান লামারা বুদ্ধাবতার বলিয়া পূজিত । লোকের বিশ্বাস এই যে, ইহাদের কাহারও মৃত্যু হইলে, তাঁহার প্রেতাত্মা কোন একটা শিশু অথবা ছোট বালকে প্রবেশ করে,—এই বালকটিকে চিনিয়া বাহির করাই এক সমস্যা । কখন কখন মৃত লামা মৃত্যুর পূর্বে বলিয়া যান কোন্ কুলে তিনি পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিবেন ; কখন বা দুই লামার মধ্যে যিনি জীবিত, তিনি মৃত লামার উত্তরাধিকারী নির্দেশ করিয়া দেন ; কখন বা দৈবজ্ঞের পরামর্শ, শাস্ত্রের বিধান ও অশ্যান্ত লক্ষণ দ্বারা মঠাধিকারী লামা নিরূপিত হয় । এই নির্বাচনে চীনরাজেরও মতামত গৃহীত হইয়া থাকে । নবাবতার আবিষ্কৃত হইলে লামামণ্ডলীর কাছে আনিয়া তাঁহার পরীক্ষা হয় ; তিনি মৃত লামার গ্রন্থ বস্ত্রাদি চিনিয়া বলেন, ও তাঁহার পূর্বজীবনের ঘটনা সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলীর উত্তর দেন । পরীক্ষোত্তীর্ণ মহালামা মহাধূমধামে নিজ মঠে প্রতিষ্ঠিত হইয়েন ।

দালাই লামা আদি বুদ্ধের প্রতিনিধি ; তাঁহাকে বৌদ্ধ 'পোপ' বলা অসঙ্গত হয় না । অনেক যুদ্ধবিগ্রহের পর পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে ( ১৪১৯এ ) তিব্বতে দালাই লামার আধিপত্য স্থাপিত হয় । এই লামা বিদেশীদের চক্ষে আকাশকুসুমের ন্যায় দুর্লভ

দর্শন । আপনারা শুনিয়া থাকিবেন যে কয়েক বৎসর হইল ( ১৮৮২ ) আমাদের খ্যাতনামা পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস এই লামার সাক্ষাৎকার লাভ করেন ; এ ঘটনাটি আমাদের সামান্য গৌরবের বিষয় নহে । ইহার বিস্তৃত বিবরণ শরৎ বাবুর ভ্রমণবৃত্তান্তে বর্ণিত আছে । মোনিয়র উইলিয়ম্‌সের 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থে ৩৩১ পৃষ্ঠায় তাহার সারভাগ সন্নিবেশিত হইয়াছে । লামার প্রাসাদ-মঠ লহাসার উত্তর-পশ্চিম পোতালায় অবস্থাপিত । ইহা এক প্রকাণ্ড উচ্চ চৌতারা গৃহ, দশ সহস্র ভিক্ষুর বাসোপযোগী কঙ্করাজিতে সুসজ্জিত ; ইহার শিখরদেশ স্বর্ণচূড়ায় বিভূষিত । সিঁড়ির পর সিঁড়ি উঠিয়া পরিব্রাজক মহাশয় লামা-মধ্যে আরোহণ করিলেন, সেই লোহিত প্রাসাদের উচ্চ শিখর হইতে লহাসা নগরী ও তাহার আশপাশের শোভা সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহার নয়ন-মন মুগ্ধ হইল । মহালামা ৮ বৎসরের বালক, বক্র চক্ষু ছাড়া মুখশ্রী আর্ঘ্যাকৃতি, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, রঙ্গীন রেশম-মণ্ডিত সিংহাসনে দুই সিংহমূর্তি মাঝে উপবিষ্ট । দেহোপরি গৈরিক বসন, মাথায় পঞ্চধানীবুদ্ধের নিদর্শনস্বরূপ পঞ্চকোণ পীতবর্ণ টোপর । প্রাচীরের গায়ে বৃদ্ধ বোধিসত্ত্বের চিত্রাবলী, জাফ্রান রঞ্জিত আরক্ত শান্তিঙ্গল সিঞ্চন, ধূপধূনা দীপালোকে আনুষ্ঠানিক ঘটায় সীমা নাই । দর্শকমণ্ডলীর জন্য নীচে নয় পংক্তিতে সারি সারি পশমের আসন বিছানো, সকলে শান্ত সংযত ভাবে নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিলেন । শরৎ বাবুর আসন তৃতীয় পংক্তিতে । পরে আশীর্ব্বাদের সময় আসিলে দর্শকবৃন্দ মাথা হেঁট করিয়া সিংহাসনের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িল । শরৎ বাবু



বলিতেছেন—“যখন আমার পালা আসিল মহাপ্রভু আমাকেও আশীর্ব্বাদ করিলেন, তখন আমি তাঁহার দেবমূর্ত্তি দর্শন করিবার সুযোগ পাইলাম ।” এই বিবরণে পোপের পদাঙ্গুলি চুম্বনের ন্যায় কোন অনুষ্ঠানের আভাস নাই। এই অনুষ্ঠানের এক প্রধান অঙ্গ—চা-পান। লামারা সকলেই এক এক চায়ের পেয়ালা আপন বস্ত্র মধ্যে গচ্ছিত রাখেন। প্রথমে একজন পরিচারক মহালামার স্বর্ণপাত্রে চা ঢালিয়া পাত্র পূর্ণ করিয়া দিল, পরে দর্শকগণের পাত্র পূর্ণ হইলে তাঁহারা তিনবার পাত্র নিঃশেষ করিয়া নিঃশব্দে পান করিলেন, পরে শূন্য পেয়ালা বন্ধের পকেট-জাত করিলেন। তৎপরে একটী তণ্ডুলপূর্ণ স্বর্ণখাল মহালামার সম্মুখে আনীত হইল, তিনি তাহা স্পর্শ করিয়া দিলে সেই মহাপ্রসাদ, দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হইল। পরিশেষে বুদ্ধ ধর্ম্ম সজ্জ, এই ত্রিরত্নের নামে আশীর্ব্বাদ উচ্চারণের পর দরবার ভঙ্গ হইল। সভাস্থলে একজন লামা, যিনি শরৎ বাবুর পাশে বসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার কানে কানে কহিলেন—“তুমি পূর্ব্বজন্মে না জানি কি পাপ করিয়া এমন দেশে জন্মিয়াছ যেখানে জীবন্ত বুদ্ধ নাই !”

তিব্বতের দালাই লামার অধিকার ধর্ম্মরাজ্যেই আবদ্ধ, অথবা এই সঙ্গে তাঁহার কোন রাজকীয় ক্ষমতা সম্মিশ্রিত, এ বিষয় লইয়া এইরূপে অনেক স্থানে অনেক কথা শুনা যাইতেছে। সম্প্রতি রুষ সম্রাটের নিকট তাঁহার যে দৌত্য গিয়াছে তাহাই এই সমস্ত তর্কবিতর্কের মূল, এবং তাহা হইতে আমাদের রাজপুরুষদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ উপস্থিত



হওয়া বিচিত্র নহে। মেষ-ভল্লুকে মিত্রতা-বন্ধনের চেষ্টা দেখিলে লোকের মনে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক। “উনবিংশ শতাব্দী” সংবাদ পত্রে একজন ইংরাজ লেখক দালাই লামাকে বশ করিবার এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি বলেন, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির কৃষ্ণা জিলায় যে বুদ্ধদস্তাদি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা উপহার দেওয়া বেশ একটা লামা-বশীকরণ মন্ত্র। আমাদের বিবেচনায় আর কোন উপায় চিন্তা করা আবশ্যিক, যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে কোন ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই।

চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে সং খাপা নামক একজন ধর্মসংস্কারক উঠিয়া গাল্ডানে এক প্রকাণ্ড মঠ নির্মাণ করেন। এই লামার মৃত্যুর পর ইঁহার স্বর্গরোহণ উপলক্ষে এক দীপাবলির উৎসব প্রবর্তিত হয়। ইনিও বুদ্ধাবতার বলিয়া পূজিত এবং বৌদ্ধ মন্দিরে ইঁহার প্রতিমূর্তি দালাই ও পঞ্চন লামা-প্রতিমূর্তির মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত। এ ভিন্ন আরো কয়েক জন লামাগ্রগণ্য মহালামা আছেন, যথা মোঙ্গোলিয়ার কুরুণ, তাতারের কুকু, পেকিনের মহালামা, ভোটে'র ধর্মরাজ, ( যাঁহার উপাধিচ্ছটা আবৃত্তি করিতে কণ্ঠরোধ হয়)—“বুদ্ধশ্রেষ্ঠ, দেবাবতার, শাস্ত্রজ্ঞানে অনুপম, বিদ্যায় সরস্বতীসম, পাপহরণ, দানব-মর্দন, নীতি-নিপুণ, সর্বধর্মশিরোমণি রাজাধিরাজ ধর্মরাজ!” নামা-বলীর গৌরবে ইনি গৌতম বুদ্ধকেও চাড়াইয়া উঠিয়াছেন।

স্বর্গ নরক।

বৌদ্ধশাস্ত্রে স্বর্গ নরক কল্পনা এইরূপ।—

এই বিশ্বত্রিকাণ্ড প্রকাণ্ড চক্রবালে পরিপূরিত । প্রত্যেক চক্রবালে ছয় প্রকার জীবের বাসযোগ্য ৩০টী সত্ত্বলোক স্তরে স্তরে বিনির্মিত, তাহাদের মধ্যভাগে সুমেরু পর্বত । পাতালে ১৩৬ নরক বিভিন্ন-জাতীয় পাতকীকুলের জন্য নির্মিত, তাহাদের মধ্যে বুদ্ধদেষ্টাদের জন্য 'অবীচি' নরক সর্ববাপেক্ষা ভয়ানক । নরকবাস সুদীর্ঘকাল হইলেও অনন্ত নরকভোগের বিধান নাই । নরকের উপরিভাগে কামলোক চার প্রকার—১। পশু-লোক, ২। প্রেত-লোক, ৩। অসুর-লোক, ৪। নর-লোক । তদুপরি ছয় দেব-লোক । প্রথম, চার মহারাজার ( দিকপালের ) স্বর্গ—

পূর্বদিকে, গন্ধর্ব্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র ।

দক্ষিণে, কুস্তাগুরাজ বিরুদ্ধক ।

পশ্চিমে, নাগাধিরাজ বিরূপাক্ষ ।

উত্তরে, ধনপতি কুবের ।

দ্বিতীয়, ত্রয়স্বিংশ স্বর্গ ইন্দ্রের অমরাপুরী, যেখানে ইন্দ্র ত্রয়স্বিংশ দেবতাদের সঙ্গে রাজত্ব করেন । বুদ্ধজননী মায়াদেবীর মৃত্যুর পর বুদ্ধ তাঁহাকে ধর্মোপদেশ দিতে এই স্বর্গে আরোহণ করেন । তাহা ছাড়া পূর্ব পূর্ব জন্মে বুদ্ধ নিজেই ইন্দ্র ছিলেন ।

তৃতীয়, যমলোক ।

চতুর্থ, তুষিত স্বর্গ, বোধিসত্ত্ব-ধাম, মৈত্রেয় যার অধিপতি ।

পঞ্চম, নির্মাণরতি স্বর্গ, সৃষ্টিকুশল দেবতাদের বাসগৃহ ।

ষষ্ঠ, পরনির্মিত বাসবস্তী স্বর্গ, এখানে ষাঁহারা বাস করেন সৃজনকার্যে তাঁহাদের নিজেদের ক্ষমতা নাই, তাঁহারা অপর দেবগণের সৃষ্টি-ভণ্ডুলকরণে বিলক্ষণ পটু—বৌদ্ধ সয়তান “মার” এই লোকে বাস করেন । ছয় দেবলোকের তালিকা এই :—

ক

- ১ । চতুর্মহারাজ স্বর্গ
- ২ । ত্রয়ত্রিংশ স্বর্গ
- ৩ । যম স্বর্গ
- ৪ । তুষিত স্বর্গ
- ৫ । নির্মাণরতি দেবগণের স্বর্গ
- ৬ । পরনির্মিত বাসবস্তী স্বর্গ

এই ছয় দেবলোকের উপরিভাগে ১৬টা রূপলোক ধ্যানসিদ্ধ পুরুষদের জন্ম নির্দিষ্ট ; যথা—

খ

প্রথম ধ্যান—ত্রয়লোক

- ৭ । ত্রয় পরিসজ্জা
- ৮ । ত্রয়-পুরোহিত
- ৯ । মহাত্রয়

দ্বিতীয় ধ্যান—আভাময় লোক

- ১০ । পরিত্তাভা
- ১১ । অপ্রমাণাভা
- ১২ । আভাম্বর

## তৃতীয় ধ্যান—শুভলোক

- ১৩। পরিত্ত শুভ
- ১৪। অপ্রমাণ শুভ
- ১৫। শুভ কুৎস

## চতুর্থ ধ্যান—মহাযোগী স্বর্গ

- ১৬। বৃহৎ ফল
- ১৭। অসংজ্ঞাসত্ত্ব
- ১৮। অবূহ
- ১৯। অতপা
- ২০। সূদনী
- ২১। সূদর্শন
- ২২। অকনিষ্ঠ

এই ১৬ রূপ-লোকের শিখরদেশে চারিটি অরূপ-লোক, অশরীরী ধ্যানী বুদ্ধদের আবাস-স্থান।

## অরূপ লোক

- ২৩। আকাশ আয়তন
- ২৪। বিজ্ঞান আয়তন
- ২৫। আকিঞ্চন আয়তন
- ২৬। নৈব সংজ্ঞা অসংজ্ঞায়তন

অভিধর্ম মতে অরূপ লোকের সংখ্যা পাঁচ। পঞ্চাধ্যানীবুদ্ধ এক এক জন করিয়া পঞ্চ অরূপ লোকের অধীশ্বর। অতএব বৌদ্ধ স্বর্গ নরক সংক্ষেপে এই। বৌদ্ধ মতে জীব হয় প্রকার—

১ দেবতা, ২ মানব, ৩ অসুর, ৪ পশু, ৫ প্রেত, ৬ নারকী । এই সমস্ত জীবের জন্ম ৪ কামলোক, ৬ দেবলোক, ১৬ রূপলোক ৪ অরূপ লোক, এবং ১৩৬ নরক অনন্ত আকাশে স্তূমেরু পর্বতের উপর নীচে অবস্থাপিত ।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়-ভেদ । দার্শনিক শাখা ।—

যেমন আচার অনুষ্ঠানে, সেইরূপ দার্শনিক তত্ত্ব-বিচারেও বৌদ্ধজগতে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয় । অল্পকাল মধ্যেই বৌদ্ধেরা অষ্টাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে, যথা মহা-সাজ্জিক, শ্ববির, এক ব্যবহারিক, চৈত্যাবাদ, সর্বাশ্চিবাদ, বাৎস্ত-পুত্রীয়, কাশ্যপীয়,—এইরূপ নানা মূনির নানা মত প্রচারিত হয় । ছয়েন সাংএর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এবং সিংহল গ্রন্থাবলীতে এই অষ্টাদশ সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে । ইহাদের কোনটী মহাযান, কোনটী হীনযান শাখাশ্রিত । প্রাচীন গ্রন্থে এই যে সম্প্রদায় সমূহের নাম দেখা যায়, ইহাদের কোন শাখা আধুনিক বৌদ্ধসমাজে বিশেষ পরিচিত বলিয়া বোধ হয় না । বৌদ্ধদের মধ্যে এইরূপ মতাস্তর ঘটয়া ক্রমে চারিটি দর্শন উৎপন্ন হইয়াছে । সর্বদর্শন সংগ্রহে এই চারি মতের নামোল্লেখ আছে,—যথা মাধ্যমিক, যোগাচার, বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক । মাধ্যমিক দর্শন এক-প্রকার বৌদ্ধ মায়াবাদ বলিলেই হয় । ইহার মতে সকল পদার্থই মায়া, নির্বাণও মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে । যোগাচার দর্শনের মতে বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য পদার্থ, আর সকলি মিথ্যা ; এই মতের অপর নাম বিজ্ঞানবাদ । বিজ্ঞান দুই প্রকার—

প্রকৃতি-বিজ্ঞান এবং আলয়-বিজ্ঞান। প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ার নাম প্রকৃতি-বিজ্ঞান। ঐ জ্ঞানধারা বা জ্ঞানসমষ্টির নাম আলয়-বিজ্ঞান। জ্ঞানসমূহ নানা প্রকার ;—কালিক জ্ঞান, দৈশিক জ্ঞান, বস্তু প্রতিবিকল্প জ্ঞান ; এই সমস্ত জ্ঞানের যোগাযোগে নিখিল পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঐ ধারাবাহিক জ্ঞানই ‘অহং’ বা আত্মা। (যেমন অসংখ্য জলকণার সমষ্টি ভিন্ন নদী নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, সেইরূপ জ্ঞানসমষ্টিই আত্মা, ‘অহং’ পদবাচ্য কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই ; তেমনি আবার জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য পদার্থও নাই। একমাত্র জ্ঞানই সত্য, ঘটপট প্রভৃতি জ্ঞেয় পদার্থমাত্রেই জ্ঞানের আকারবিশেষ। মাধ্যমিক ও যোগাচার এই দুই মত, একটী বেদান্ত, অণুটী যোগশাস্ত্রের কতকটা অনুরূপ। অপর দুই সম্প্রদায়ী অস্তিবাদী, অর্থাৎ তাঁহারা আত্মা ও বহির্জগৎ উভয়েরই অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে ইঁহাদের পরস্পর কিছু মতভেদ দৃষ্ট হয়। বৈভাসিকেরা কহেন, বাহ্যবস্তু সমুদায় কেবল প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। সৌত্রাস্তিক মতে বাহ্যবস্তু প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ নহে, অনুমান-সিদ্ধ। আমাদের মনে বহির্জগতের প্রতিকল্প উৎপন্ন হয়। সেই প্রতিকল্প হইতেই বিষয়-জ্ঞান জন্মে। জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকল্প, যাহা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনোদর্পণে প্রতিফলিত হইতেছে, সেই মানসচিত্র হইতে আমরা বহির্বিষয়ের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া লই। উভয় মতেই, যে সময়ে বস্তু প্রত্যক্ষ হয় সেই সময়েই অস্তিত্ব থাকে, প্রত্যক্ষ না হইলেই বিদ্যমানতারে গুণ্য ধ্বংস হইয়া যায়। অর্থাৎ দৃশ্যমান

জগৎ আমার একটা মনের ভাব মাত্র, তাহা আমি ভাবিলেই আছে—না ভাবিলেই নাই। ভাব-জগতের মূল সত্য জগৎ নাই। এই নিমিত্ত হিন্দু পণ্ডিতেরা এই মতের নাম ‘সর্ব-বৈনাশিক’ দিয়াছেন। বৈভাষিকের আবার চতুঃশাখা—সর্বাস্তিত্ববাদ, মহাসার্জিক, সম্মতীয়, স্ববির। ফাহিয়ান বলেন, প্রথমোক্ত দুই শাখার নিয়মাবলী তিনি পাটনার মঠ হইতে সংগ্রহ করিয়া চীনভাষায় অনুবাদ করেন।

ইং সিং, যিনি সর্বশেষে এদেশে তীর্থভ্রমণে আসেন, তিনি ‘সর্বাস্তিত্ববাদী’ ছিলেন; তাঁহার সময়ে উত্তরে এই মত এবং দক্ষিণে ‘স্ববির’ মতের প্রচার ছিল। হীনযান ও মহাযান সম্বন্ধে ইং সিং বলিয়াছেন—“এ দুইই বিশুদ্ধ মত, উভয়ই সত্য, ইহারা উভয়েই ভিন্ন মার্গ দিয়া সেই একই নির্বাণে পৌঁছাইয়া দেয়।”

মাধবাচার্য্য সর্বদর্শন সংগ্রহে বৌদ্ধ দর্শন প্রস্তাবে তাহার চারি তত্ত্ব নির্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—

১ম। জগতের প্রত্যেক পদার্থই ক্ষণিক

২য়। সকলই দুঃখময়

৩য়। সমুদয়ই স্বলক্ষণ—নিজ নিজ লক্ষণাক্রান্ত

৪র্থ। সকলই শূন্য

যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে, ফলে দাঁড়ায় এই যে বৌদ্ধ দর্শন শূন্যবাদে পর্যাবসিত। তাহার মতে সকলই শূন্য, মূলে সত্য বস্তু কিছুই নাই।

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কিরূপ পরিবর্তিত ও বিকৃত হইয়াছে, তাহার কতক



আভাস পাইয়া থাকিবেন । যাহা বলা হইল তাহা ছাড়া কত দেশের কত উৎসব, পাগোডা, বিহার, ধর্মমন্দিরে বিচিত্র পূজার্চনা, বুদ্ধদেবের মূর্তি ও প্রতিমা পূজা, কত কত বুদ্ধাবতার, বোধিসত্ত্ব—বুদ্ধের অস্থিদেহের সমাধিক্ষেত্র, কতদিকে কত স্তূপ চৈত্যা, কত ‘মার’ ভূত প্রেত দেব দেবীর কল্পনা, কত প্রকার স্বর্গ নরক কল্পনা, কত প্রকার মত ও সম্প্রদায়—সে সমস্ত আর কত বলিব ? ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, আশানুরূপ ফললাভও হয় না । মার কথা এই যে, আদিম বৌদ্ধধর্ম যাহা পালি বৌদ্ধশাস্ত্র মন্ত্রন করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়,—আর প্রচলিত ধর্ম, বিশেষত তাহার উত্তর শাখা—ইহাদের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ঘটিয়াছে, তাহা এরূপ গুরুতর যে একটা চিত্র দেখিয়া অপরটাকে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর ।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ ।

বৌদ্ধধর্মের উন্নতি, অবনতি ও পতন ।

পূর্বের বলা হইয়াছে শাক্য সিংহ বুদ্ধের পাইবার পর বারাণসীতে গিয়া তাঁহার পূর্বপরিচিত পঞ্চ ভিক্ষুকে উপদেশ প্রদান পূর্বক শিষ্য করিয়া লইলেন ; তখন হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি যে যে উপায়ে শিষ্যমণ্ডলী সংগ্রহ করিলেন, তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা কিরূপে ক্রমান্বয়ে পরিবদ্ধিত হইল, তাহার বিবরণ মহাবগ্গে প্রকাশিত । পঞ্চ ভিক্ষুর দীক্ষার পর বশ নামক কাশীর জনৈক ধনী শ্রেষ্ঠিয়া তাঁহার পিতা মাতা পত্নীসহ বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হইলেন । পাঁচ মাসের মধ্যে ষাট জন শিষ্য হইল ; বুদ্ধ তাহাদিগকে প্রচার-কার্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিয়া নিজে উরুবেলার বনে গিয়া রহিলেন ; তথায় কাশ্যপ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ ও তাঁহার দুই ভ্রাতা, এই তিন শিষ্য পাইলেন । এ অঞ্চলে কাশ্যপের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল অনেকগুলি যুবক তাঁহার নিকটে বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন । বুদ্ধদেব কাশ্যপের আশ্রমের নিকট থাকিয়া উপদেশ দিতেন ও ভিক্ষার সংগ্রহার্থে তাঁহার দ্বারে গমন করিতেন । একদিন গিয়া দেখিলেন, এক অজগর সর্প কাশ্যপের হোম-কক্ষে ফণা ধরিয়া বসিয়া আছে । বুদ্ধ সাপকে মস্ত্রে বশ করিয়া আপনার ভিক্ষার ঝুলিতে পুত্রিয়া রাখিলেন । এইরূপ আরো কতকগুলি অলৌকিক

শক্তির পরিচয় পাইয়া কাশ্যপ সদলবলে গৌতমের শিষ্যরূপে দীক্ষিত হইলেন। উরুবেলায় শিষ্যসংখ্যা সর্বসমেত ১০০০ হইল।

এই শিষ্যমণ্ডলী সঙ্গে বুদ্ধ একদিন গয়ার নিকট গয়াশীর্ষ পর্বতে উপবিষ্ট আছেন, রাজগৃহের অধিত্যকা তাঁহার সম্মুখে বিস্তৃত—এমন সময় সামনের এক পাহাড়ে ঘোর দাবানল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এই অনলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধদেব এইরূপে উপদেশ দিলেন—তাহা “আগ্নেয় উপদেশ” বলিয়া নির্দেশ করিতে চাই।

৪. “হে ভিক্ষুগণ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কি ছতাশন জ্বলিয়া উঠিয়াছে! দেখ, আদিত্য আদীপ্ত; চক্ষু জ্বলিতেছে, সমুদায় দৃশ্যমান জগতে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই সকল ইন্দ্রিয় পক্ষেন্দ্রিয় জ্বলিয়া উঠিতেছে। বাসনাগ্নি, রাগাগ্নি, লোভাগ্নি, মোহাগ্নি জ্বলিতেছে—জন্ম মৃত্যু রোগ শোক নৈরাশ্য দুর্শ্বনস্ত সেই অনলে প্রসৃত। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়, দেহ মন চিন্তা সকলই এক বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড। ইন্দ্রিয়সকল কাম্য বস্তুর উপভোগে উত্তেজিত—বাসনানল নিরন্তর প্রজ্বলিত রহিয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ! এই অনিবার্য জ্বালা প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি সংযত হন; পক্ষেন্দ্রিয় দেহ মন সকলেরই প্রতি তাঁর বৈরাগ্য জন্মে। এই বিষম জ্বালা কিসে প্রশমিত; হয়, এই সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা হইতে কি উপায়ে উদ্ধার পাওয়া যায়, তিনি তাহার উপায় চিন্তা করেন, এবং অবশেষে সংযম ও ব্রহ্মচর্য সাধনা দ্বারা সেই নির্বাণ রাজ্যে উপনীত হন, যেখানে বাসনা

ছিন্নমূল ; যেখানে তিনি জন্ম ভয় জরা মৃত্যু জালা যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইয়া শাস্ত্রত আনন্দ উপভোগ করেন ।”

তৎপরে তিনি উরুবেলা হইতে মেনীয় বিশ্বিমারের রাজধানী রাজগৃহে আসিয়া স্তপতীর্থের নিকট যষ্টিবন নামক আরাম-কাননে বাস করিতে লাগিলেন । রাজা বুদ্ধের আগমন সংবাদ পাইয়া স্বীয় অনুচরবর্গসহ বুদ্ধদর্শনে সমাগত হইলেন, তখন অগ্নিহোত্রী কাশ্যপকে দেখিয়া ও তাঁহার শিষ্যত্ব-গ্রহণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সকলেই বিস্ময়ে অবাক্ । বুদ্ধদেব তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া রাজা, ব্রাহ্মণমণ্ডলী ও অন্যান্য উপস্থিত গৃহপতিগণের সমক্ষে কাশ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“কাশ্যপ, তুমি তাপসজনের মধ্যে খাতনামা অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ, বল কেন তুমি জপ তপ যাগ যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়া এই নবীন পন্থা অবলম্বন করিয়াছ ? তোমার অগ্নিগৃহ শূন্য পড়িয়া রহিবার কাবণ কি ? হে উরুবেলার ব্রাহ্মণ, তুমি এমন কি সত্য উপার্জন করিয়াছ, যাহার জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ? স্বর্গমন্ডো এমন কি আছে, যার জন্য তুমি লালায়িত ?”

কাশ্যপ উত্তর করিলেন—

“আমি বেশ বুঝিয়াছি হোম যাগ যজ্ঞ নিতাস্ত নিফল, কেন না সে সমস্ত অনুষ্ঠান বাহ্য-আড়ম্বর মাত্র, তাহাতে এমন কিছুই নাই যদ্বারা বিষয়-লালসা প্রশান্ত হয়, মোহপাশ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় । আমি জানিয়াছি সংসারের সকলি অলীক, ক্ষণিক, দূর্ণিত, শূন্য । আমি সেই মোক্ষাবস্থার সন্ধান পাইয়াছি, যে অবস্থায় জন্ম বন্ধন ছিন্ন হয়, লোভ মোহ দ্বেষ হিংসা

বিনষ্ট হইয়া যায়, বিষয়-ভ্রমণ স্বর্গকামনা নিরস্ত হয় । আমি সেই পরম সম্পদ লাভ করিয়াছি, যাহার ক্ষয় নাই, পরিবর্তন নাই, এই হেতু হোম বলি যাগযজ্ঞে আর আমার প্রবৃত্তি নাই ।” এই বলিয়া তিনি বুদ্ধদেবের চরণে প্রণত হইয়া কহিলেন—  
 “ভগবান বুদ্ধই আমার গুরু, আমি ইহার শিষ্য—ভগবান বুদ্ধই আমার গুরু ।” তখন উপস্থিত জনগণ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, ও নিম্মল শুভ্র বসনে যেমন সহজে রং ধরে, তাহাদের মনও তেমনি সত্য ধারণের জন্য প্রস্তুত হইল । বুদ্ধ তাহাদিগকে সদুপদেশ দিয়া সংসারের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিলেন, এবং অনেকে সেই উপদেশ গ্রহণ করিয়া গৃহীশিষ্যরূপে দীক্ষিত হইলেন । তাহার মধ্যে রাজা বিশ্বিসারও একজন ।

পরে রাজা বিশ্বিসার বুদ্ধদেবের নিকট ক্রতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, “প্রভো ! আমি যখন যুবরাজ ছিলাম, তখন আমার মনের সাধ এই পাঁচটী ছিল—প্রথম, রাজ্যাভিষেকের অভিলাষ ; দ্বিতীয়, আমার রাজ্যে বুদ্ধদেবের চরণধূলি পড়ে, এই ইচ্ছা ; পরে তাঁহার দর্শন, উপদেশ শ্রবণ, এবং তাঁর উপদেশের মর্শ্বগ্রহণ । প্রভো, আমার এই পাঁচটী মনোরথই পূর্ণ হইয়াছে, আমি এখন আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি । এইক্ষণে আমার মিনতি এই যে, প্রভু তিস্কুমগুলী লইয়া কল্য রাজবাটীতে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন ।” বুদ্ধদেব মৌনভাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন । পরদিন মধ্যাহ্নপূর্বে বুদ্ধদেব শিষ্যবর্গসহ প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন । রাজা স্বহস্তে অন্ন বাস্তু মিস্টার পরিবেশন পূর্বক তাঁহাদের যথোচিত আতিথ্য

সংকার কবিলেন, এবং ভোজনান্তে বৌদ্ধ সঙ্ঘে বেণুবন উৎসর্গ কবিয়া গুরুজীর মনস্তুষ্টি সাধন করিলেন । ( মহাবগ্গ )

এই আশ্রমে বুদ্ধদেব দুই মাস অতিবাহিত করেন ।

এ সময়ে রাজগৃহে সারীপুত্র ও মুদ্গালায়ন, এই দুই ব্রাহ্মণ নাম কবিতেন । ইঁহারা পরিত্রাজক সঙ্ঘের শিষ্য ছিলেন, ও পরম বন্ধুভাবে গুরুর নিকট ধর্ম শিক্ষা করিতেন । তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা এই যে, আমাদের মধ্যে যিনি প্রথমে মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইবেন, তিনি বন্ধুকে তাহা খুলিয়া বলিবেন । একদিন সারীপুত্র বুদ্ধশিষ্য অশ্বজিৎকে দেখিতে পাইলেন ; দেখিলেন তিনি রাজগৃহে ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কবিয়া বেড়াইতেছেন । তাঁহার সুন্দর মুখশ্রী এবং প্রশান্ত গম্ভীর মুক্তি দেখিয়া বিস্ময়ানন্দ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাই, তোমার মুখশ্রী কি সুন্দর ! তাহাতে কি উজ্জ্বল বিমল কাস্তি দীপ্তি পাইতেছে ! কাহার মন্ত্রে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছ ? কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন ?”

অশ্বজিৎ কহিলেন, “শাকাবংশীয় গৌতম মুনি আমার গুরু, তাঁহারই উপদেশে আমি দীক্ষিত” ।

সারীপুত্র—“তোমার গুরুর নিকট কি শিক্ষা পাইয়াছ ?”

অশ্বজিৎ—“আমি অল্প দিন হইল এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি, বিশেষ কিছু জানি না, আমি সবটা আপনাকে খুলিয়া বুঝাইতে পারিব না । আপনি আমার গুরুজীর নিকটে গেলে যাহা জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি সকলি বলিয়া দেবেন—আপনার সর্বদা সংশয় দূর করিবেন । বুদ্ধদেব কার্য্যকারণ শূন্য সমস্তই

অবগত আছেন, হেতু-প্রভব ধর্মসকলের হেতু এবং তাহাদের নিরোধ, তাহাদের আদি অন্ত সর্বলি জানেন, ও সেইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন।” \*

সারীপুত্র এই গুটিকত কথার মধ্যে সত্যের কতক জ্ঞান উপলব্ধি করিলেন, দেখিলেন বিশ্বচরাচর সকলি নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর—যাহার জন্ম তাহার মৃত্যু, যাহার আদি তাহার অন্ত অবশ্যম্ভাবী। এই নিয়ত ঘূর্ণায়মান ভবচক্র হইতে কিসে মুক্তি লাভ হয় তাহা ভাবিতে লাগিলেন : এবং কি সত্য জানিলে এই ভব-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, তাহা জানিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

সারীপুত্র মুদগলায়নের নিকটে গিয়া স্বীয় মনোভাব ও সংশয় সকল বাক্ত করিলেন। উভয়েই বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণের জন্য

• শ্লোকটি এই।—

যে ধম্মা হেতু প্রভবা

তেষাং হেতুন্ তথাগতঃ।

অথ যেসঞ্চ যো নিরোধো

এবম্বাদৌ মহা সমনো : পালি )

যে ধম্মা হেতু প্রভবা তেহুন্তেষাং তথাগতঃ।

হৃদং তেষাং চ নিরোধ—এবম্বাদৌ মহাশ্রমণঃ ( সংস্কৃত )।

অর্থ—হৃৎখনয় এ ভবের উৎপত্তি কোথায়,

শ্রমণ জানেন তার তথা সমুদায়।

কেমনে বা হয় সেই হৃৎখের নিরোধ,

তথাগত বখাষথ করি দেন বোধ।



অধীর হইয়া পড়িলেন । তাঁহাদের গুরু সঞ্জয়ের অধীনে আর তাঁহারা থাকিতে চাহিলেন না, সঞ্জয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বুদ্ধের আশ্রমে উপনীত হইলেন । বুদ্ধদেব তাঁহাদের আসিতে দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন,—“এই যে দুজন ব্রাহ্মণ দেখছ, তাঁহারা আমার শিষ্যদের মধো কৃতী ও অগ্রগণ্য হইবেন ।” এই বলিয়া তিনি স্নহস্তে তাঁহাদের দীক্ষা দান করিলেন । এই দুই শিষ্য বুদ্ধদেবের অগ্রশ্রাবক নামে পরিচিত ছিলেন । তাঁহারা বুদ্ধের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে বসিতেন বলিয়া লোকেরা তাঁহাদের একজনকে ‘দক্ষিণ হস্ত’, অগ্যকে ‘বাম হস্ত’ শ্রাবক বলিয়া ডাকিত ।

এই নবীন শিষ্যদের প্রতি গুরুদেবের বিশেষ স্নেহ ও অনুগ্রহ দৃষ্টি পূর্বক শিষ্যেরা কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন; পরিশেষে তিনি তাঁহাদের সকলকে একত্র করিয়া বৌদ্ধধর্ম-বীজের বাথান ও সত্বপাদেশ দানে বিদ্রোমানল প্রশমিত করেন ।

+ দার্ঘ্য নিকারের মহাপদান স্মৃত্যে যে বৌদ্ধ ধর্মবীজ দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই—

সর্বপাপসম্ভ অকরণং

কুসলসম্ভ উপসম্পদা

সচিত্ত পরিয়োদপণং

এতং বুদ্ধানুশাসনং

অর্থ— অকরণ পাপ-আচরণ,

নিরত কুসল-উপার্জন,

চিত্তের সম্যক শোধন,

এই বুদ্ধানুশাসন ।

কথিত আছে এই রাজগৃহে অবস্থিতি কালে প্রাতিমোক্ষের প্রধান সূত্রগুলি বিরচিত ও বৌদ্ধ সঙ্ঘের পত্তন হয়—সেই প্রথম সভার নাম “শ্রাবক সন্নিপাত।”

এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া লোকেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। কেহ বলিল গৌতম আমাদের গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইতে আসিয়াছেন; কেহ বলিল গৌতম আমাদের স্ত্রীদের বিধবা করিবার জন্য আসিয়াছেন; তিনি আমাদের পরিবার সমাজ সকলি উলট পালট করিয়া দিতেছেন; সকলেই গৃহতাগী হইয়া সন্ন্যাসী হইতে চলিল। হাজার জটাধারী সন্ন্যাসীকে তিনি শিষ্য করিয়াছেন, সঙ্ঘের আড়াই শো শিষ্য গুরুকে ছাড়িয়া গৌতমের পদানত; মগধ ভাঙ্গিয়া যুবকেরা দলে দলে তাঁহাব পদতলে আসিয়া লুপ্তিত। নাগরিকেরা গৌতমের শিষ্যদের এইরূপ বিক্রম আরম্ভ করিল—

রাজগৃহে আইলেন গুরু মহাশয়,  
আসিয়া পর্বত-চূড়ে বাঁধেন আশয়;  
সঙ্ঘের শিষ্য সবে বুদ্ধি-বৃহস্পতি,  
কোথায় কে গেল চলে, হায় কি দুর্গতি!

ইহার উত্তরে গৌতম-শিষ্যেরা বলিতেন—

ধর্মবীর বুদ্ধ যিনি, সত্য তাঁর একমাত্র বল।  
তাঁহার কি দোষ ভাই, মহিমা এ সত্যেরি কেবল।

এইরূপ শাক্যপক্ষীয় ও প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলিত, তা ভিন্ন আর কোন গুরুতর দ্বন্দ্ব বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই। বুদ্ধ এই বাগবিতণ্ডার ব্যাপার শুনিয়া কহিলেন—

ভয় নাই, এ বিবাদ অধিক দিন স্থায়ী হইবে না, এক সপ্তাহের মধ্যেই সব গোল মিটিয়া যাইবে । ফলে তাহাই হইল ।  
( মহাবগ্গ )

বুদ্ধের যে কি আকর্ষণী শক্তি ছিল, তিনি নগরে গ্রামে বনে উপবনে যেখানে যাইতেন তাঁহার দর্শনার্থে, তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে কাঁকে কাঁকে লোকেরা আসিয়া উপস্থিত হইত । অবন্তী প্রদেশে সোন নামক এক ভক্তের কথা শুনা যায়, ঐ দূর দেশে গৌতমের নাম তাঁহার প্রতিগোচর হইয়াছে, ও তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল । একবার বিরলে বসিয়া তিনি ভাবিলেন, “আমি ভগবান বুদ্ধের নাম শুনিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে কখন চাক্ষুষ দেখি নাই । আমার গুরুর আদেশ পাইলে আমি একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসিব ।” গুরুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন, “যাও, গিয়া ভগবানের শ্রীচরণ দর্শন কর । তিনি আনন্দের উৎস, মধুরভাষী, সংযমী, জিতে-দ্রিয়, তাঁহার দর্শনে বহু পুণ্য উপার্জন হইবে ।” কিন্তু সোনের দীক্ষাবিধি অনুষ্ঠানের জন্য ১০ জন ভিক্ষু উপস্থিত থাকা আবশ্যিক—তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া অনেক কষ্টে এই দশজন ভিক্ষু সংগ্রহপূর্বক সোন শ্রাবস্তী যাত্রা করিলেন, এবং জেত-বনে গিয়া বুদ্ধদেবের সন্নিক্ষানে উপনীত হইলেন ।

এই সকল ভক্ত বুদ্ধের আশ্রমে আকৃষ্ট হইত, ইহা অপেক্ষাও উচ্চ দলের লোক তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিত । বুদ্ধ যখন কোন প্রখ্যাত নগরে বা কোন রাজার রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তখন রাজা, নাগরিক, বড় বড় লোকেরা কেহ

রথে, কেহ গজপৃষ্ঠে, তাঁহার উপদেশ শ্রবণার্থ সমাগত হইতেন । ‘সন্ন্যাস ধর্ম’ নামক বৌদ্ধগ্রন্থের ভূমিকায় আমরা এইরূপ একটা চিত্র দেখিতে পাই । এইরূপ লিখিত আছে যে, একরাতে মগধরাজ অজাতশত্রু তাঁহার প্রাসাদের ছাদে সচিবসহ উপবিষ্ট হইয়া শরতের জ্যোৎস্না উপভোগ করিতেছেন । আহা ! সে জ্যোৎস্না কি সুন্দর, কি মনোহর ! এই মধুর যামিনীতে সহসা রাজার মনে ধর্ম্যভাব উদ্দীপ্ত হইল । তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ শ্রমণের মধ্যে এমন সদগুরু কে আছেন, যিনি আমার মনের স্পৃহা পূর্ণ করিতে পারেন । মন্ত্রীরা কেহ একজনের নাম, কেহ অপরের নাম করিলেন । পরে রাজবৈद्य জীবকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কহিলেন— “ভগবান বুদ্ধ শিষ্য সমভিব্যাহারে আমার আশ্রমে বিশ্রাম করিতেছেন, তিনশত ভিক্ষু তাঁহার সচর । ত্রিজগতে তাঁহার নাম কীর্তিত—তিনি সর্বশাস্ত্র-বিশারদ, সুরনব-গুরু, মহাজ্ঞানী বুদ্ধদেব । তাঁহার দর্শনে চলুন, তাঁহার উপদেশ শ্রবণে মহারাজ প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই ।” রাজা তখনি হস্তীসজ্জা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিয়া বাণীদের সঙ্গে সেই মধুময় জ্যোৎস্না রাতে রাজগৃহদ্বাৰ দিয়া জীবকের আশ্রমে উপনীত হইলেন ।

অনন্তর রাজা কৃতাজলীপুটে ভগবান বুদ্ধ এবং উপস্থিত শিষ্যমণ্ডলীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন । তিনি বলিলেন, “ভগবান বুদ্ধদেবের আদেশ হইলে আমি কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি ।”

“মহারাজ ! আপনার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ।”

প্রশ্ন—“ও দেব ! সংসারে নানা শ্রেণীর লোক কাজ করিয়া থাকে, গার্হস্থ্য আশ্রমের ধর্মের পুরস্কার ইহজীবনেই লক্ষিত হইতেছে ; কিন্তু সন্ন্যাস আশ্রমের কোন পুরস্কার কিংবা লাভ আপনি এরূপ দেখাইতে পারেন কি, যাহার ফল ইহজীবনেই ভোগ করা যায় ?”

বুদ্ধদেব বলিলেন—“মহারাজ ! আপনি কি এই প্রশ্ন আর কোন সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণের নিকট উপাধন করিয়া-ছিলেন ?”

রাজা পাঁচ ছয় জন ধর্মোপদেষ্টার নাম করিলেন, যথা—  
পুরণ কাশ্যপ, মন্দবী গোশাল, অজিত, কেশকম্বল, ককুধকাত্যায়ন, নিগ্রন্থনাথপুত্র ও বেলাস্থপুত্র সঞ্জয় । “কিন্তু তাহারা কেহই কোন সম্ভাষণজনক উত্তর দিতে পারেন নাই । এক্ষণে ভগবন্ ! আপনাকে আমি সেই প্রশ্ন করিতেছি ।”

পরে বুদ্ধদেব নিম্নলিখিত প্রকারে সন্ন্যাস-ধর্মের ফলাফল বিষয়ে উপদেশ দিলেন ।

“মহারাজ ! আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি, কিন্তু তৎপূর্বে আপনাকে একটি প্রশ্ন করিব ।

মহারাজ ! আপনার দাসগণ প্রত্যাশে শয্যা হইতে উত্থান করিয়া প্রাণান্ত পরিশ্রমে আপনার সেবা করিয়া থাকে ।

তাহারা পরিশ্রম স্বীকার করে, কিন্তু আপনি সমস্ত সুখ সম্ভোগ করেন। ইহাদের মধ্যে যদি একজন মনে করে অপরের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? সে যদি গৈরিক বসন পরিধান করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, যদি তাহার সন্ন্যাসের খ্যাতি প্রচারিত হয়, এবং যদি আপনি শুনিতে পান যে আপনার ভৃত্যগণের মধ্যে একজন সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করিয়া নির্জনে সামান্ত আহারে সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়-সংযম অভ্যাস করিতেছে, তখন কি আপনি তাহাকে পূর্ববৎ দাসবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধা করিবেন?”

রাজা—কখনই না। বরং তাহার সহিত দেখা হইলে আমি আসন হইতে উঠিয়া তাহাকে সন্মান দেখাইব, তাহার সেবাশুশ্রূষার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিব।

—এরূপ হইলে মহারাজ, আপনাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে সন্ন্যাস-ধর্মের কিছু ফল ইহজীবনেই লাভ করা যাইতে পারে।

—হাঁ ভগবন! তাহা স্বীকার্য, কিন্তু ইহা ছাড়া আর কোন ফলের বিষয় আপনি বলিতে পারেন কি?

তখন বুদ্ধদেব সন্ন্যাস-ধর্মের হাতে হাতে আরও অশেষ প্রকার ফললাভ হয়, যথা—আত্মসংযম, জীবনের পবিত্রতা সাধন, পূর্বজন্ম-স্মৃতি অর্জন ইত্যাদি একে একে বুঝাইয়া বলিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন—

! “মুক্ত-সন্ন্যাসীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানলাভ হয়, তিনি বস্তু ও জীবের

স্বরূপ দর্শন করেন । কোন্ ব্যক্তি কি কর্ম করিতেছে এবং তাহার কি প্রকার অবশ্যস্বাভাবী ফল ভোগ করিতে হইবে, তিনি তাহা প্রত্যক্ষবৎ বুঝিতে পারেন । যেরূপ, মহারাজ ! প্রাসাদ-শিখরে দাঁড়াইয়া কেহ নিম্নে জলস্রোতের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পায় লোকগণ কে কি ভাবে কাজ করিতেছে, কে আসি-তেছে, কে কোন পথে যাইতেছে, ইত্যাদি । মুক্ত-সন্ন্যাসী কামনার পরিণতি প্রথম দর্শনেই দেখিতে পান । কোন্ কামনার পরিণাম বিষময়, কোন পথ কণ্টকময়, কোন কামনার দ্বারা উদ্বিগ্ন ও অনর্থের সৃষ্টি হয়, কোন্ কাম্যের দ্বারা উহা নিবারিত হয় । তাহার বর্তমান কামনা, ভবিষ্যৎ কল্পনা ও অজ্ঞানজনিত মোহ—এই ত্রিবিধ কষ্টের কারণ একেবারে দূর হইয়া যায় । ঐদৃশ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া জ্ঞানময়, পরম আনন্দপূর্ণ জীবন লাভ করিয়া চিরশান্তি উপভোগ করে ।” )

ভগবান বুদ্ধ এইভাবে উপদেশ প্রদান করিলে অজাতশত্রু বলিলেন—“আপনার উপদেশে আমার সকল সংশয় দূর হইল । যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা প্রকাশিত হইল । পথহারা পথিককে পথ দেখাইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ, ভগবন্ ! আপনি নানা উজ্জ্বল বিচিত্র উপমার দ্বারা আমাকে সত্যের পথ দেখাইলেন । এখন হে দেব ! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে আশ্রয়-দানে যেন ক্রটি না হয় । ভগবন ! আমাকে আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করুন । আমি যাবজ্জীবন আপনাতে অনুরক্ত থাকিব । আমি মহাপাপী, মলিনতাপূর্ণ এবং ঘোর অজ্ঞানাচ্ছন্ন । আমি রাজ্যলাভের জন্য আমার পরম পূজনীয়, সাক্ষাৎ ধর্মের অবতার



স্বরূপ পিতৃদেবকে ততঃ করিয়াছি । তিনি পরম ধর্মনিষ্ঠ, ন্যায়-পরায়ণ নৃপতি, এবং অতি উদার-চরিত দেবসদৃশ ব্যক্তি ছিলেন । আমার মত নরাধমকে আশ্রয় দান করুন, যেন ভবিষ্যতে আর আমি পাপ করিতে না পারি ।

—মহারাজ ! তুমি পাপাসক্ত হইয়া একরূপ কাণ্ড করিয়াছিলে, কিন্তু এখন ইহা পাপ মনে করিতেছ, এবং সর্বদসমক্ষে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ না, তখন আমরা তোমাকে গ্রহণ করিতে পারি । কারণ যে ব্যক্তি পাপকে পাপ বলিয়া মনে করিয়াছে, সে ভবিষ্যতে আর পাপ করিতে পারে না ।”\*

এই সমস্ত বর্ণনা হইতে আমরা বুদ্ধদেবের জীবন-চিত্র কতকটা মনে আনিতে পারি । তিনি কোন নগরের সন্নিকটে হইলে রাজা প্রজা ছোট বড় সকলেই তাঁহার দর্শন আশে কুঁকিয়া পড়িত । কুশীনগরে মল্লেরা, বৈশালীর লিচ্ছবি যুবক-গণ তাঁহার দর্শনার্থে সমাগত, তার সঙ্গে অম্বপালী গণিকাও ফেলা যায় না । উপদেশ সমাপ্ত হইলে বুদ্ধের ভক্তমণ্ডলী পরদিন তাঁহাকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিত । মধ্যাহ্নে আহার প্রস্তুত হইলে গৃহস্বামী বলিয়া পাঠাইতেন যে ভোজন প্রস্তুত, তখন বুদ্ধ তাঁহার বসনত্রয় পরিধানপূর্বক ভিক্ষাপাত্র হস্তে গম্যস্থানে উপস্থিত হইতেন । তথায় সুন্দাদ অন্নব্যঞ্জন যাহা কিছু প্রস্তুত হইত, গৃহকর্ত্রীই পরিবেশন করিতেন । আহারান্তে

\* শ্রামণ্যকল-সূত্র

সূত্র-পিটক ( বুদ্ধের উপদেশমালা )

দীঘ-নিকায়ে

শ্রাবকবর্গ দলবলে বুদ্ধপার্শ্বে উপবিষ্ট হইতেন, ও তাঁহার উপদেশামৃত পান করিয়া আনন্দমনে স্র স্র গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন ।

যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে বুদ্ধদেব বর্ণাশ্রম ধর্মের উপর আস্থাশূন্য ছিলেন, প্রত্যুত ব্রাহ্মণ শূদ্র আর্ষ্য স্নেহে নিবিবিশেষে ধর্ম ও সজ্জ্যে সর্বজাতির সমান অধিকার ঘোষণা করিতেন, তথাপি কার্যতঃ দেখা যায় বুদ্ধের প্রথম শিষ্যমণ্ডলী প্রায় সকলেই উচ্চকুলোদ্ভব । বুদ্ধ তিনি নিজে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যও উচ্চকুলজাত । তাঁহার নবোপার্জিত শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে যে-সকল নাম দেখা যায় তাহা—

সারীপুত্র, মুগ্ধলপুত্র, কাশ্যপ, ব্রাহ্মণসন্তান ।

আনন্দ, দেবদত্ত, বুদ্ধের আত্মীয় ; রাজল তাঁহার পুত্র ।

অনিরুদ্ধ, রাজা শুক্লোদনের ভ্রাতৃপুত্র ।

যশ বণিকসন্তান, তাঁহার কুলমর্যাদা কম মনে হয় না ।

তুই একজন নীচবর্ণও দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, যেমন উপালী—

কিন্তু উপালী নিতান্ত সামান্য লোক নহেন, তিনি রাজনাপিত ।

সারীপুত্র ও মুগ্ধলায়ন, এই দুই ব্রাহ্মণ শিষ্য বুদ্ধের প্রথম শিষ্যদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ । তাঁহারা বুদ্ধদেবের প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত ভক্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন । সারীপুত্র তাঁর সজ্জের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং বৌদ্ধধর্মের ভূষণস্বরূপ গণ্য ছিলেন । আনন্দ তাঁহার প্রিয় শিষ্য, আমরণ গুরুসেবায় নিযুক্ত ছিলেন । বুদ্ধের শেষ বয়সের ঘটনাবলী

আনন্দের সহিত জড়িত, ও তাঁহার অন্তিমকালের শেষ উপদেশ আনন্দকে সম্বোধন করিয়াই প্রদত্ত হয়। উপালীও বৌদ্ধ শাস্ত্রপ্রণেতা বলিয়া বৌদ্ধ সমাজে খ্যাতি লাভ করেন। বুদ্ধের শ্যালক দেবদত্তের সহিত আপনারা কতক পরিচিত আছেন; তিনি স্বীয় গুরুর বিরুদ্ধে যে-সমস্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পূর্বেই কিছু কিছু বলা হইয়াছে।

অতঃপর বুদ্ধের অনেক গৃহস্থ শিষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা গৃহ সম্পত্তি পরিবারে পরিবৃত থাকিয়াও বৌদ্ধ সঙ্ঘে দানাদি অনুষ্ঠানে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ভিক্ষুদের পার্শ্বে এই সমস্ত ধর্মশীল গৃহস্থেরা দণ্ডায়মান ছিলেন। ভিক্ষুদেব নিকট হইতে তাঁহারা উপদেশ গ্রহণ করিতেন, ও তাহার বিনিময়ে অন্ন দান, ভূমি-দান দ্বারা ভিক্ষু সমাজ পোষণ করিতেন। এই সকল ভক্তের মধ্যে মগধাধিপতি বিম্বিসার ও কোশলেশ্বর প্রসেনজিৎ ( পশেনদী ) পরিগণিত হইতে পারেন। বিম্বিসারের রাজবৈद्य জীবক—তিনি শুধু রাজ-পরিবারের বৈद्य ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু বুদ্ধ ও বৌদ্ধ-সঙ্ঘের চিকিৎসাকারও তাঁহার হস্তে সমর্পিত ছিল। তাহা ছাড়া অনাথপিণ্ড বণিক, ষাঁহার অনুগ্রহে বৌদ্ধ সঙ্ঘ বুদ্ধদেবের প্রিয় শাস্ত্র-নিকেতন জেতবন উপার্জন করেন; বুদ্ধদেব প্রচারে পরিভ্রমণ কালে এই সমস্ত গৃহস্থ শিষ্য সংগ্রহ করিতেন। ভিক্ষাদান, ভূমিদান, গৃহ ও উদ্ভানে সভার আয়োজন, এইরূপে তাঁহারা ভিক্ষু দলের আতিথ্যসংকারে নিযুক্ত থাকিয়া বিবিধ উপায়ে ধর্মপ্রচারে সহায়তা করিতেন।

ধর্মপ্রচার ।—

ভারতের প্রাচীন ধর্ম যে-সমস্ত কুসংস্কার জালে আচ্ছন্ন হইয়াছিল তাহা ফেলিয়া দিয়া, সেই ধর্মের যে সত্য সুন্দর মধুর ভাব তাহা রক্ষা করিয়া, বাহ্যাড়ম্বর বাদ দিয়া ধর্মের সহজ সত্যসকল আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করিয়া, সমুদায় ভারতবাসীকে মৈত্রীবন্ধনে বদ্ধ করিয়া, বুদ্ধদেব সরল সহজ ভাষায় জাতিকুলনির্বিশেষে আপামর সাধারণ জনপদের মধ্যে তাঁহার ধর্ম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করিলেন । তাঁহার কর্মক্ষেত্র প্রয়াগের পূর্ব, গোড়ের পশ্চিম, হিমালয়ের দক্ষিণ ও গন্দোয়ানার উত্তর, এই চতুঃ-সীমার মধ্যবর্তীস্থল—অযোধ্যা, মিথিলা, বারাণসী, মগধ, এই সমস্ত রাজ্য । তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার হস্তের বীজ লইয়া দেশ-দেশান্তরে ছড়াইবার জন্ত বাহির হইলেন ।

হিন্দুধর্ম প্রচার-সুলভ বিশ্বজনীন ধর্ম নহে । হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ না করিলে হিন্দু হওয়া যায় না—এমন কি হিন্দুসমাজ বর্ণাশ্রম ধর্মের কঠোর নিয়মে আটেঘাটে এমনি বদ্ধ যে, যে ব্যক্তি যে বর্ণে জন্মিয়াছে সে কোন উপায়েই তাহার বাহিরে যাইতে পারে না, এবং স্ববর্ণের গণ্ডীর ভিতর অশ্রমে গ্রহণ করিতেও অপারক । তাহা ছাড়া, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা ও উপদেশ উচ্চ বর্ণেই আবদ্ধ । সে শিক্ষা সর্ব জাতির সাধারণ সম্পত্তি নহে, উচ্চ বর্ণের একচেটিয়া—শূদ্রাদি হীনবর্ণ তাহা হইতে বঞ্চিত । বৌদ্ধধর্ম ইহার ঠিক বিপরীত । বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে যেমন স্বধর্ম পালনের উপদেশ দিতেন,

সেইরূপ দেশ বিদেশে বিভিন্ন জনপদের মধ্যে সেই ধর্ম প্রচারেও উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার উপদেশানুসারে ভিক্ষুদল দেশ দেশান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া বৌদ্ধধর্ম-বীজ বপনে প্রাণপণে সচেষ্ট হইলেন।

যক্ষ-রক্ষা-দমন।—

বুদ্ধদেবের ধর্ম প্রচার কালে মধ্যে মধ্যে তাঁহার অসাধারণ বশীকরণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কপিলবাস্তু হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বুদ্ধদেব ক্ষেতবন বিহারে কিছুদিন বাস করেন। আলাবি নামক নিকটস্থ একটি গ্রামে এক নৃশংস যক্ষ বাস করিত। একদিন বুদ্ধ সেই লোকটিকে দেখিবার জন্য সেখানে গেলেন। তখন তাঁহাকে অন্তর্ধান করা দূরে থাকুক, তাঁহার উপর অকারণে সে তীব্র কটুকাটব্য বর্ষণ করিতে লাগিল। বুদ্ধদেব তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সাধু ব্যবহারে তাহাকে বশ করিলেন। পরে যক্ষ একটু শান্ত হইয়া তাঁহাকে বলিল—হে শ্রমণ! আমি তোমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিতে চাই, তাহার সন্তুষ্টির দিতে পারত ভাল, নতুবা তোমাকে এই জলে ডুবাইয়া প্রাণে বধ করিব। বুদ্ধ তথাস্তু বলিয়া সেই সকল প্রশ্নের যথোচিত উত্তর প্রদান করিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিলেন। সেই অবধি সে তাঁহার পদানত দাস হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল, এবং ক্রমে তাঁহার সজ্জভুক্ত হইয়া শুদ্ধাচারী সন্ন্যাসীরূপে সুখ্যাতি লাভ করিল। লোকেরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া

স্তুতিত হইয়া গেল । বুদ্ধদেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি জিজ্ঞাসুদিগকে কি বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন কোন গ্রন্থে তার স্পষ্ট উল্লেখ নাই, কিন্তু তাহার বাণী আমার কাণে যাহা বাজিতেছে, তাহা এই :—

“আমি অতিথি হইয়া যক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইলাম, আমার আতিথ্য সংকার করা কি তাহার কর্তব্য ছিল না ? তাহা না করিয়া সে কুৎসিত গালিমন্দ দিয়া আমাকে অভিবাদন করিল । সংকারের বদলে তিরস্কার, যেখানে বহুমান দেওয়া উচিত, সেখানে অপমান । আমি সেই অপমান অকাতরে মাথায় তুলিয়া লইয়া শিক্ষাচারে ও সদুপদেশ প্রদানে তাহাকে বশে আনিলাম । সেই অবধি সে আমার শিষ্য হইয়া গ্রহণ করিয়া সাধু সন্ন্যাসীর মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল । ‘অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করিবেক’—এই যক্ষের জীবনে তোমরা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপলব্ধি করিলে । আমার এই উপদেশ অনুসরণ করিয়া চলিলে তোমাদেরও মঙ্গল হইবে ।” গ্রামবাসীগণ বুদ্ধের কথায় প্রীত হইয়া ঐ স্থানে এই আশ্চর্য ঘটনার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এক অপূর্ব বিহার নির্মাণ করিয়া দিল ।

আর একটি ঘটনার এইরূপ বর্ণনা আছে—তাহা অঙ্গলি-মালকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ।

এই লোকটি কোশলের রাক্ষসতুল্য এক দুর্দান্ত ব্যক্তি; চুরি ডাকাতি নরহত্যা করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত । বুদ্ধদেব নির্ভীকচিত্তে অঙ্গলের মধ্যে তাহার কোটরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ধীর নম্রভাবে তাহাকে সদুপদেশ দিয়া

তাহার উদ্ধৃত উগ্র স্বভাবের পরিবর্তন সাধন করিলেন। সেই রাক্ষস দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অল্পকাল মধ্যে অর্হৎ মণ্ডলীতে স্থান লাভ করিল। এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শন করিয়া তাহার আত্মীয়স্বজনবর্গ চমকিত হইল। সঙ্কল্প গ্রহণের ফলে কিরূপে মনুষ্যের চরিত্র শোধন হয়, বুদ্ধদেব তাহা লোকদিগকে বুঝাইয়া বলিলে তখন তাহাদের প্রতীতি জন্মিল।

নন্দের দীক্ষা গ্রহণ।—

বুদ্ধদেব কপিলবস্তুরে গিয়া প্রথমে তাঁহার পুত্র রাহুলকে দীক্ষা দান করিলেন, পরদিবস তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের প্রত্নজ্যা গ্রহণের পালা আসিল। সেদিন নন্দের যৌবরাজ্যে অভিষেক, ও ‘জনপদ-কল্যাণী’ নামক একটি লোকপ্রথিতা সুন্দরীর সহিত বিবাহ স্থির হইয়াছিল। গুরুদেব গৃহে প্রবেশ করিয়া নন্দকে নগরের বাহিরে এক বটবৃক্ষ তলে লইয়া গিয়া, তাহাকে যথানিয়মে স্বধর্ম্মে দীক্ষা দান করিলেন। কন্যা ব্যাকুল অন্তরে বরাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু বর আর বাড়ী ফিরিলেন না। পরে শুনা গেল, নন্দ তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সন্ন্যাসী শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন—সকলি ভাগিয়া গেল।

সুপ্রবুদ্ধ।—

গুরুদেব তাঁহার চতুর্দশ বর্ষা জেতবনে যাপন করেন, তথায় রাহুল তাহার ২০ বৎসর বয়ঃক্রমে উপসম্পদা দীক্ষা গ্রহণ করে। সেই বৎসর তিনি কপিলবস্তুরে পুনর্দর্শন করিতে যান।



দেবদত্তের শ্যায় বুদ্ধদেবের আর এক গৃহশত্রু ছিল—  
 তাহার শশুর সুপ্রবুদ্ধ। কপিলবাস্তুতে প্রবাস কালে বুদ্ধদেব  
 সুপ্রবুদ্ধ কর্তৃক সাতিশয় অবমানিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব  
 নগরের বহিরস্থানে এক বটবৃক্ষ তলে অবস্থিতি করিতেছিলেন,  
 এমন সময়ে তাহার আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া সুপ্রবুদ্ধ তাহাকে  
 যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হয়। তথাগত ভিক্ষায়  
 বাহির হইবেন শুনিয়া সেই পাষণ্ড মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া  
 তাহার পথ রোধ করিতে আসে, ও তাহার উপরে বিস্তর  
 কটুকাটব্য বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। গুরুদেব আনন্দের  
 দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—দেখ, লোকটার  
 আসন্নকাল উপস্থিত; এক সপ্তাহের মধ্যে পৃথিবী ইহাকে  
 গ্রাস করিয়া ফেলিবে। সুপ্রবুদ্ধ এই কথায় ঈষৎ হাস্ত  
 করিয়া মনে মনে ভাবিল, আমি সপ্তাহকাল আমার প্রাসাদের  
 স্তম্ভোপরি দিনপাত করিব, দেখা যাক পৃথিবী আমাকে  
 কেমন করিয়া গ্রাস করে। সেই দুরাত্মা ভাবে নাই যে  
 দুরাচারীর কোনখানেই নিস্তার নাই, তাহার পাপের  
 দণ্ডভোগ অবশ্যম্ভাবী। ফলে তাহাই হইল। সপ্তম দিবসে  
 পৃথিবী তার পদতলে বিদীর্ণ হইয়া গেল, এবং তাহার  
 অপরাধের দণ্ড স্বরূপে তাহাকে ‘অবীচি’ নরককুণ্ডে নিক্ষেপ  
 করিল।\*

---

\*বুদ্ধের পঞ্চ বিদ্রোহীর মধ্যে সুপ্রবুদ্ধ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল—  
 অপর চারিজন দেবদত্ত, নন্দ, যক্ষ নন্দক, এবং চিঞ্চা।

বুদ্ধদেব ও ব্রাহ্মণ ভারদ্বাজ ।—

ধর্ম প্রচারেব একাদশ বর্ষে ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে বস্যা  
যাপন করিতেছিলেন। একদা তিনি নিকটবর্তী একনালা গ্রামে  
গিয়া ভারদ্বাজ নামক এক ধনশালী ব্রাহ্মণকে দেখিতে পান।  
দেখেন যে ভারদ্বাজ তাঁহার শস্ত্রক্ষেত্রে কৃষিকার্যের তদ্বাবধান  
করিতেছেন। ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে দেখিয়া কক্ষমন্দরে বলিলেন,  
“হে গৌতম! আমি কৃষক। লাঙ্গল ধরিয়া, বীজবপন  
করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করি। তুমিও লাঙ্গল ধর, বীজ  
বপন কর, অনায়াসে আহাৰ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে।”  
বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, “হে ব্রাহ্মণ! আমিও কৃষিকার্য করি,  
বীজবপন করিয়া আহাৰ্য সংগ্রহ করি।”

—কি আশ্চর্য! তুমি বলিতেছ তুমি শ্রমজীবী কৃষক,  
অথচ তোমার বৃষ লাঙ্গল নাই, বন্ধনরজ্জু নাই, অক্ষুশ, যুগকাষ্ঠ  
এ সব কিছুই দেখিতেছি না।

—শ্রদ্ধাই আমার বীজ, সেই বীজ আমি সর্বত্র বপন করি :  
কর্মোদ্ভূত আমার বৃষ্টির জল : প্রজ্ঞাই আমার লাঙ্গল, আমি সেই  
লাঙ্গল চালনা করিয়া অজ্ঞান-কণ্টক মোচন করি। মন আমার  
বন্ধনরজ্জু, মনের একাগ্রতা আমার দণ্ড ও অক্ষুশ। সত্য দ্বারা  
আমি লোকসকলকে বন্ধন করি, এবং মায়ামমতা দ্বারা আমি  
বন্ধন মুক্ত করি। বীৰ্য্যই আমার চাষের বৃষ। আমি কৃষি  
করিয়া যে ধান্য আহরণ করি, তাহা দুঃখাস্তকারী নির্বাহণ।”

ভারদ্বাজ বুদ্ধের এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সম্প্রদায়-  
ভুক্ত হইলেন।

বৈশালীতে মহামারীর উপদ্রব ।—

তথাগতের বুদ্ধদেব প্রাপ্তির তৃতীয় বর্ষায় যখন তিনি রাজগৃহে অবস্থিত করিতেছিলেন, সেই সময়ে বৈশালী হইতে তাঁহার নিকট লিচ্ছবী নাগরীকদের এক দোতা প্রেরিত হয় । দূত বিনীত ভাবে নিবেদন করিল, “ভগবন্ ! ভয়ঙ্কর মহামারীর উপদ্রবে আমাদের নগর চারখার হইয়া যাইতেছে । আমরা অনেকানেক উপাখ্যায়ের নিকট গিয়া বহু প্রকার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই পীড়ার উপশম হয় না । প্রভু, আপনার পদধূলি দিয়া আমাদের দেশ রক্ষা করুন” । বুদ্ধদেব বলিলেন, “রাজার অনুমতি হইলে আমি যাইতে পারি” । রাজা বিম্বিসার এই প্রস্তাবে দ্বিরাঙ্কিত করিলেন না, কেবল বলিলেন, “আমি আমার রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত ভগবান বুদ্ধকে পৌঁছিয়া দিব, পরে তোমরা তাঁহার যথাযোগ্য আতিথ্য-সৎকার করিবে” । এই বলিয়া রাজধানী হইতে গঙ্গার দক্ষিণ পার পর্য্যন্ত যে পথ চলিয়াছে তাহা প্রশস্ত, সুসজ্জিত ও পুষ্পমালা এবং রঙীন পতাকা দিয়া সুসজ্জিত করিয়া দিলেন, এবং স্বয়ং, মন্ত্রী, সভাসদ, পরিজনবর্গ সহ গিয়া তাঁহাকে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিলেন । গঙ্গা পার হইবামাত্র লিচ্ছবীগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বহু সমারোহে রাজধানীতে লইয়া গেল । বুদ্ধদেব ঐ প্রদেশে পদার্পণ করিতে না করিতেই রোগের অপদেবতাগণ দূরে পলায়ন করিল, এবং নগরবাসীদের মধ্যে যাহারা উৎকট পীড়ায় জর্জরিত হইয়াছিল, তাহারা প্রকৃতিস্থ হইয়া বুদ্ধের জয়জয়কার করিতে লাগিল । বুদ্ধদেব নগরে প্রবেশ করিয়া রত্নসূত্র হইতে পদাবলী

আবৃত্তি করিলেন এবং অনেকগুলি শিষ্য সংগ্রহ করিয়া লইলেন। অনন্তর বহুবিধ মূল্যবান উপহার সামগ্রী গ্রহণ করিয়া রাজগৃহে ফিরিয়া গেলেন। লিচ্ছবীরা নগরের কৃটাগারশালা তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া দিল, এবং আরো অনেক বহুমূল্য উপহার দিয়া যথোচিত সম্মান-সহকারে বিদায় করিল।\*

### জীবক ।--

বিশ্বিসারের পুত্র অভয়ের ঔরসে শালবতী নাম্নী গণিকার গর্ভে রাজগৃহে জীবকের জন্ম হয়। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক একজন সুনিপুণ চিকিৎসক ছিলেন। রাজগৃহ, উজ্জয়িনী, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে চিকিৎসা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। ঐ সময়ে ভারতে চিকিৎসা-শাস্ত্রের বিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা মহাবগ্গে বর্ণিত জীবক-চরিত হইতে কতক পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারা যায়। পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারিবেন না—এই আশঙ্কা করিয়া তিনি কোন এক উচ্চাঙ্গ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবেন, এইরূপ স্থির করেন। তদনুসারে তক্ষশীলায় গমন করিয়া তত্রত্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আয়ুর্বেদের অধ্যাপক আত্রয়ের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন। অধ্যাপক জীবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি আমাকে কত করিয়া বেতন দিতে পারিবে” ? জীবক উত্তর করিল, “মহাশয়, কাহাকেও না বলিয়া আমি গৃহ হইতে পলাইয়া আসিয়াছি, আপনাকে দিবার মত আমার নিকট একটি

কপর্দকও নাই। শিক্ষা সমাপন করিয়া আমি চিরজীবন আপনার দাস হইয়া থাকিব”। অধ্যাপক জীবকের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া উহাকে চিকিৎসা-শাস্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। জীবক ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তখন অধ্যাপক তাহার অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, “এই বিদ্যালয়ের চতুর্দিকে ষোল মাইলের মধ্যে যে সকল লতা ও বৃক্ষ আছে, উহার মধ্যে যেগুলি চিকিৎসায় প্রয়োজন হয় না, সেইগুলি অনুসন্ধান করিয়া আন”। চারিদিন পরে জীবক অধ্যাপকের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “মহাশয়, ঔষধে প্রয়োজন হয় না, এমন লতা পাইলাম না”। অধ্যাপক প্রীত হইয়া জীবককে গৃহে যাইতে অনুমতি করিলেন। জীবক মগধে প্রত্যাবর্তন কালে একদিন শাকেত ( অযোধ্যা ) রাজ্যে অবস্থিত করেন। তথায় কোন রমণীর ঘোর শিরঃপীড়া হইয়াছিল। জীবক একটু মাখন উত্তপ্ত করিয়া উহার সহিত একটি ঔষধ মিশ্রিত করেন, এবং উক্ত রমণীকে এই মিশ্রিত দ্রব্যের নম্ন লইতে বলেন—তাহাতেই তাহার শিরঃপীড়ার শাস্তি হইল। রাজগৃহে আসিয়া জীবক রাজা বিশ্বিসারকে কোনও দুশ্চিকিৎসু রোগ হইতে মুক্ত করিয়া বহু ধনরত্ন পুরস্কার পাইয়াছিলেন। বারাণসী এবং উজ্জয়িনীতেও তিনি অনেকের চিকিৎসা করেন। রাজগৃহে অস্ত্র-চিকিৎসাতেও তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন।

তথাগতের বুদ্ধত্ব লাভের বিংশতি বৎসর পরে জীবক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। বুদ্ধদেব তাঁহার চিকিৎসায় অনেক সময়

উপকার পাইতেন। এক সময়ে বুদ্ধের আশায় রোগ জন্মে ; জীবক একটি পদ্মপুষ্পের মধ্যে ঔষধ রাখিয়া তাঁহাকে সেবন করিতে বলেন, উহাতেই তিনি আরোগ্য লাভ করেন। আর একবার বুদ্ধ অসুস্থ হইলে, জীবক পদ্মের মধ্যে কিঞ্চিৎ ঔষধ রাখিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিবার ব্যবস্থা দেন ; এই চিকিৎসাতেই তিনি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হন। বুদ্ধকে সেবা শুশ্রূষা করিবার সুযোগ হইবে, এই আশায় জীবক স্বীয় উদ্যানে একটি বিহার নির্মাণ করেন। ঐ বিহার তিনি বুদ্ধকে উপহার দিয়াছিলেন।

একদা মগধে কুষ্ঠ, ধবল, অপস্মার প্রভৃতি পঞ্চবিধ রোগের উপদ্রব হইয়াছিল। রোগীরা দলে দলে জীবকের নিকট গমন করিয়া চিকিৎসা প্রার্থনা করায় জীবক বলিলেন, “আমার হাতে অনেক কাজ, আমি রাজা বিশ্বিসারের গৃহ-চিকিৎসক। বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের চিকিৎসার ভার আমার উপর, আমার সময় নাই। আমি আপনাদের চিকিৎসা করিতে পারিব না”। রোগীরা ভাবিল আমরা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়া ভিক্ষুশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করি—তাহা হইলে ভিক্ষুগণ আমাদের পরিচর্যা করিবেন, আর জীবক আমাদের চিকিৎসক হইবেন। এইরূপ স্থির করিয়া ঐ সকল লোক দীক্ষা গ্রহণ করিল। পরে উহারা সারিয়া উঠিয়া ভিক্ষুধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক সংসারাশ্রমে ফিরিয়া গেল। জীবক তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে তাহারা উত্তর করিল, “এক্ষণে আমরা সুস্থ সবল হইয়াছি, আর আমাদের ধর্মসাধনের প্রয়োজন নাই”। জীবক বুদ্ধের নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন

করিলেন । বুদ্ধদেব তাহা শুনিয়া ভিক্ষুদের ডাকিয়া আদেশ করিলেন, “তোমরা কুষ্ঠ, ধবল, যক্ষ্মা, এই সকল মহাব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে দীক্ষা দান করিবে না” ও তদনুসারে ব্যবস্থা করিয়া দিলেন । (বৌদ্ধধর্ম—সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণীত—পৃঃ ১৬৬—১৭০) ।





## নবম পরিচ্ছেদ ।

অশোক ।

"অশোক খৃষ্টপূর্ব ২৭২-৭৩ অব্দে মগধের রাজ-সিংহাসন অধিকার করেন, এবং প্রায় চল্লিশ বৎসর নিরাপদে রাজত্ব করিয়া, ধর্ম্মাশোক নামে জগতে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান । সিংহাসন প্রাপ্তির চার বৎসর পরে তাঁহার রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় । তাঁহার রাজত্বের প্রথম তের বৎসরের ইতিবৃত্ত একপ্রকার গভীর ভিমিরাচ্ছন্ন, তাহার কিছুই জানা যায় না । পরে যখন তাঁহার শিলালেখ্যসকল স্থানে স্থানে উৎকীর্ণ হইতে আরম্ভ হয়, তখন হইতে আমাদের অশোক-যুগের জ্ঞানলাভের সুযোগ হয় । তাঁহার এই শিলা ও স্তম্ভগাত্রে খোদিত অনুশাসনগুলি ভারতের নানা প্রদেশে বিক্ষিপ্ত থাকায় তাঁহার কীর্ত্তিসকল অছাবধি সজীব আছে । বৌদ্ধযুগের স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে এই সকল শিলালিপি বিশেষ সমাদৃত ও শিক্ষাপ্রদ । অশোক যেন স্বহস্তে তাঁহার জীবন-কাহিনী, তাঁহার ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস, তাঁহার প্রজাবাৎসল্য সূচক শাসনপ্রণালী এই উপায়ে জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া রাখিয়াছেন । এতদ্বিন্ন অন্য কোন বিশ্বস্ত সূত্রে অশোক-ইতিহাসের উপাদানসকল সংগ্রহ করিবার উপায় নাই । এই লিপিমাল্য হইতে আমরা যে-সকল তথ্য জানিতে পারি, তাহার মধ্যে প্রথম ও প্রধানতঃ কলিঙ্গ-বিজয় বার্তা । কলিঙ্গ প্রদে

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে সুবিখ্যাত । বিক্ষ্যাচলের পূর্বঘাট হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যবর্তী জগন্নাথক্ষেত্র যাহার অন্তর্ভুক্ত, এ সেই দাক্ষিণাত্য প্রদেশ । অশোকের রাজত্বের আরম্ভকালে, ইহা স্বাধীন রাজ্য ছিল । অশোক স্বরাজ্য বিস্তার মানসে, উহা আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন । এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক হত, আহত ও বন্দীকৃত হয় এবং সমগ্র দেশ চারখার হইয়া যায় । এই ভীষণ ঘটনায় রাজার মনে এমনি আঘাত লাগিয়াছিল যে, সেই অবধি তিনি দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, ধর্মরাজ্য বিস্তারে ব্রতী হইলেন ; এইসকল ব্যাপার ত্রয়োদশ শিলালিপিতে দৃষ্ট হইবে ।

কলিঙ্গ বিজয়ের অল্পকাল মধ্যে, খৃষ্টপূর্ব ২৫৯ অব্দে, অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন । প্রথমে গৃহস্থ-উপাসকরূপে দাক্ষিণাত ও তৎপরে বিধিমত সজ্জভুক্ত হইয়া, বৌদ্ধধর্ম প্রচারে নিয়ত নিযুক্ত ছিলেন । তাঁহার উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে বৌদ্ধধর্মের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়, এবং তিনি এত চৈত্যা, এত স্তূপ ও অন্যান্য এত প্রকার কীর্তি-নিকেতন স্থাপনা করেন যে, তাহার চিহ্নসকল দুই সহস্র বৎসরান্তেও কালের অত্যাচারে বিলুপ্ত হয় নাই । মগধ রাজ্যে অন্যান্য চৌত্রিশ হাজার বৌদ্ধ-ভিক্ষু প্রতিপালিত হইত, এবং উহাদের বাসোপযোগী বিহারশ্রেণীতে ঐ প্রদেশ এমনি ভরিয়া যায় যে, “বিহার”ই উহার নামকরণ হইল । ঐ নাম এখনও পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে । রোম সাম্রাজ্যে কন্সটানটাইন্ (Constantine) ঘেরূপ খৃষ্টধর্মের পরিপোষক ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অশোকও সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন ।

তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েন; কেবলমাত্র স্বরাজ্যে নয়, পররাজ্যে ও দেশান্তরে ধর্মযাজকগণ প্রেরণ করেন । কুষদেশে বলা নদী হইতে জাপান, সাইবিরিয়া মঙ্গোলিয়া হইতে সিংহল শ্যাম পর্যন্ত যেখানে যেখানে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার, সেইখানেই অশোকের নাম প্রকীর্তিত । রোম-সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের ন্যায় অন্যান্য রাজবিদগের সত্বে অশোকের তুলনা করা হইয়া থাকে । মোগল-সম্রাট আকবরও তাঁহার উপমাশূল বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন । এই উপমাটি নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না । উভয়েই সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর, সুশাসনে কীর্তিমান ; ধর্ম, উদার্যাগুণে উভয়েই সমতুল । আকবর হিন্দু, পাসি, খৃষ্টান সকল ধর্মকেই সমান শ্রদ্ধা করিতেন, সকল ধর্ম হইতেই সারসত্য গ্রহণ করিতে উৎসুক ছিলেন; এইরূপে তিনি নিজ প্রতিভাবলে এক অভিনব ধর্ম গড়িয়া তুলিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রচারিত এই ধর্মসম্বন্ধে অধিক কাল স্থায়ী হইল না, জীবনান্তে বিলুপ্ত হইয়া গেল ।

আমরা দেখিতে পাই অশোকের পৌত্র দশরথ আজীবক জৈন সম্প্রদায়ে তিনটি গুহাশ্রম উৎসর্গ করেন, ইহা হইতে অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণ হইতেছে যে, তিনি বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন না । ইহাও নিশ্চয় যে, মোঘারাজের উত্তরাধিকারী পুত্রমিত্র, যিনি ১৮০ খৃষ্টাব্দে সুঙ্গবংশ পতন করিয়া যান, তিনিও বুদ্ধ-সম্বন্ধে প্রতি তাদৃশ অনুরাগ প্রদর্শন করেন নাই; প্রত্নতাত্ত্বিক বৌদ্ধ-আখ্যান-মালায় বৌদ্ধদ্রোহী নৃপতি রূপেই চিত্রিত দেখা যায় ।

অশোক বৌদ্ধধর্মকে সম্প্রদায়সীমার মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, বিশ্বজনীন ধর্মরূপে দেশ দেশান্তরে প্রচার করিতে উদ্যোগী হইলেন । পরিণামে তাঁহার মৃত্যুর পর এই ধর্ম তাঁহার জন্মভূমি এই ভারতবর্ষেই শুষ্ক, শীর্ণ ও ত্রিয়মাণ হইয়া পড়িল : তাহার শাখা প্রশাখা এশিয়ার দূর দূরান্ত প্রদেশে বিস্তারিত হইয়া সারবান ও ফলবান বৃক্ষরূপে সমুৎপন্ন হইল ।

অশোকের অনুশাসন-লিপিশিলাগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে :—

\*সম্রাট অশোকের অনুশাসনগুলি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দৃষ্ট হয় । সর্বদশুদ্ধ তাহাদের সংখ্যা প্রায় একত্রিশং । কতক গিরিপৃষ্ঠে ও গুহায় খোদিত, কতক বা শিলাস্তম্ভগাত্রে মুদ্রিত । যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে এই অনুশাসন-গুলি নিম্নলিখিত নিয়মে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে :—

- ১। চতুর্দশ শিলালিপি । ( খৃঃ পূঃ ২৫৭—২৫৬ )
- ২। ভাবরা অনুশাসন ।
- ৩। কলিঙ্গ অনুশাসন ।
- ৪। দুই তিনটি অপ্রধান শিলালিপি ।
- ৫। সাতটি প্রধান ( ২৪২ ) চারটি অপ্রধান স্তম্ভ অনুশাসন ।

এতদ্ভিন্ন দুইটি প্রধান বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র দর্শনের স্মৃতি স্তম্ভ ( ২৪৯ ) এবং কতকগুলি গুহাখোদিত লিপি । এই

\* Asoka, by Vincent A. Smith (Rulers of India Series)

গুহাগুলি আজীবক নামক জৈন সম্প্রদায়ের বাসের নিমিত্ত নিশ্চিত হইয়াছিল ।

খৃষ্টপূর্ব ২৫৭ অব্দ হইতে পঞ্চবিংশতি বৎসরের মধ্যে এই সকল গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল । এইগুলির মধ্যে চতুর্দশ শিলালিপি অগ্রগণ্য । ইহা হইতে আমরা সম্রাটের ধর্মবিশ্বাস এবং অনুষ্ঠানসকল কতক পরিমাণে জানিতে পারি ।

### শিলালিপি ।—

১। জীবহত্যা নিবারণ ।—এই অনুশাসন অনুসারে সম্রাটের রক্ষনশালায় যে অসংখ্য জীবহত্যা হইত, তাহা নিয়মিত হইয়া ক্রমে দুইটি ময়ূর ও কচিৎ একটি হরিণে পরিণত হইয়াছে—পরে তাহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে । যজ্ঞে কিম্বা পর্বাদিতেও জীবহত্যা প্রথা নিষিদ্ধ । ( খঃ পৃঃ ২৫৬ )

২। মনুষ্য ও পশুদিগের হিতার্থে ঔষধালয় স্থাপন, কৃপ খনন, ও বৃক্ষাদি রোপণ ইত্যাদি ।

৩। পিতৃমাতৃভক্তি, ব্রাহ্মণ শ্রমণে দান, প্রাণীহিংসা বর্জন, আয়ব্যয় সঙ্কোচ; এই সকল অনুশাসন প্রচার করিবার জন্য পাঁচ বৎসরান্তর রাজকর্মচারীগণ বিভিন্ন প্রদেশসকল পর্যটন করিবেন ।

৪। কর্তব্যপালন ।—যুদ্ধাভিনয়ের পরিবর্তে, ধর্মসম্বন্ধীয় শোভাযাত্রা । জীবহত্যা ও অশোভন আমোদ প্রমোদ নিবারণ । আত্মীয়স্বজন, সাধু সন্ন্যাসী, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের প্রতি সদ্যবহার । সম্রাটের উত্তরাধিকারী বংশধরগণ, এই অনুশাসন-মত কল্পান্ত

কাল পর্য্যন্ত এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিবেন, এবং সৎপথে থাকিয়া, অপরকে সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও ধর্ম্মোপদেশ দান করিবেন ।

৫ম অনুশাসনের উপদেশ যে, সৎকর্ম্ম কঠিন, এবং পাপকর্ম্ম অনায়াসসাধ্য । এই সকল অনুশাসন কার্য্যে পরিণত হইল কিনা, তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য ধর্ম্মাধিকারী নিযুক্ত হইবে । তাঁহারা যে কেবলমাত্র উপদেশ দিবেন, তাহা নহে,—অন্যায় অবিচারের প্রতিবিধান, বিপন্ন ও বার্ককাপীড়িতের দুঃখমোচন, এবং বহু পরিবার-ভাগ্নস্তু ব্যক্তিদিগের সহায়তা করাই তাঁহাদিগের বিশেষ কর্তব্য । রাজধানী পাটলিপুত্র এবং প্রধান প্রধান নগরে রাজপরিবারভুক্ত অস্ত্রঃপুরচারিণীদিগের দৈনিক জীবনযাত্রার প্রতি তাঁহারা সাবহিত দৃষ্টি রাখিবেন ।

ষষ্ঠ অনুশাসন ।—রাজকর্ম্মচারীদিগের শাসনকার্য্যে তৎপরতা, ও দীর্ঘসূত্রতা বর্জন । বিলম্ব নিবারণার্থে সম্রাট সর্বদাই চরমুখে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন । আহারে, বিহারে, অস্ত্রঃপুরে, রাজসভায় কিম্বা প্রমোদ-উদ্যানে, যখন যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, কখনই তাহাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল না । “এইরূপে লোকহিত সাধন করিয়া যাহাতে মানব-জীবনের ঋণমুক্ত হইতে পারি, এই আমার নিয়ত চেষ্টা ।”

৭ম অনুশাসন ।—দানশীলতা সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে, কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম, কৃতজ্ঞতা, চিন্তাশুদ্ধি, কর্তব্যনিষ্ঠা—এই সকল অত্যাবশ্যক ধর্ম্ম সকলেরি পালনীয় ।

৮ম অনুশাসন ।—মৃগয়া কিম্বা আমোদপ্রমোদ উদ্দেশ্যে

দেশভ্রমণের পরিবর্তে—দরিদ্রে দান, ধর্মশিক্ষা ও আলোচনার নিমিত্ত তীর্থযাত্রা করণীয়। এই সকল স্থানে সম্রাট বিশেষ করিয়া সাধু সন্ন্যাসীদের সহিত সাক্ষাৎকার ও তাঁহাদিগকে দান করিবেন।

৯ম অনুশাসন।—ধর্ম্যানুষ্ঠান ইহপরকালের সুখের সাধন। গুরুভক্তি, জীবে দয়া, শ্রমণ ব্রাহ্মণে উপযুক্ত দান, দাস দাসীর প্রতি গ্যাচরণ, ইহাই ধর্ম্যানুষ্ঠান।

১০ম অনুশাসন।—নিম্নলিখিত দুইটি বচন হইতে এই অনুশাসনের সারমর্ম জানিতে পারা যায় :—

“ক্ষুরস্বধারা নিশিতা দুর্ভয়া দুর্গং পথস্তং কবয়ো  
বদন্তি”।

“যাবজ্জীবেন তং কুর্যাৎ যেনামৃতং সুখং নয়েৎ” ॥

একাদশ অনুশাসন।—প্রকৃত ধর্ম কি? পিতৃ-মাতৃভক্তি, দাসবর্গ সংরক্ষণ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ব্রাহ্মণ শ্রমণে দান, জীবহত্যা হইতে বিরতি। এই ভাবে চলিয়া মানব ইহকালে পুণ্য ও পরকালে সুগতি লাভ করে।

দ্বাদশ অনুশাসন।—ধর্ম্মমতে গুদাবা। স্বধর্ম্মের স্তুতিবাদ ও পরধর্ম্মের অকারণ নিন্দাবাদ করিবে না! সকল ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে। এই অনুশাসনে নির্দেশ করা হইয়াছে যে, এই উদ্দেশ্যে নারীদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য বিশেষ পরিদর্শক নিযুক্ত করা হইবে।



ত্রয়োদশ অনুশাসন ।—এই সকল অনুশাসনের মধ্যে ত্রয়োদশ শিলালিপি সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হইতে পারে । কলিঙ্গবিজয় ও তাহার আনুষঙ্গিক হত্যাকাণ্ড বর্ণন হইতে ইহার আরম্ভ ।

দেবানামপ্রিয়, প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোক বলিতেছেন, “আমার রাজ্যাভিষেকের অষ্টম বর্ষে কলিঙ্গ দেশ বিজিত হয়, এই যুদ্ধে এক লক্ষ পঞ্চাশৎ সহস্র ব্যক্তি বন্দীকৃত ও লক্ষাধিক হত হয়, এবং ততোধিক দৈব-দুর্বিপাকে প্রাণত্যাগ করে ।”

কলিঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পরেই সম্রাটের শুভ ধর্ম-বুদ্ধি জাগ্রত হয়, যুদ্ধের ভীষণ হত্যাকাণ্ড তাঁহার মনে অনুশোচনার উদ্রেক করে । “বিশেষ ক্ষোভের কারণ এই যে, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, সাধুসন্ন্যাসী ও অপরাপর গৃহস্থগণ—যাঁহারা যুদ্ধের সহিত আদৌ সংশ্লিষ্ট নহেন—তাঁহারাও এই ঘটনাচক্রে দুঃখভাগী হইয়া থাকেন” । এই শিলালিপিতে পঞ্চ গ্রীক রাজ্যে দূত প্রেরণের উল্লেখ আছে ।\*

প্রিয়দর্শী বলিতেছেন :—

“গ্রীকরাজ আন্টিওকাসের রাজ্যে ( Antiochus ) এবং তুরময় ( Ptolemy ), আন্টিকিনি, ( Antigonus ), মক

\* পঞ্চ গ্রীকরাজ—

1. Antiochus of Syria.
2. Ptolemy of Egypt, father of Ptolemy Philadelphus.
3. Antigonus of Lyciade.
4. Magus of Cyrene.
5. Alexander of Epirus, maternal uncle of Alexander the Great.

( Magus ) আলেক্স ( Alexander ), উত্তরখণ্ডের এই পঞ্চ রাজার, এবং দক্ষিণে তাম্রপর্ণী সীমান্তে চোলপাণ্ড্য রাজাদিগের রাজত্বে, স্বয়ং সম্রাটের অধীন যবন, কাম্বোজ, ভোজ, পিটিনক, আন্দ্র ও পুলিন্দ প্রদেশে, দেবানামপ্রিয় প্রিয়দর্শীর অনুজ্ঞাসকল যেখানেই প্রচারিত, সেখানেই প্রজাবর্গ আকৃষ্ট হইয়া ধর্ম গ্রহণ করিতেছে। দেশ বিজয় বহু প্রকারে হইতে পারে, কিন্তু ধর্মের জয় সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দজনক ।

এই বিজয়ই শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছনীয় । আমার উত্তরাধিকারী, এবং বংশধরগণ যাহাতে দিগ্বিজয়ের উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করিয়া ধর্মরাজ্য বিস্তারে উद्यোগী হন, সেই অভিপ্রায়ে এই অনুশাসন প্রচারিত হইল ।”

চতুর্দশ অনুশাসন ।—সম্রাট প্রিয়দর্শীর আদেশক্রমে এইসকল শিলালিপি রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে, বারম্বার নানাস্থানে উৎকীর্ণ করা হইল । যদি ইহাতে কোন ভ্রম প্রমাদ স্থান লাভ করিয়া থাকে, তবে তাহা মার্জ্জনীয় ।

এই চতুর্দশ অনুশাসন ভারতের নানাস্থানে প্রচারিত হইয়াছিল । উত্তরে পেশোয়ার হইতে দক্ষিণে মহীশূর পর্য্যন্ত, পশ্চিমে কাটেওয়াড় হইতে পূর্বে, উড়িষ্যা অবধি ইহার প্রতিলিপিসকল পাওয়া গিয়াছে । এইসকল স্থানের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল ।

১। ধৌলী ( উড়িষ্যা ), কটকের দশক্রোশ দক্ষিণে ও পুরীর দশক্রোশ উত্তরে ।

২। গির্গার—কাটেওয়াড়ে, জুনাগড় নগরের নিকট, সোমনাথের, বিশক্রোশ উত্তরে ।

৩। জন্তুগড়,—গঞ্জাম বিভাগ, মাদ্রাজ ।

৪। খালসি, যমুনা যেখানে হিমালয় হইতে নিঃসৃত হইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেইখানে নদীর পশ্চিম তীরে ।

৫। মানসাহারা ।

৬। সাহাবাজ গড়—পেশোয়ারের উত্তরপূর্ব, ২০ ক্রোশ দূর, ইয়ুসুফ জাই বিভাগে ।

ইহার মধ্যে দেবাদুন প্রদেশে মশুরি হইতে পনেরো মাইল পশ্চিমে খালসি নামক স্থানে যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সর্ববাক্সসুন্দর । ইহাতে ও অন্যান্য অনুশাসন-পত্রে যে ব্রাহ্মীলিপি ব্যবহৃত, তাহাই দেবনাগরী অক্ষরের মূল । বাম হইতে দক্ষিণে লিখিত হয় । কেবলমাত্র উত্তর পশ্চিমে সাহাবাজ গড় প্রভৃতি স্থানে, খরোষ্টি অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে । তাহা পারসিক অক্ষরজাত, দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হয় ।

### কলিঙ্গানুশাসন ।

ইতিপূর্বে চতুর্দশ প্রধান শিলালিপি বর্ণিত হইল; এতদ্ভিন্ন কয়েকটি অপ্রধান শিলানুশাসন আছে—তন্মধ্যে দুইটি, কলিঙ্গানুশাসন নামে অভিহিত । একটি ভুবনেশ্বরের সাত মাইল দক্ষিণ ধৌলি গ্রামের সন্নিকট, অশ্বখামা নামা শৈল-গাত্রে খোদিত ; অপরটি মাদ্রাজ বিভাগের গঞ্জাম জিলায় জৌগদ নামক ভগ্নদুর্গে আবিষ্কৃত হয়,—দুর্গের মধ্যভাগে একটি শিলাখণ্ডে খোদিত । এই দুই পত্র বিজিত প্রদেশের নাগরিক এবং সীমান্তবর্তী প্রজাবর্গের প্রতি প্রযুক্ত্য । উভয় পত্রেই বিজিত প্রদেশের শাসন

সম্বন্ধে রাজকর্মচারীদের প্রতি আদেশ প্রচারিত হইয়াছে । এই প্রদেশের সীমান্তে অর্ধসত্য অনার্য্য জাতিসকল বাস করে । তাহাদিগকে আবশ্যিকমত কঠোর কিস্তি করুণ শাসনের দ্বারা বশ মানাইতে হইবে । রাজা প্রিয়দর্শী বলিতেছেন, “প্রজাগণ সকলেই আমার পুত্রতুল্য—আমি আপন সম্মানের ন্যায় তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনা করি, এই কথাগুলি তাহাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিবে ।”

এই সকল শিলালেখ্য অল্প লোকেরি মনযোগ আকর্ষণ করিবার সম্ভাবনা । অতএব সময়ে সময়ে প্রজাসমূহকে একত্রিত করিয়া যেন সম্রাটের এই সকল আদেশ জ্ঞাপন করা হয় ।

নাগরিক পত্রে অধিকন্তু আদেশ এই,—যেন কোন প্রজা অন্যায় কারাদণ্ডে দগ্ধিত না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে ।

অপ্রধান শিলালিপি .—

অশোকের অনুশাসনগুলি স্নেহবাৎসল্য, দয়াদাক্ষিণ্য, পিতৃ-মাতৃগুরুভক্তি, অহিংসাদি সাধারণ ধর্মনীতির উপর দিয়াই গিয়াছে—অথবা প্রজাহিতার্থে বৃক্ষ রোপণ, কৃপা খননাদি পুণ্য কার্যের অনুষ্ঠান আদিষ্ট হইয়াছে । তাহার একটি ভিন্ন অপর কোন শিলালিপিতে প্রিয়দর্শী আপনাকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দেন নাই । ধর্ম বিষয়ে তিনি উদার-পন্থী ছিলেন ; প্রত্যুত এক স্থানে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছেন, “প্রিয়দর্শীর ইচ্ছা এই যে, অর্বৌদ্ধ পাষাণেরাও তাঁহার রাজ্যে নির্বিঘ্নে বাস করুক । কেননা তাহারাও ভাবশুদ্ধি ও ধর্মের শান্তি কামনা করে ।”

কেবল একটিমাত্র অনুশাসনে তাঁহার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ বার্তা ঘোষিত হইতেছে—তাহা অপ্রধান শিলালিপির মধ্যে প্রথম বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।

### ১। সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ।—

“আড়াই বৎসর পূর্বে, দেবানামপ্রিয় অশোক রাজা গৃহস্থ-উপাসকরূপে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি বৎসরেক যাবৎ সজ্জভুক্ত হইয়া কায়মনে ধর্মানুষ্ঠানে তৎপর রহিয়াছেন । এই কালের মধ্যে ভারতবাসীগণ পূর্বে ঐহারা অসহযোগী ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা দেবতাদের সহযোগী হইয়াছেন ।”

এই অনুশাসনের মর্ম্ম গিরিপৃষ্ঠে খোদিত হইয়া ঘোষিত হউক । তোমরা ইহা দিক্দিগন্তে ঘোষণা করিয়া দাও । এই ঘোষণা পত্র প্রচারার্থে ২৫৬ জন প্রচারক নিযুক্ত হইল ।

এইরূপে সম্রাট অশোক ধর্ম্মরাজ ( Pope ) এবং পৃথীরাজ ( Emperor ), এই দুই গৌরব-পদের সম্মুখিত হইয়া দাঁড়াইলেন ।\*

বৌদ্ধধর্মে নরপতির প্রবক্তা গ্রহণের দুইটি উদাহরণ আছে,—খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠাদে চীন সম্রাট কাউৎসু, এবং আধুনিক কালে ব্রহ্মরাজ বোদো আপ্রা ( খৃষ্টাব্দ ১৭৮১—১৮১৯ ) । অশোক গেরুয়া বসন পরিধান করিয়া রীতিমত বৌদ্ধ-পরিব্রাজক-

\* Asoka, by J. M. Macphaili ( Heritage of India Series )—P. 43.

রূপে শিবির স্থাপনা পূর্বক স্বীয় রাজ্য পর্যটন করিতেছেন, সেই এক সুন্দর চিত্র আমাদের কল্পনাপথে উদ্ভিত হয় ;

২। অপর একটি ধর্ম্মানুশাসন ভাবরা লিপি বলিয়া প্রসিদ্ধ । রাজপুতানার অন্তঃপাতী বৈরাট নামক নগরের নিকটবর্তী শৈল-শিখরস্থিত বৌদ্ধ-সঙ্ঘারামের কোন বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে ইহা খোদিত দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় আনীত হইয়াছে। ইহাতে সম্রাট মগধ সঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

“রাজা প্রিয়দর্শী সঙ্ঘের কুশল কামনা করিতেছেন। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের উপর আমার কি প্রকার ভক্তি শ্রদ্ধা, মহাশয়েরা অবগত আছেন। বুদ্ধ যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সকলই সদুপদেশ, তাঁহার আজ্ঞানুরূপ চলিলে সত্যধর্ম্ম বহুকাল সুরক্ষিত থাকিবে।”

পরে তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ সাতটি ধর্ম্মতত্ত্ব পালিশাস্ত্র হইতে প্রকট করিয়াছেন—

- ১। বিনয় সমুৎকর্ষ ( প্রাতিমোক্ষ হইতে )
- ২। আর্য্যবশ ( সঙ্গীতি সূত্র হইতে )
- ৩। অনাগত ভয় ( অঙ্গুত্তর )
- ৪। মুনিগাথা ।
- ৫। মৌনী সূত্র ।
- ৬। উপতিসস-পসিণ, উপতিষ্ট = সারীপুত্র, পসিণ = প্রণ  
( বিনয় )

\* ৭। রাহুল-বাদ, রাহুলের প্রতি বুদ্ধের উপদেশ ।

এই সকল কথা শ্রমণ, শ্রমণা ও বৌদ্ধ-গৃহস্থগণ প্রণিধান পূর্বক শ্রবণ ও মনন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে আমি এই অনুশাসন প্রচার করিতেছি ।

চতুর্দশ শিলালিপির ন্যায় সপ্ত স্তম্ভানুশাসনও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে সুবিদিত ।

সপ্ত স্তম্ভলিপি ।—

১। সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের ষড়বিংশতি বৎসরে এই অনুশাসন স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা হয় ।

ধর্ম্যানুরাগ, ধর্মনিষ্ঠা, সাধুচেষ্টা, আত্ম-পরীক্ষা, এই সকল সাধনা ব্যতীত ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ সাধিত হয় না। যাহা হউক, আমার অনুশাসন প্রভাবে এই ধর্ম্যানুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়াছে এবং দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে ।

আমার কর্ম্মাধাঙ্কগণ ছোট বড় যাহাই হউক, আমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া প্রজাবর্গকে—“এই চঞ্চল-চিত্ত লোকসকলকে সৎপথে লইয়া যাইতে সচেষ্ট হইবে ।”

২। দয়া, দান, সত্য, চিত্তশুদ্ধি, পুণ্যানুষ্ঠান, পাপাচরণ হইতে বিরতি, ইহাই ধর্ম্মের লক্ষণ ।

সম্রাটের অহিংসা প্রভৃতি সদনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত অন্য সকলে অনুসরণ করিলে মঙ্গল হইবে ।

---

\* ইহার মধ্যে (১) এবং (৬) এই দুইটির মূল এখনো ঠিক জানা যায় নাই,—অন্য বচনগুলি ত্রিপিটক শাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে ।



৩। লোকে আপনার ভালই দেখে, কি মন্দ তাহা বিবেচনা করে না। ইহা ঠিক নহে, সদসৎ বিচার করা কর্তব্য—রাগ, দ্বেষ, দম্ভ, অহঙ্কার, ঈর্ষা, ক্রুরতা, এই সকল পাপ হইতে বিরত থাকিবে। দেখিবে একপথে ঐহিক সুখ, অপর পথে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল।

৪। শাসনকর্তাদের অধিকার ও কর্তব্য নিরূপণ।—

আমি আমার শাসনকর্তাদিগকে দণ্ডপুরস্কার বিধানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছি, যাহাতে তাহারা নির্ভীক চিত্তে আপন আপন কর্তব্য সাধন করিতে পারে।

তাহারা প্রজাবর্গের সুখদুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিয়া, তাহাদের সুখবর্দ্ধন ও দুঃখ মোচন করিতে যত্নশীল হইবে। আপনাপন অধীনস্থ কর্মচারী কর্তৃক তাহাদের ঐহিক পারত্রিক হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিবে।

পিতা যেমন বালককে সুদক্ষ রক্ষকের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়েন, সেইরূপ আমার কর্ম্মাধ্যক্ষগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, তাহাদিগকে প্রজার হিত সাধনার্থে নিয়োগ করিলাম। আর একটি এই নিয়ম বাঁধিয়া দিতেছি যে, যে-সকল অপরাধী প্রাণদণ্ড বিধানে বন্দী রহিয়াছে, তাহাদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্য যেন তিনদিন সময় দেওয়া হয়।

যদি সে দণ্ড অপরিহার্য হয়, তথাপি অপরাধীদের পারলৌকিক সুগতি ও প্রজাদিগের মধ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের উত্তেজনা করা আমার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৫ । প্রাণীহত্যা ও পীড়ন নিবারণের ব্যবস্থা ।—

কোন প্রাণী প্রাণীদিগের আহাৰ্য্য স্বরূপে ব্যবহৃত হইবে না ।  
পূর্ণিমা ও অশ্বিন পূর্ণিমা পর্বদিনে মৎস্যাদি ধরা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ ।

বন্দীগণের মুক্তিদান ।—আমার ছাব্বিশ বৎসর রাজত্বকালের  
মধ্যে ২৫ বার বন্দীদিগের কারামোচনের ব্যবস্থা হইয়াছে ।

৬ । সম্রাটের উপদেশ এই যে, স্বধর্ম পালন করাই অনুষ্ঠ  
মাত্রেরই কর্তব্য ।

তাহাদের ধর্ম যাহাই হোক, সকল সম্প্রদায়ের সুখসমৃদ্ধি  
বর্দ্ধন করা আমার আন্তরিক ইচ্ছা ।

৭ । ধর্মপ্রচারের নিয়ম ।—

কৃপ খনন, বৃক্ষ রোপণ, পান্থশালা নির্মাণ, ধর্ম্মাধিকারী  
নিয়োগ ।

সংপাত্রে দান ।—কেবলমাত্র আমার নিজস্ব দান নহে, যাহা  
যাহা আমার মহিষীদিগের দান, তাহা যোগ্যপাত্রে বিতরিত হয়,  
ইহাই আমার আদেশ ।

আমার অনুশাসনগুলি যাহাতে শাস্ত কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়,  
সেই উদ্দেশ্যে আমি এই সকল স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়া  
দিলাম । \*

---

\* ১২ । ইহার মধ্যে দুইটি স্তম্ভ ( ফিরোজ সা লাট ) ফিরোজ সা  
বাদসার আদেশে সিংহলিক এবং মিরাত হইতে স্থানান্তরিত হইয়া দিল্লীতে  
রাখা হইয়াছে ।

৩ । আলাহাবাদ—প্রয়াগের দুর্গ মধ্যে ।

৪ । লোরিয়া—বেটিরার নিকটস্থ লোরিয়া গ্রামে ।

৫ । লোরিয়া—পাটনার উত্তর পশ্চিম ৭৭ মাইল ।

উল্লিখিত সপ্ত প্রধান স্তম্ভলিপি তৃতীয় চারিটি অপ্রধান স্তম্ভ-  
অনুশাসন আছে ।

১। সারনাথ । \* সস্তবত পাটলিপুত্র সভার সমসাময়িক  
( ২৪০—২৩২ ) ।

২। কোশাম্বী ।

৩। কাঞ্চী ।

এই অনুশাসন ত্রয়ের মর্ম এই, যে-কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী  
সঙ্ঘের মধ্যে বিরোধ সংঘটন করে, সে দণ্ডনীয় । সাধুজনোচিত  
অভ্যস্ত গৈরিক বসন কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে সঙ্ঘ হইতে  
বহিষ্কার করা হইবে,—কারণ সঙ্ঘের ঐক্যবন্ধন ও স্থায়ীত্ব  
সম্রাটের একান্ত বাঞ্ছনীয় ।

৪। দ্বিতীয় মহিষী কুরুবকীর দানের ব্যবস্থা ।

আম্রবন, প্রমোদোদ্যান, অন্নচ্ত্র, যাহাই হোক—মহিষীর নামে  
এই সকল দানের সুব্যবস্থা হয়—ইহাই সম্রাটের অনুজ্ঞা ।

নেপাল তরাই হইতে সংগৃহীত

দুইটি স্মারক-লিপি ।—

১। বুদ্ধের জন্মভূমি লুম্বিনী উদ্যানে স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা ।

---

\* বারাণসীর মৃগদাব, যাহা ধর্মচক্র প্রবর্তনের পূণ্যভূমি, তাহা এক্ষণে  
সারনাথ বলিয়া প্রসিদ্ধ । এখানকার ভগ্নাবশেষের মধ্যে সিংহচতুষ্টয়  
মাণ্ডিত অপূর্ব কারুকার্যসম্বিত যে একটি অশোক-স্তম্ভের শিরোভাগ  
কতিপয় বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দর্শনীয় ।

রাজস্বের অষ্টমাংশ ব্যতীত রাজপ্রাপ্য অন্যান্য সকল কর হইতে এই গ্রামের প্রজাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইল ।

( রুসিন্দেই লেখ )

২। পূর্ববুদ্ধ কনক মুনির সমাধিক্ষেত্রে স্তূপ স্থাপন ।

ধর্ম মহামাত্র—প্রতিবেদক ।

এই সমস্ত অনুশাসন লিপি হইতে জানা যায় যে, অশোকের রাজত্ব কালে “ধর্ম মহামাত্র” নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত হন,—ধর্মের পবিত্রতা রক্ষণ এবং ধর্মপ্রচার, এই দুই বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত ছিল। প্রজাবর্গের নিম্নস্তরেই ধর্মপ্রচারের বিশেষ আবশ্যিক, এই তেতু অনার্য জাতিগণের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন উল্লিখিত ধর্মাধাক্ষের কর্তব্য মধ্যে গণ্য ছিল। আর এক শ্রেণীর কর্মচারীর নাম প্রতিবেদক, প্রজাদিগের নীতি সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করা তাহাদেরও কার্য ছিল। প্রজাদের আচার ব্যবহার হিতাহিত তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়া তৎসম্বন্ধীয় সকল সংবাদ প্রতিবেদকেরা মহারাজের নিকট আনিয়া দিতেন ।

অশোক স্বীয় রাজ্যে ধর্মপ্রচারের বাবস্থা করিয়াই নিরস্ত হন নাই,—পথের ধারে বৃক্ষরোপণ, কৃপবাপী খনন, পশুহিংসা নিবারণ, পশু ও মনুষ্যের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় স্থাপন, অস্তঃপুরবাসিনী ও আর আর লোকের জন্য ধর্ম ও নীতিশিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তন,—এইরূপ বিবিধ উপায়ে প্রজাগণের হিতসাধনের

চেষ্টা পান । তাঁহার অনুশাসন লিপিতে এই সমস্ত ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান এবং কর্মচারী নিয়োগের বার্তা লিখিত আছে ।

অশোকের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে পাটলিপুত্রে বৌদ্ধদের তৃতীয় মহাসভা হয়, সে সভায় প্রায় ১০০০ স্তবির ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন । মুদগলপুত্র তিষ্ঠ্য তাহার অধ্যক্ষস্থানে ছিলেন এবং সভার কার্য প্রায় ৯ মাস ধরিয়া চলে । বিনয় ও ধর্মের পাঠ ও আবৃত্তি—তাহার কোন্ ভাগ শাস্ত্রীয় কোন্ ভাগ অশাস্ত্রীয়—কি গ্রাহ্য কি ত্যজ্য তাহা নিরূপণ, আদিসমাজের নিয়ম ও ধর্ম সংরক্ষণ, সাম্প্রদায়িক মত খণ্ডন ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন হয় । ইহা বলা আবশ্যিক যে, উক্তর দেশীয় বৌদ্ধশাস্ত্রে এই পাটলিপুত্র সভার কোন উল্লেখ নাই ; ইহার বিষয় যাহা কিছু জানা যায়, তাহা এক-দেশ-দর্শী দক্ষিণ শাখার গ্রন্থসকল হইতে জানা গিয়াছে, বিরুদ্ধ পক্ষের কথা শুনিতে পাইলে এ সভার বিবরণ আরো স্পষ্ট বুঝা যাইত ।

কিন্তু এ সভার শাস্ত্রীয় বিচার যাহাই হউক না কেন, ধর্ম প্রচার কার্যে ইহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষিত হয়, এবং এই কার্য সুসম্পন্ন করায় ইহার সমধিক গৌরব বলিতে হইবে । সভার কার্য শেষ হইবামাত্র অশোক রাজা কাশ্মীর, গান্ধার, মহীশূর, বনবাস ( রাজস্থান ), অপরন্তুক ( পশ্চিম পাঞ্জাব ); মহারাষ্ট্র, যবন লোক ( বক্ত্রিয়া ও গ্রীক রাজ্য ), হিমালয়, সুবর্ণ ভূমি ( মলয় ) এবং লঙ্কাদ্বীপে ধর্মপ্রচারকগণ প্রেরণ করেন । অশোকের অনুশাসন লিপিতে আরো অনেক দেশের নাম পাওয়া যায় ; চোলা ( তাঞ্জোর ), পাণ্ড্য ( মদুরা ), সাতপুর ( নর্মদার

দক্ষিণ পর্বতশ্রেণী ) এবং আণ্টিয়োকসের গ্রীকরাজা, এই সকল দেশকে ধর্মযুদ্ধে পরাজয় করা অশোকের মনোগত অভিপ্রায় ছিল, এবং তিনি স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন ধর্মবিজয়ই সমধিক বাঞ্ছনীয় ও আনন্দজনক ।

সিংহলে বৌদ্ধধর্ম ।—

ধর্মপ্রচার উদ্দেশে অশোক যে সকল বৌদ্ধ ভিক্ষু দেশ বিদেশে প্রেরণ করেন, তাহাদের মধ্যে তাঁহার নিজের পুত্র \* মহেন্দ্রের সিংহল প্রয়াণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তখন দেবানাং প্রিয় তিষ্ঠ সিংহলের রাজা, তাঁহার নিকট অশোকপুত্র মহেন্দ্র দলবলে উপস্থিত হইলেন । তিষ্ঠ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন ও আপনি অনতিকালবিলম্বে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন । অনুরাধাপুরের অনতিদূরে মহিন্তালী পর্বত শিখরে যে বৌদ্ধ মঠ আছে, তাহা তাঁহারই আদেশক্রমে নিৰ্ম্মিত হয় । এই পর্বতশ্রমে মহেন্দ্র কতিপয় বৎসর যাপন করেন । পাহাড় খুদিয়া তাঁহার জন্ম যে গুহাশ্রম নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার চিত্রসকল অद्याপি বর্তমান । মহেন্দ্রের পর্বতশ্রম হইতে নিম্নদেশস্থ সুবিস্তৃত অধিদাকা দৃষ্টিগোচর হয় । গিরিচ্ছত্র ছায়ায় আশ্রমটী সূর্য্যকিরণ হইতে সুরক্ষিত । জনমানব নাই, সকলি নিস্তব্ধ ; নিম্নদেশ হইতেও জনকোলাহল শ্রুতি-গোচর হয় না, কেবল ভ্রমরের গুণ গুণ শব্দ ও বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না । বৌদ্ধশাস্ত্রবিশারদ Rhys

\* কোন কোন গ্রন্থকারের মতে মহেন্দ্র অশোক রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ।

Dauids এই আশ্রম দর্শন করিয়া বলিয়াছেন “এই শান্তিপূর্ণ শীতল কক্ষে প্রবেশ করিয়া যেদিন এই স্থান দর্শন করিলাম— এই সুন্দর বিজন স্থান যেখানে ২০০০ বৎসর পূর্বের সেই মহোৎসাহী ধর্মপ্রচারক ধ্যান করিতেন ও লোকদিগকে ধর্ম শিক্ষা দিতেন— সে দিন আমার স্মৃতি-পথ হইতে কখনই অপসারিত হইবার নহে।”

রাজার অন্তঃপুরবাসিনীদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করায় মহেন্দ্র তাঁহার বৌদ্ধ ভগিনী সজ্জমিত্রাকে ডাকিয়া আনাইলেন। পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সজ্জমিত্রা কতকগুলি ভিক্ষুণীসহ সিংহলে উপস্থিত হইলেন ও নূতন শিষ্যদিগকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করিলেন।

সজ্জমিত্রা সঙ্গে করিয়া বোধিবৃক্ষের এক বৃক্ষশাখা লইয়া আসেন—সেই অশ্রুণ বৃক্ষ যাহার তলে বুদ্ধদেব দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই শাখা অনুরাধাপুরে রোপিত হয় ও ইহা বদ্ধমূল হইয়া এইক্ষণে প্রকাণ্ড অশ্রুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐতিহাসিক বৃক্ষের মধ্যে ইহা অতি প্রাচীন বলিয়া বিখ্যাত। খৃঃ পূঃ ২৮৮ শতাব্দে ইহা রোপিত, সুতরাং ইহার বয়ঃক্রম দুই সহস্র বৎসরের অধিক হইবে।

সিংহলে এই ধর্মের প্রভাব অব্যাহত ছিল।

দেবানাংপ্রিয় তিষ্য—যাঁহার রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তিত হয়—৪০ বৎসর রাজত্ব করেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উদ্ভীয়া তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। তিষ্যের মৃত্যু হইতে অভয় দত্ত-গামিনীর রাজ্যপ্রাপ্তির মধ্যে প্রায় ৯৬ বৎসর অতিবাহিত হয়।



দন্তগামিনীর রাজ্যারম্ভ মোটামুটি খৃঃ পূঃ ১১০ ধরা যাইতে পারে ।

এই রাজা সজ্জের প্রধান পরিপোষক ছিলেন এবং স্তূপ, বিহার লৌহ-প্রাসাদ, স্তম্ভ প্রভৃতি ইমারতসকল নিৰ্ম্মাণ করেন । গৌতমের মৃত্যুর ৩৩০ বৎসর পরে বহু-গামনীর রাজত্বকালে ত্রিপিটক বৌদ্ধশাস্ত্র সিংহলী হইতে পালি ভাষায় প্রথম লিপিবদ্ধ হয় । ( মহাবংশ )

মহেন্দ্রের কয়েক শতাব্দী পরে বুদ্ধঘোষ সিংহলে আসিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষ্য (অর্থকথা) প্রভৃতি প্রণয়ন করেন । মহেন্দ্রের নীচেই তাঁহার নাম সিংহলে প্রকীর্তিত । ৪৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহল হইতে ব্রহ্মদেশে গমনপূর্বক বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন । তৎপরে শ্যামদেশে ঐ ধর্ম প্রবেশ করে, তথা হইতে সুমাত্রা ষবদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য স্থানে নীত হয় । সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে অনেকানেক বৌদ্ধ ভিক্ষু তিব্বত, নেপাল, সিংহল, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে গমন করত ধর্ম প্রচার করেন । ধন্য তাঁহাদের ধর্ম্মানুরাগ ! ধন্য তাঁহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায় !

গ্রীকরাজ মিলিন্দ ।—

খৃষ্টাব্দ পূর্বেই বৌদ্ধধর্ম প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । যে সময় ভারতে গ্রীকরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও ঐ ধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল । ‘মিলিন্দ প্রশ্ন’ নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ ভিক্ষু নাগসেন ও গ্রীকরাজ

মিলিন্দের মধ্যে যে বৌদ্ধমত সংক্রান্ত কথাবার্তা আছে, তাহাতে নাগসেন যবনরাজের সমুদয় যুক্তিতর্ক খণ্ডন করিয়া কিরূপে স্বমত সমর্থন করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বৌদ্ধ তপস্বীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায় ।

রাজা কনিষ্ক ।—

খৃষ্টাব্দ প্রবর্তনের কিছু পূর্বে এক শক-জাতীয় নৃপতি উত্তর ভারতখণ্ডে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন । ঐ জাতীয় তৃতীয় রাজা কনিষ্ক কাবুল হইতে পঞ্জাব, সিন্ধু হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত এক সুবিস্তৃত রাজ্য পত্তন করিয়া যান । কাশ্মীর তাঁহার রাজধানী । কনিষ্ক একজন উৎসাহী বৌদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁহার গুরু পার্শ্বকের পরামর্শানুসারে জালন্ধরে ৫০০ ভিক্ষুর এক মহাসভা আহ্বান করেন, বসুমিত্র তাহার সভাপতি । পূর্বে বলা হইয়াছে এই সভায় বৌদ্ধ শাস্ত্রের তিনটি মহাভাষা সংস্কৃত ভাষায় প্রস্তুত হয়, কিন্তু এই সকল গ্রন্থ হইতে মূলধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার কোন সাহায্য হয় নাই । দক্ষিণে প্রথম হইতে বৌদ্ধশাস্ত্রসমুদায় পালি ভাষায় প্রস্তুত হওয়াতে ধর্মবিষয়ক উচ্ছৃঙ্খলতা অনেকাংশে নিবারিত হয় ; উত্তরে সেরূপ দেখা যায় না । সেখানে বৌদ্ধধর্ম কোন বন্ধন না পাইয়া কামরূপী মেঘের গুণায় নানা স্থানে নানা মূর্তি ধারণ করিয়াছেন । ছয়েন সাং বলেন, এই ত্রিভাষা কতিপয় তাম্রপত্রে মুদ্রিত এবং এক প্রস্তরনির্মিত বাস্কে বন্ধ হইয়া মাটিতে পুঁতিয়া রাখা হয় ও তদুপরি এক দাঘোবা নির্মিত হয় । ছয়েন সাঙের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে

হয়ত এই ত্রিভাষ্য এখনও পর্য্যন্ত ভূগর্ভে নিহিত আছে, ঐ স্থানে খনন করিতে করিতে ঐ বহুমূল্য তাম্রপাত্র গুলি আবিষ্কৃত হইয়া বৌদ্ধ-সমাজে প্রচারিত হইতে পারে— আশ্চর্য্য কি ?

চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম ।—

৬১ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত পত্তন হয়। প্রবাদ এই যে, তখনকার সম্রাট মিং-তি স্বপ্ন দেখেন একটি সোণার দেবতা তাঁহার প্রাসাদে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া তাহার অর্থ মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন। মন্ত্রী এই অর্থ করেন যে পশ্চিমাঞ্চলে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইয়াছে, হয়ত তাঁহার সঙ্গে এই স্বপ্নের কোন যোগ থাকিবে। চীন সম্রাট বুদ্ধের আসল তথ্য জানিবার নিমিত্ত ভারতে দূত প্রেরণ করেন। দূত-গণ দুই জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও পুঁথি ছবি প্রভৃতি কতকগুলি জিনিস লইয়া প্রত্যাগমন করেন। সম্রাট ভিক্ষুদের উপদেশে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার রাজধানীতে এক বৌদ্ধ মন্দির নিৰ্ম্মাণ করিলেন। সেই সময় হইতে চীন দেশে অল্পে অল্পে বৌদ্ধধর্ম প্রচার হইতে লাগিল। পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী কুমারজীব অপর ৮০০ ভিক্ষুক সাহায্যে চীন ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদ করেন। বুদ্ধঘোষ-কৃত বুদ্ধচরিত কাব্য উদীচ্য Liang বংশের রাজত্বকালে খৃঃ ৪১৪ হইতে ৪২১ অব্দ মধ্যে ধর্ম্মরক্ষক নামক পণ্ডিত কর্তৃক চীন ভাষায় অনুবাদিত হয়। চীন পরি-ব্রাজক হুয়েন সাং তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, চারিটি

সূর্যোদয়ে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইয়াছে, বুদ্ধচরিত কাব্য প্রণেতা বুদ্ধঘোষ উহাদের অন্যতম । তৎপরে ফাহিয়ান, হুয়েন সাং, ইংসিং প্রভৃতি চীন পরিব্রাজকগণ ভারতের তীর্থ হইতে ফিরিয়া স্বদেশে ঐ ধর্ম বিস্তার করেন ; ক্রমে কনফুসস্, তাও-মত ও অন্যান্য প্রচলিত ধর্মসংস্কারের সংশ্রবে চীনদেশীয় বৌদ্ধ-ধর্ম এইক্ষণকার বিমিশ্র ভাব ধারণ করিয়াছে । ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে চীন ও কোরিয়া হইতে ঐ ধর্ম জাপানে প্রবেশ লাভ করে । এইরূপ দক্ষিণে উত্তরে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ বিস্তার হইয়া যায় ।

মার্কিন দেশে বৌদ্ধধর্ম ।—

ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণে সিংহল শ্যাম ব্রহ্মাদি দেশে, উত্তরে নেপাল তিব্বত কাবুল গান্ধার, পূর্বে চীন, চীন হইতে মোঙ্গলিয়া, কোরিয়া জাপান ও মধ্য এশিয়া খণ্ডে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ‘দূরাৎ সুদূরে’ ছড়াইয়া পড়ে—এসকল ত জানা কথা ; কিন্তু কলম্বুসের আবিষ্কার ১০০০ বৎসর পূর্বেও যে বৌদ্ধ প্রচারকগণ ঐ ধর্ম আমেরিকায় লইয়া যান, এ কথা অনেকের নতন ঠেকিবে । বাস্তবিক যে তাহাই ঘটিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । বিষয়টী একরূপ কৌতুকাবহ যে, পাঠক-গণের সম্মুখে উপস্থিত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না । “কলম্বুসের পূর্বে আমেরিকার আবিষ্কার” শীর্ষক একটি সচিত্র প্রবন্ধ আমেরিকার এক মাসিক পত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত হই-  
য়াছে, এই স্থলে তাহা সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল ; যাঁহারা সবিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঐ পত্র আনাইয়া দেখিবেন ।

কতকগুলি প্রমাণ হইতে নিস্পন্ন হইতেছে যে, পাঁচজন বৌদ্ধ ভিক্ষু কুষের উত্তর সীমা কামস্কাট্কা হইতে পাসিফিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হইয়া আলাস্কা দিয়া আমেরিকায় প্রবেশ পূর্বক দক্ষিণে মেক্সিকো পর্য্যন্ত গমন করেন। ঐ পথ দিয়া আমেরিকা যাত্রা দুর্কহ ব্যাপার নহে; মধ্যে যে আল্যাসিয়াদি দ্বীপপুঞ্জ আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া কি সহজে আমেরিকা পৌঁছান যায়, মানচিত্র দৃষ্টিে তাহা বুঝিতে পারিবেন; বলিতে কি, চীন পরিব্রাজকদিগের স্থল-পথ দিয়া ভারতবর্ষ ভ্রমণ অপেক্ষা অনেক সহজ। মেক্সিকো ও তৎসন্নিহিত আদিম আমেরিকানদের ইতিহাস, ধর্ম, আচার ব্যবহার, প্রাচীন কীর্তি-কলাপের চিত্রসকল এই ঘটনার সত্যতা বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। প্রাচীন চীন গ্রন্থাবলীতে ফুসং নামক এক পূর্বদেশের উল্লেখ আছে, সে দেশের এক বৃক্ষ হইতে ফুসং নাম গৃহীত হয়। বর্ণনা হইতে মেক্সিকো দেশে 'আগুয়ে' বা 'মাগুয়ে' যে বৃক্ষ জন্মে, তাহার সহিত ফুসং বৃক্ষের সৌসাদৃশ্য উপলব্ধি হয়।

চীন সাহিত্যে হুইসেনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত নামে একটা গ্রন্থ আছে, তার লেখাটা অত্যন্ত সরল, এমন কোন অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা নাই যাহা লেখকের কল্পনা-প্রসূত বলিয়া মনে হয়। এই বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, হুই-সেন কাবুলবাসী ছিলেন, ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে য়-আন সম্রাটের রাজত্ব কালে ফুসং হইতে কিঞ্চে ন রাজধানীতে আগমন করেন। তখন রাজ্য-বিদ্রব বশতঃ তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই, বিদ্রোহ থামিয়া গেলে পরবর্তী নূতন সম্রাটের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। তিনি

ফুসং হইতে কৌতুকজনক নানা নূতন নূতন সামগ্রী ভেট লইয়া আসেন, তাহার মধ্যে একরকম কাপড় ছিল, তাহা রেশমের মত নরম অথচ তার সূতা এরূপ কঠিন যে, কোন ভারি জিনিস ঝুলাইয়া রাখিলেও ছিঁড়িয়া যায় না। মেক্সিকোর 'আগুয়ে' গাছ হইতেও ঐ রকম রেশম উৎপন্ন হয়। আর একটা সুন্দর ছোট দর্পণ উপহার দেন, যাহার অনুরূপ দর্পণ মেক্সিকো অঞ্চলের লোকদের মধ্যে ব্যবহৃত হইত। রাজাজ্ঞায় হুই-সেনের ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহার কথামত লিখিয়া লওয়া হয়, তাহার সারাংশ এই :—

পূর্বে ফুসংবাসীরা বৌদ্ধধর্মের কিছুই জানিত না, ৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সুং বংশীয় তা-মিং সম্রাটের রাজত্বকালে কাবুল হইতে পাঁচজন বৌদ্ধভিক্ষু ফুসং গমন করত সে ধর্ম প্রচার করেন। সেখানকার অনেকে বৌদ্ধ-ভিক্ষুরূপে দীক্ষিত হয়, ও তখন হইতে লোকদের রীতিনীতি সংশোধন আরম্ভ হয়। পরিব্রাজক ভিক্ষুরা কামস্কাট্কা হইতে কোন্ পথ দিয়া কিরূপে যাত্রা করেন, কোন্ পথ কত দূর, অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার কিরূপ, ঐ গ্রন্থে সকলি বিস্তৃত আছে। ফুসং বৃক্ষের গুণাগুণ, তার চাল হইতে সূতা বাহির হওয়া ও বস্ত্র বয়ন এবং তাহা হইতে কাগজ প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত যথাযথ বর্ণিত আছে। সেদেশে একপ্রকার রাজা পিয়ারা ও প্রচুর দ্রাক্ষা জন্মানোর কথা আছে, যাহা মেক্সিকো প্রদেশের ফলের সঙ্গে ঠিক মেলে। ও দেশে তাম্র পাওয়া যায়, লৌহ খনি নাই, সোনা রূপার ব্যবহার নাই, জিনিসের দরের ঠিক নাই। ওখানকার লোকদের রাজ্যতন্ত্র, রীতিনীতি, বিবাহ ও



অশ্বেষ্টি পদ্ধতি, নগর দুর্গ সেনা ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাব, এই সকল বিষয়ের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহার সহিত আদিম আমেরিকা, বিশেষতঃ মেক্সিকো অঞ্চলে যাহা দেখা যায়, তাহার চমৎকার ঐক্য দৃষ্ট হইবে ।

মেক্সিকোবাসীদের মধ্যে এক জনশ্রুতি আছে যে, একজন শ্বেতকায় বিদেশী পুরুষ, লম্বা শুভ্র বসন তার উপর এক আলখাল্লা, এই বেশে আগমন করেন । তিনি লোকদিগকে পাপ পরিহার, ন্যায় সত্য ব্যবহার, শিষ্টাচার, মিতাচার এই সমস্ত ব্যবহারধর্মের উপদেশ দেন । পরে সেই সাধু পুরুষের উপর লোকের উৎপীড়ন আরম্ভ হওয়াতে, তিনি প্রাণভয়ে হঠাৎ একদিন কোথায় চলিয়া গেলেন কেহই সন্ধান পাইল না, শুধু এক পাহাড়ের উপর তাঁর পদচিহ্ন রাখিয়া গেলেন । তাঁহার স্মরণার্থ ম্যাগডালিনা গ্রামে তাঁহার এক প্রস্তর মূর্তি নির্মিত হয়, তার নাম উই-সি-পোকাকা, সম্ভবতঃ 'হুই-সেন-ভিক্ষু' নামের অপভ্রংশ । আর একজন বিদেশী ভিক্ষু কতকগুলি অনুচর সঙ্গে প্যাসিফিক সাগর তীরে আসিয়া নামেন । হয়ত তাঁহারা উল্লিখিত পঞ্চ ভিক্ষু । এই সকল ভিক্ষুরা যে ধর্ম শিক্ষা দেন, তাহা অনেকটা বৌদ্ধমতের অনুরূপ । স্প্যানিষ জাতি কর্তৃক আমেরিকা বিজয় কালে তাঁহারা মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার জনপদে যে ধর্মমত ও বিশ্বাস প্রচলিত দেখেন ; তাহাদের শিল্প, গৃহনির্মাণ-কৌশল, মাস গণনার রীতি প্রভৃতি যাহা প্রত্যক্ষ করেন,—এসিয়ার ধর্ম ও সভ্যতার সহিত তাহার এমন আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য যে, তাহা দুই দেশের পরস্পর লোকসমাগম ভিন্ন আর কিছুতেই ব্যাখ্যা করা যায় না ।



আর এক প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা ভাষাগত। এশিয়া খণ্ডে 'বুদ্ধ' নামের তেমন চলন নাই। বুদ্ধের জন্মনাম গৌতম এবং জাতীয় নাম শাক্যই প্রচলিত। এই দুই নাম এবং তাহার অপভ্রংশ শব্দ মেক্সিকোর প্রদেশসমূহের নামে মিলিয়া গিয়াছে। দেশীয় যাজকদের নাম এবং উপাধিও ঐরূপ সাদৃশ্য-ব্যঞ্জক।

থাতেমালা = গৌতম আলায়, ছয়াতামো ইত্যাদি স্থানের নাম ; পুরোহিতের নাম থাতেমোট-জিন—'গৌতম' হইতে ব্যুৎপন্ন বোধ হয়। ওয়াস্কা, জাকাটেকাস, শাকাটাপেক, জাকাটলাম, শাকা পুলাস—এই সকলের আদি পদে শাক্য নামের সাদৃশ্য দেখা যায়। মিক্স্টেকার প্রধান পুরোহিতের উপাধি হচ্ছে "তায়-সাক্কা" অর্থাৎ শাক্যের মানুষ। পালেঙ্কে একটা বুদ্ধ প্রতিমূর্তি আছে, তাহার নাম "শাক্-মোল" ( শাক্যমুনি )। কোলোরাডো নদীর একটা ক্ষুদ্র দ্বীপে একজন পুরোহিত বাস করিতেন, তাঁর নাম গৌতুশাক্কা ( গৌতম শাক্য )। তিব্বতী কোন নাম চা'ন ত দেখিতে পাইবেন মেক্সিকোর পুরোহিতের নাম ত্রামা। আর এক কথা, মেক্সিকো দেশের নাম সেখানকার এক বৃক্ষ হইতে হইয়াছে ; ছই-সেন যদি ঐ দেশে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে কুসং বৃক্ষ হইতে দেশের নামকরণ করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমেরিকায় এমন কতকগুলি জিনিস পাওয়া গিয়াছে, যাহা সে দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মূর্তিমান প্রমাণ স্বরূপ। ধ্যানস্থ বুদ্ধের প্রতিমূর্তি, সন্ন্যাসী বেশধারী বৌদ্ধ-ভিক্ষু মূর্তি, হস্তীর প্রতিমূর্তি ( আমেরিকায় হস্তীর শ্যায়

কোন জন্তু নাই ), চীন পাগোডাকৃতি দেবালয়, প্রাচীরের গায়ে চিত্র, খোদিত শিলা, স্তূপ বিহার অলঙ্কার, এই সকল জিনিসে বৌদ্ধধর্মের ছাপ বিলক্ষণ পড়িয়াছে ।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে অধ্যাপক ফ্রায়র ( Fryer )\* স্থির করিয়াছেন যে, ১৪০০ বৎসর পূর্বের বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ প্রচার কার্যে আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন । তাঁহারা অনেক বিঘ্ন বাধা আপদ বিপদ অতিক্রম করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে কার্যসিদ্ধিও করিয়াছিলেন । এইক্ষণে জাপানের সিন্-সূ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ী তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে ব্রতী হইয়াছেন । স্যানফ্রান্সিস্কো সহর তাঁহাদের মিসনের পীঠস্থান । ইহার মধ্যে তাঁহারা ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে পাঁচজন প্রচারক প্রেরণ করিয়া মিসনের কায আরম্ভ করিয়াছেন । প্রচারকেরা সেখানে যে ধর্ম-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ৫০০ জাপানী বৌদ্ধ তাহার সভ্য । ক্যালিফোর্নিয়াব আর আর সহরে এই সভার ভিন্ন ভিন্ন শাখা সংস্থাপিত হইয়াছে । আমেরিকানদের জন্য প্রতি রবিবারে ইংরাজি ভাষায় বৌদ্ধ-ধর্ম্যানুযায়ী উপাসনাদি হইয়া থাকে । বিংশতি বা ততোধিক আমেরিকান তথায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে ১১ জন আমেরিকান বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইয়াছেন, ইহা বৌদ্ধ-ধর্মের সারবস্তার সামান্য পরিচায়ক নহে ।

---

\*“ The Buddhist Discovery of America,”

*Harper's Magazine,*

*July, 1901.*

## উপসংহার।—

গৌতম যদি শুধু দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াই ক্লান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার ধর্ম প্রচারে কৃতকার্য হইতেন কি না সন্দেহ। ন্যায় সাংখ্য বেদান্তাদি ষড় দর্শনের পাশে হয়ত বৌদ্ধ দর্শন সাত ভাইয়ের এক ভাই বলিয়া গণ্য হইত, আর কিছু নয়। সেইরূপ, আবার বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রবলেও হিন্দু-সমাজ বিকম্পিত হইত না। জাতি বর্ণ ছোট বড় বিচার না করিয়া বুদ্ধদেব সাধারণ সকল মনুষ্যের উপযোগী বিশুদ্ধ ব্যবহারধর্মের শিক্ষা ও উপদেশ দিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু তাঁহার উপদিষ্ট নীতিশিক্ষা ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রেরও অঙ্গীভূত, সেইরূপ উচ্চ শিক্ষার গুণে তাঁহার ধর্ম প্রচারের বিশেষ সাহায্য হইবারও সম্ভাবনা ছিল না। বাকী রহিল বিনয়-শাস্ত্র নিয়মে বৌদ্ধ-সমাজ বন্ধন, এক কথায় ‘সঙ্ঘ’— এই এক শক্তি বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের মুখ্য সাধন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহা ছাড়া, সেই সময়কার রাজকীয় অবস্থাও এই নূতন ধর্ম বিস্তার পক্ষে অনুকূল বলিতে হইবে। (নানাদিক হইতে নানা প্রকার শক্তি আসিয়া তখন ভারতের পরিবর্তন সাধন করিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই যে, তৎকালে দেশীয় আচার বিচারের অনেক পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। বৈদিক ধর্ম কতকগুলি কর্মজালে আচ্ছন্ন হইয়া নিস্প্রভ হইয়া গিয়াছে। সেই সময় আবার সেকন্দর-সার ভারত আক্রমণ হইতে যবন আধিপত্যের সূত্রপাত; অবশেষে গ্রীক প্রতাপ রোধ করিয়া মৌর্যবংশীয় শূদ্র রাজাদের অভ্যুদয়। সেকন্দর এদেশে কোন চিরস্থায়ী কীর্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি এদেশ

ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কিছুদিন পরে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের সাহায্যে নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া মগধ রাজ্য অধিকার করেন । চন্দ্রগুপ্ত জাতিতে শূদ্র ছিলেন । মৌর্য্যবংশীয় শূদ্র রাজাদের রাজত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় ও বিস্তার । মৌর্য্য বংশীয় রাজাদের এই ধর্মের প্রতি আন্তরিক টান থাকা স্বাভাবিক । ভারতে এ দুইই নূতন শক্তি, উভয়েই ব্রাহ্মণ্যের বিরোধী — বৈদিক ধর্মাসনে বৌদ্ধধর্ম—ক্ষত্রিয়ের আসনে শূদ্র রাজা । শীঘ্রই এই দুই দলের মধ্যে সখ্যবন্ধন হইল । অশোক রাজা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও পোষণ করিয়া তাঁহার ধর্মামুরাগ এবং রাজকীয় দূরদর্শিতা দুয়েরই পরিচয় দিলেন । দূর দূরস্থিত রাজাদের সহিত অশোকের মিত্রতা-বন্ধন এই ধর্ম প্রচারের আনুষঙ্গিক ফল । তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রকে দিয়া দাক্ষিণাত্যেও তিনি তাঁহার ধর্ম্যাধিকার বিস্তার করিলেন । পরে একদিকে যেমন মৌর্য্যবংশের অবনতি হইল, অন্যদিকে, অর্থাৎ ভারতের উত্তর খণ্ডে, কয়েক শতাব্দী ধরিয়া গ্রীক, পার্থিয়ান শকজাতির প্রভুত্ব বিস্তার হইতে চলিল । বৌদ্ধধর্ম এই রাজ্য-বিপ্লবের ফলভাগী হইলেন । ব্রাহ্মণ্য কেবল হিন্দু জাতিতেই আবদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম সকল জাতির সাধারণ সম্পত্তি । যখন রাজাদের সঙ্গে উত্তর হইতে যে সকল অসভ্য জাতি ভারতে প্রবেশ করিল, বৌদ্ধধর্ম তাহাদের আদরের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল । তা ছাড়া অশোকের প্রতাপে যেমন দাক্ষিণাত্য বিজিত হইয়াছিল, ঐ সকল রাজার প্রভুত্ববলে তেমনি হিমালয়ের ওদিককার প্রদেশ, আফগানিস্থান, বাক্ত্রিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে তাহার প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত হইল ।

উদয়াচল হইতে মধ্যাহ্নে উঠিয়া পরে ঐ ধর্ম কালক্রমে অন্তোন্মুখ হইল। একদিকে যেমন সজ্জ হইতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও উন্নতি, আবার সে ধর্মের পতনের কারণও সেই সজ্জ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মজ্জাগত একটি ঔদার্য আছে, তাহাতে বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকদিগকে স্বদলে টানিয়া লওয়া তাহার পক্ষে কঠিন নহে। মত ও বিশ্বাসের প্রভেদে তাঁহার এমন কিছু যায় আসে না। মতের অমিলে তিনি খৃষ্টীয় ইনকিজিসানের অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত নন। কিন্তু একটি বিষয় তাঁহার অসহনীয়, সে কি না বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ—জাতিভেদ প্রথার মূলোচ্ছেদ-চেষ্টা। কোন নূতন সম্প্রদায় যতক্ষণ হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের বিরোধী হইয়া না দাঁড়ায়, ততক্ষণ তাহাদের মতামত তিনি নিরপেক্ষ ভাবে দৃষ্টি করেন। এই হেতু বৌদ্ধ দর্শন-শাস্ত্রও নয়, বৌদ্ধ নীতি শাস্ত্রও নয়, বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্যের বৈরভাব উদ্ভেক হইবার কারণ অশূন্য। আমার মতে “সজ্জ”—তাহার খাঁটি ধর্মভাগটুকু নয়, সজ্জের সামাজিক বন্ধন—দুই প্রতিযোগী ধর্মের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার প্রধান কারণ। যখন বৌদ্ধ-সজ্জ কতকগুলি বিশেষ নিয়মে গঠিত হইয়া হিন্দু-সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া দাঁড়াইল, যখন সে ব্রাহ্মণ শূদ্র গৃহী সন্ন্যাসী সকলকেই অবাধে স্বদলভুক্ত করিতে লাগিল; বিশেষতঃ যখন রাজারা, ধনাঢ্য গৃহস্থেরাও তাহাকে বহুমূল্য দানাদি দ্বারা প্রশ্রয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—তখন তাহা হিন্দু-সমাজের চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণ্য স্বীয় আধিপত্য ও অর্থোপার্জনপথ যুগপৎ অবরুদ্ধ দেখিয়া তাহার বিরুদ্ধে

কটিবদ্ধ হইল । আমার মনে হয় বেদাচারবিরুদ্ধ সজ্জের স্বতন্ত্র গঠন প্রণালী হইতেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের সাজাতিক বিরোধের সূত্রপাত । (একদিকে ব্রাহ্মণ্যের গৃহাশ্রম, অন্যদিকে বৌদ্ধ-সজ্জের সন্ন্যাসধর্ম ; এক সমাজ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বর্ণাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত, অন্য সমাজ মনুষ্যের সামাবাদী কঠোর ধর্মনীতিমূলক ; এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তি কতদিন আর শান্তি সদ্ভাবে কার্য্য করিবে ? এই বিরোধ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া অবশেষে ব্রাহ্মণ্যের জয়, বৌদ্ধধর্মের পতন সজ্জাটিত হইল )

৷ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে হিন্দুধর্ম কোনকালে সমূলে নিমূল হয় নাই । অনেক বৎসর ধরিয়া এই দুই ধর্ম পরস্পর শান্তি সদ্ভাবে একত্রে বাস করে । ভয়েন সাং-এব ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে ইতিপূর্বে দেখান গিয়াছে যে, রাজা শিলাদিত্য ব্রাহ্মণ শ্রমণ উভয় পক্ষেরই আনুকূল্য করিতেন, উভয় দলকেই আমন্ত্রণ দানাদির দ্বারা পরিতুষ্ট রাখিবার প্রয়াসী ছিলেন । প্রয়াগে যখন তাঁহার মহাসভা হয়, তখন তাহাতে উভয়ধর্মাবলম্বী আচার্য্যদের মধ্যে ধর্ম্যালোচনা চলে, এবং বুদ্ধ সবিভা শিবমূর্তি এক এক দিন এক এক প্রতিমা প্রতিষ্ঠা হয় । নাগানন্দ নামক বৌদ্ধ নাটক ঐ সময়কার প্রণীত, তাহাতেও বিভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাবে অনেক পরিচয় পাওয়া যায় ; ঐ নাটকের নান্দীতে ‘মারদুহিতা অপরাগণের মায়া-মন্ত্রে অপরাঙ্কিত’ ধর্ম্মবীর বুদ্ধের অবতারণা আছে । ইলোরা ও অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধ ও হিন্দু গৃহামন্দির পাশাপাশি দেখা যায়, তাহাও এই দুই ধর্ম্মের সদ্ভাব-সূচক । খৃষ্টাব্দের একাদশ



শতাব্দেও পশ্চিমাঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাব উপলক্ষিত হয়। বেহার ও গোদাবরী প্রদেশে খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ নৃপতিগণের রাজত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভারতে বৌদ্ধধর্মের নিতান্ত হীনাবস্থা। 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটক, যাহা সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর রচনা, তাহাতে বৌদ্ধধর্মের উপর ব্রাহ্মণের আসন্ন বিজয় সূচিত হইয়াছে। চতুর্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত উহার চিহ্নসকল স্থানে স্থানে বর্তমান, তৎপরে বৌদ্ধধর্ম কিক্রমে কোথা হইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, আশ্চর্য্য !

### বৌদ্ধধর্মের ধ্বংস—কারণ-নির্ণয়।--

ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হইবার কারণ কি ? এই প্রশ্ন লোকের মনে সহজেই উৎপন্ন হয়, এবং ইহার উত্তরে নানা মুনি নানা মত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে, ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ও মুসলমানদের উৎপীড়নে বৌদ্ধেরা এদেশ হইতে বিতাড়িত হয় ; এ মত যে নিতান্ত অমূলক তাহাও বলা যায় না। হিন্দুবা এক সময় বৌদ্ধদের উপর ষণেষ্ট অত্যাচার করিয়াছিলেন, পূর্বে তাহার উদাহরণ স্বরূপ রাজা সুধম্মার নৃশংস আদেশ-পত্র প্রকটিত হইয়াছে। তেমনি আবার মুসলমানেরা মুণ্ডিতমস্তকগণকে যারপরনাই উৎপীড়ন করেন—তাহাদের তীর্থক্ষেত্রসকল লণ্ডভণ্ড বিনষ্ট করিয়া ফেলেন, তাহারও অনেক নিদর্শন পাস্তয়া যায়। কিন্তু এ কথা মানিয়া নিলেও, এইরূপ স্থানীয় সাময়িক অত্যাচার বৌদ্ধধর্মের সমূল উৎপাতনের প্রকৃত কারণ রূপে নির্দেশ করা



যায় না । যে দেশ ধর্মবিষয়ক এমন ঔদার্য্যগুণের জন্য প্রথিত, যে দেশে পরস্পরবিরোধী এত প্রকার মত ও সম্প্রদায় স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবাধে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে, সে দেশ হইতে নিরীহ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাদাইবার জন্য কেনই বা সকলে খড়গহস্ত হইবে ? (আর এক দলের মত এই যে, বৌদ্ধধর্ম এদেশ হইতে বলপূর্ব্বক বিতাড়িত হয় নাই—ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত আস্তে আস্তে মিশিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছে । বৌদ্ধধর্ম আপনার নিজস্ব মতসম্পত্তির বিনিময়ে ব্রাহ্মণ্যের কতকাংশ হরণ করিলেন—ব্রাহ্মণ্যও কতক কতক বিষয়ে প্রতিপক্ষের মত ও ভাব গ্রহণ করিলেন ; এইরূপে পরস্পরে ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষীণ-প্রাণ বৌদ্ধধর্ম প্রথর ব্রহ্মতেজে বিলীন হইয়া গেল ! আমার বিবেচনায় এরূপ হওয়া খুবই সম্ভব । শৈব শাক্ত তান্ত্রিক মত বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করিয়া তাহার যে কি রূপান্তর ও বিকৃতি উৎপাদন করিয়াছে আমরা তাহা কতক কতক দেখিয়াছি ; এইরূপে বৈষ্ণব ধর্মের সহিতও তাহার আদান প্রদান সংঘটিত হয় সন্দেহ নাই ) বৌদ্ধধর্মের ঐকান্তিক দুঃখবাদরূপ কঠোর ধর্মনীতির কাঠিন্য নিবারণচেষ্টা—অজ্ঞপ্রভাবের সহিত দেব-প্রসাদের সংমিশ্রণ—নিরীশ্বরবাদের স্থানে বুদ্ধ-দেবাদের পূজা-র্চনা—নির্ব্বাণের স্থানে স্বর্গনরক বল্লনা—এই সমস্ত পরিবর্তনে ব্রাহ্মণ্যের প্রভাব বিলক্ষণ প্রতিভাত হয় । কিন্তু বৌদ্ধধর্ম এই-রূপে তাঁর নিজস্ব বিন্দন করিবার দরুণ আজুহারা হইয়া পড়িলেন । আর একদিকে দেখিতে পাই বৌদ্ধধর্মের সার্ব-ভৌম প্রেম ও মৈত্রীভাব, অহিংসা দয়া দান্ধিয়া, মনুষ্যে মনুষ্যে

সাম্যভাব ভ্রাতৃসৌহার্দ, বর্ণবিচার বর্জনে আপামর সাধারণের জ্ঞান-ধর্ম সমান অধিকার, বৈষ্ণব ধর্ম এই সমস্ত উদার নীতি অবলম্বন পূর্বক বৌদ্ধদের নিজের অস্ত্রে তাহাদিগকে মর্স্মাহত করিলেন । অপিচ, বিষ্ণুর দশাবতার অবতারণ করিয়া বুদ্ধাবতারগণকে পদচ্যুত করিলেন—শুধু তা নয়, বুদ্ধদেবকেও আপনাদের দেবমণ্ডলী মধ্যে স্থান দান করত আত্মসাৎ করিয়া লইলেন । দেখুন হিন্দুরা লোকভুলানো মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগে কেমন পটু ! তাঁহারা ধ্যানস্থ বুদ্ধকে যোগাসনাক্রম মহাদেব গড়িয়া তুলিয়া-ছেন, কত কত বৌদ্ধতীর্থ ও বৌদ্ধক্ষেত্র আপনাদের তীর্থ ও ধর্ম-ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছেন, এবং বৌদ্ধদের ধর্মক্রিয়া যাত্রা মহোৎসবদিরও অনুকরণ করিয়া হিন্দুধর্মের মতিমা বৃদ্ধি করিয়া-ছেন । বুদ্ধগয়ায় একটি দেবালয়ে একখানি গোলাকৃতি প্রস্তরে দুইটি পদচিহ্ন আছে । ঐ দেবালয়ের নাম বুদ্ধপদ ছিল, পরে তাহা বিষ্ণুপদ বলিয়া প্রচারিত হয় । গয়াও পূর্বের বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল ; পরে একটি প্রধান হিন্দুতীর্থ হইয়া উঠিয়াছে । গয়ামাহাত্ম্যে সুস্পষ্ট লিখিত আছে, তীর্থযাত্রীরা বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করিবার পূর্বের বুদ্ধগয়া গমন পূর্বক বোধিবৃক্ষকে প্রণাম করিবেন—

ধর্ম্যং ধর্মেশ্বরং নম্রা মহাবোধি তরুং নমেৎ ।

† জগন্নাথ ক্ষেত্র ।—

জগন্নাথ ক্ষেত্রের ব্যাপারটিও বৌদ্ধধর্মের সহিত বিলক্ষণ সংশ্লিষ্ট । জগন্নাথ বুদ্ধাবতার এইরূপ একটি জনশ্রুতি সর্বত্র প্রচলিত আছে । দশাবতারের চিত্রপটে বুদ্ধাবতার স্থলে

জগন্নাথের প্রতিকূপ চিত্রিত হয়। জগন্নাথের ত্রিমূর্তি, রথযাত্রা, বিষ্ণুপঞ্জর প্রবাদ, বর্ণবিচার পরিহার ইত্যাদি অনেক বিষয়ে বৌদ্ধভাব প্রচ্ছন্ন দেখা যায়। শ্রীক্ষেত্রে বর্ণবিচার পরিত্যাগ হিন্দুধর্মের অনুগত নয়—সাক্ষাৎ বৌদ্ধ-আদর্শ হইতে গৃহীত বলিলে বলা যায়। ছয়েন সাং উৎকলের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রতটে চরিত্রপুর নামে একটি সুপ্রসিদ্ধ বন্দর দেখিয়া যান। ঐ চরিত্রপুরই এইক্ষণকার পুরী বোধ হয়। উহার নিকটে পাঁচটি অত্যন্ত স্তূপ ছিল। কনিংহাম সাহেব অনুমান করেন তাহারই একটি জগন্নাথের মন্দির। খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন বৌদ্ধেরা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তখন এই মন্দির প্রস্তুত হয়। স্তূপের মধ্যে বুদ্ধদেবের অশ্বি কেশ প্রভৃতি দেহাবশেষ সমাহিত থাকে, ইহার দেখাদেখি জগন্নাথের বিগ্রহ মধ্যে বিষ্ণুপঞ্জর অবস্থিত, এইরূপ এক প্রবাদ রটিয়া গিয়াছে। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারতে তীর্থযাত্রার সময় পথিমধ্যে তাতার দেশের অন্তর্গত খোটান নগরে একটি বৌদ্ধ মহোৎসব সন্দর্শন করেন, তাহাতে এক রথে তিনটি প্রতিমূর্তি দেখিয়া আসেন। মধ্যস্থলে বুদ্ধ মূর্তি ও তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্তি সংস্থাপিত ছিল। জগন্নাথের রথযাত্রা সম্ভবতঃ খোটানস্থ বৌদ্ধদিগের রথযাত্রার অনুরূপ, এবং জগন্নাথ বলরাম স্তূভদ্রা বৌদ্ধত্রিমূর্তির রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভূপালের প্রায় ৯ ক্রোশ পূর্বোক্তর বেতোয়া নদীতীরস্থ সাধিগ্রামে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অনেকগুলি স্তূপাদি আছে। সেই স্থানের দক্ষিণ দ্বারে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ী তিনটি ধর্মযন্ত্র একত্র খোদিত রহিয়াছে।

কনিংহাম সাহেব ঐ তিনটি বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, ধর্ম, সজ্ব এই ত্রিমূর্তির বিজ্ঞাপক হওয়াই অতিমাত্র সম্ভাবিত বলিয়া বিবেচনা করেন । তিনি সাঞ্চি, অযোধ্যা, উজ্জয়িনী প্রভৃতি নানা স্থান হইতে, এমন কি, শক রাজাদিগের মুদ্রা হইতেও ঐ ধর্ম-যন্ত্র অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । উল্লিখিত তিনটি ধর্মযন্ত্রের সহিত জগন্নাথাদির তিন মূর্তির বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় । কনিংহাম সাহেব ভিলসা স্থপ বিষয়ক বত্রিশ সংখ্যক চিত্রপটে ঐ উভয়কেই পাশাপাশি করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন ; দেখিলেই, শ্রীক্ষেত্রের বৈষ্ণব ত্রিমূর্তি উল্লিখিত তিনটি বৌদ্ধধর্মযন্ত্রের অনুকরণ বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হয়, বেশীর ভাগ কেবল চোখ নাক আর অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি গুষ্ঠ । বৌদ্ধেরা সচরাচর 'ধর্ম'কে স্ত্রীরূপে কল্পনা করেন, প্রস্তুরেও ধর্মের স্ত্রীমূর্তি খোদিত দৃষ্ট হয় । নেপালে এই ধর্ম 'পারমিতা প্রজ্ঞা' রূপিনী দেবী । খুব সম্ভব ইনিই জগন্নাথের স্ত্রী—এইরূপ নারীমধ্য ত্রিমূর্তি অশ্ব কোন হিন্দু দেবালয়ে কোনরূপ পরিচ্ছাত দেবাকৃতি নয় । তবেই হইতেছে জগন্নাথের জগন্নাথ, বলরাম, স্ত্রীমূর্তি, বৌদ্ধদের বুদ্ধ, সজ্ব ও ধর্ম ।

বৌদ্ধগান্ধে বুদ্ধপদের চক্রচিহ্ন সবিশেষ বর্ণিত আছে । বৌদ্ধেরা বহুপূর্ববাবধি তাহার একটি মূর্তি প্রস্তুত করিয়া তাহার উপাসনা করিতে প্রবৃত্ত থাকে । তাহাদের অনেকানেক মুদ্রাও ঐ চিহ্নে চিহ্নিত দেখা যায় । শ্রীক্ষেত্রে বিষ্ণুর সূদর্শন-চক্র খোদিত আছে । ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সেই বিষ্ণুচক্রকে

বৌদ্ধদিগের ঐ বুদ্ধচক্র বলিয়া অনুমান করেন । জগন্নাথ ভিন্ন অন্য কোন দেবতার নিকট সুদর্শনের প্রতিক্রম দৃষ্ট হয় না, মিত্র মহাশয়ের উল্লিখিত অভিপ্রায়ই সমধিক সম্ভাবিত বলিতে হয় ।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জগন্নাথক্ষেত্র পূর্বে একটি বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল, এই অনুমানটি একরূপ নিঃসংশয়ে নিষ্পন্ন হইতেছে ।\*

বৌদ্ধধর্ম এদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইল বটে, তবুও হিন্দু-সমাজে তার পূর্ব প্রভাবের যে কতকগুলি চিহ্ন রাখিয়া গেল, তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে । আমরা বৌদ্ধধর্মের নিকট অনেক বিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছি, অনেক সত্বপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, সে ঋণভার যেন বিস্মৃত না হই । পূর্বেই বলা হইয়াছে, বৌদ্ধেরা ভারতে গৃহনির্মাণ-বিদ্যার আদি গুরু—তাহাদের হস্তের কারুকার্যসকল সর্বত্র তাহাদের অক্ষয় কীর্তি প্রচার করিতেছে । বৌদ্ধেরা কর্মফলের অখণ্ডনীয় নিয়ম লোকের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেন । তাঁহারা ই যজ্ঞে পশুহত্যা নিবারণ

\* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়—দ্বিতীয় ভাগ ।

অক্ষয়কুমার দত্ত ।

The Antiquities of Orissa, Vol. II.

Dr. Rajendralal Mitra.

করিয়া, অহিংসা\* ধর্মের মহিমা ঘোষণা করেন। দেখুন, কবি জয়দেব কি বলিতেছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং

সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং

কেশব ধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে !

বৌদ্ধেরাই সংঘম, স্বার্থত্যাগ, জ্বলন্ত ধর্মামুরাগ, উদার ভ্রাতৃ-বন্ধনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যান ; তাঁহাদের ব্যবহারধর্মের প্রভাব হিন্দুসমাজ হইতে কখনই সম্পূর্ণ বিদূরিত হইবার নহে। বুদ্ধ-জীবনের সৌন্দর্য, মাধুর্য, নিঃস্বার্থতা ও উদার প্রেমগুণে সে ধর্ম ভারতে চির-রঞ্জিত থাকিবে।

বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি ও বৌদ্ধ মতাবলম্বী লোকসংখ্যা গণনা করিয়া কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর প্রায় ৫০ কোটি লোক বৌদ্ধ মতাবলম্বী। কেহ কেহ বলেন এ গণনায় অত্যুক্তি দোষ আছে। হিসাবে অনেক বাদসাদ

---

\* বৌদ্ধদের ন্যায় জৈন-সম্প্রদায়ের লোকেরাও ‘অহিংসা পরম ধর্ম’ পালন করিয়া থাকেন। ইহারা নিরামিষভোজী এবং অকারণ প্রাণীহত্যা নিবারণ উদ্দেশে সূর্যাস্ত পূর্বে ইহাদের ভোজনের নিয়ম। তাহা ছাড়া ইহাদের অন্যান্য অনেক রীতিনীতি আচার ব্যবহারে জীবের প্রতি দয়া মারা প্রকাশ পায়। কি জানি নিঃস্বাস সহকারে কোন কীটপতঙ্গ উদরস্থ হয়, এই আশঙ্কায় কেহ কেহ মুখে একরূপ বস্ত্র বন্ধন করিয়া রাখে। পুত্র হ্রাসপাতাল পিঞ্জরাপোল, এই হ্রাসপাতালে জরাজীর্ণ কৃষ্ণ পশু গ্রহণ ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন জৈনদের অহিংসা ধর্মের এক অপূর্ব সূক্ষ্ম দৃষ্টান্ত।



দিয়া ধরিয়া নিলেও এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ধর্মের তুলনায় এ ধর্মের ভক্ত-সংখ্যা নিতান্ত অবমাননার পাত্র নহে। এ ধর্মের প্রথম অবস্থায় কে মনে করিতে পারিত—বুদ্ধদেব স্বয়ং কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, ইহা কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সমুদায় এশিয়া খণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া অসংখ্য মানবকে আশ্রয় দান করিবে, অথচ ইহার নিজের জন্ম-ভূমি ইহাকে দেখিবে না, চিনিবে না। আপন মাতৃক্রোড় হইতে বিতাড়িত হইয়া পৃথিবীর অজ্ঞাতকুলশীল বিজন প্রান্তবস্তী অধিবাসীদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া বন্ধমূল হওয়া আশ্চর্যের ব্যাপার সন্দেহ নাই। আপনারা এই বিচিত্র ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিয়া স্থির করুন। এ ধর্ম জোরজবরদস্তীতে এ দেশ হইতে বিতাড়িত হইল, কিম্বা শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ধর্মে মিশিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল, অথবা ইহা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া কাল-বিবরে প্রবিকৃত হইল? হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান, হিন্দু আচার্যদিগের বুদ্ধি ও যুক্তিবল প্রয়োগ, মুসলমান অত্যাচার, বৌদ্ধধর্মের ভজন পূজনের অনাদর, বেদাচারে অনাস্থা, অনাত্মবাদ, শূন্যবাদ, মন্ত্রতন্ত্র ভূতপ্রেত পিশাচ সিদ্ধি ইত্যাদি তান্ত্রিক কাণ্ডের প্রবেশজনিত আদিম ধর্মের অশেষ দুর্গতি, হিন্দু-সমাজে সঙ্ঘ-নিয়ম প্রণালীর অনুপযোগিতা, উদ্বাহ বন্ধনের শৈথিল্য—এই ত বৌদ্ধধর্ম ধ্বংসের অনেকগুলি কারণ মনে হইতেছে। ইহাদের কোন্টা সযৌক্তিক, কোন্টা অমূলক, আপনারা তাহা নিরূপণ করুন, আমি এইখানে এই প্রবন্ধ শেষ করি।



# পরিশিষ্ট ।

## ১। ধনিয়া সূত্র ।

( মহীতীরবাসী গোপাল ধনিয়া ও বুদ্ধদেবের কথোপকথন । )

পালি ।

বঙ্গানুবাদ ।

১। ধনিয়ো গোপোঃ ।

১। গোপাল ধনিয়া ।

পক্কোদনো দুগ্ধখীরোহমস্মি

পক্ক অন্ন, গাভী-দুগ্ধ আছি

খেয়ে পিয়ে,

অনুতীরে মহিয়া সমানবাসো,

মহীতীরে ভাই বন্ধু মিলি

করি বাস ;

ছন্না কুটী, আহিতো গিনি,

কুটার ছায়িত, অগিনি আহিত,

অথ চে পথয়সি পবস্স দেব ।

যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।

২। ভগবাঃ ।

২। বুদ্ধদেব ।

অক্কোধনো বিগতখিলো-

অক্কোধ বন্ধনশূন্য আমি যে

হমস্মি (১)

এখন.

অনুতীরে মহিয়' একরত্তিবাসো,

মহীতীরে সবেমাত্র এক

রাত্রি বাস ;

বিবটা কুটী, নিব্বুতো গিনি,

গৃহ অনাবৃত, অগ্নি নির্বাপিত,

অথ চে পথয়সি পবস্স দেব ।

যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।

(১) বিগতখিলো

এই শব্দটি বেদ ও পালি সাহিত্য উভয়ে ব্যবহার আছে। সংস্কৃতে "কীল", গ্রাম্য ভাষায় "খিল"। ইহার অর্থ গরু বাঁধার খুঁটি—তাহা হইতে, বাঁধা, বন্ধন। ফজ্বোল সাহেব ধনিয়া সূত্রের অনুবাদে (S. B. E. Series, Vol. & Part II.) অর্থ করিয়াছেন, "Stubbornness", কিন্তু ইহা সঙ্গত বোধ হয় না।

পালি ।

৩ । ধনিয়ো গোপোঃ ।

অন্ধকমকসা ন বিজ্জরে,  
কচ্ছে রুঢ়তিণে চরন্তি গাবো,  
বুটিটম্ পি সহৈয়্যম্ আগতম্,  
অথ চে পণ্যয়সি পবস্স দেব ।

৪ । ভগবাঃ ।

বদ্ধা হি ভিসী স্তসম্মাতা  
ভিন্নো পারগতো বিনেয়া ওষম্,  
অথো ভিসিয়া ন বিজ্জতি,  
অথ চে পণ্যয়সি পবস্স দেব ।

৫ । ধনিয়ো গোপোঃ ।

গোপী মম অস্সবা  
অলোলা (২)  
দীঘরত্তম্ সমবাসিয়া মনাপা,  
তস্স ন স্ত্ণামি কিঞ্চি পাপম্,  
অথ চে পণ্যয়সি পবস্স দেব ।

বঙ্গানুবাদ ।

৩ । ধনিয়া ।

অন্ধক-মশক হতে মুক্ত  
ধেনুগুলি  
ভূগাচ্ছন্ন গোচারণে চরিয়া বেড়ায়,  
আসুক না বৃষ্টি, না করিবে দৃষ্টি,  
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন ।

৪ । বুদ্ধদেব ।

নৌকাখানি স্ত্ণগঠন, বাঁধা  
আটে ঘাটে,  
বড় বড় ঢেউ ঠেলি তাহে  
হৈনু পার :  
নৌকায় এখন, বিনা প্রয়োজন,  
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন ।

৫ । ধনিয়া ।

গোপী মম স্ত্ণচরিতা পতিব্রতা  
সতী,  
একত্রে করিনু ঘর দীর্ঘকাল ধরি;  
নাহি তার নামে, নিন্দা শুনি  
কাণে,  
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন ।

(২) অস্সবা অলোলা ।

অস্সবা = অশ্রবা, “বচনে স্থিতা” ।

ইহার আর এক অর্থ হয় “অশ্রবা” = non-corrupt = সতী ।

অলোলা = অচঞ্চলা ।

পালি ।

বঙ্গানুবাদ ।

৬। ভগবাঃ ।

৬। বুদ্ধদেব ।

চিন্তম্ মম অস্‌সবম্ বিমুত্তম্  
 দীঘরত্তম্ পরিভাবিতম্ সুদন্তম্,  
 পাপম্ পন মে ন বিজ্জতি,  
 অথ চে পথয়সি পবস্‌স দেব ।

চিন্ত মম সংযত স্বাধীন, বহুকাল  
 বহু তপস্যায় তায় আনিবু স্ববশে,  
 তাহে পাপলেশ, না করে প্রবেশ,  
 যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন ।

৭। ধনিয়ে গোপোঃ ।

৭। ধনিয়া ।

অন্তু-বেতন-ভতোহমস্মি  
 পুত্তা চ মে সমানিয়া আরোগা,  
 তেসম্ ন সুনামি কিঞ্চি পাপম্,  
 অথ চে পথয়সি পবস্‌স দেব ।

আপন অর্জিত ধনে চালাই  
 সংসার,  
 পুত্রগণনীরোগ সবল, নিন্দা কোন  
 তাহাদের নামে, শুনি নাই কাণে,  
 যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন ।

৮। ভগবাঃ ।

৮। বুদ্ধদেব ।

নাম্ ভতকোহস্মি (৩)  
 কস্‌সচি,  
 নিব্বিট্টঠেন চরামি সর্বলোকে,  
 অথো (৪) ভতিয়া (৫) ন  
 বিজ্জতি,  
 অথ চে পথয়সি পবস্‌স দেব ।

কারো নহি বৃত্তিভোগী,  
 আপনার প্রভু,  
 অবাধে আপন মনে ভ্রমি  
 সর্বলোকে ;  
 দাসত্বে কি কাজ, বল মোর আজ,  
 যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন ।

(৩) ভতক = ভূতক, বেতনভুক, বৃত্তিভোগী ।

(৪) অথো = প্রয়োজন ।

(৫) ভতিয়া = ভূত্যা, ভূতি অর্থাৎ বেতন দ্বারা ।

পালি ।

৯ । ধনিয়ে গোপোঃ ।  
অশ্বি বসা (৬) অশ্বি ধেনুপা, (৭)  
গোধরনিয়ে পবেনিয়ে (৮) পি  
অশ্বি,  
উসভো পি গবম্পতি চ অশ্বি ;  
অথ চে পথয়সি পবস্‌স দেব ।

১০ । ভগবাঃ ।

ন' অশ্বি বসা, ন' অশ্বি  
ধেনুপা  
গোধরনিয়ে পবেনিয়েপি ন'  
অশ্বি,  
উসভো পি গবম্পতীধ ন' অশ্বি,  
অথ চে পথয়সি পবস্‌স দেব ।

১১ । ধনিয়ে গোপোঃ ।

খীলা নিখাতা তাসম্পবেধী,  
দামা মুঞ্জময়া নবা স্‌সঠানা,  
ন হি সঙ্খিলিত্তি ধেনুপাপি  
ছেত্তুন্,  
অথ চে পথয়সি পবস্‌স দেব ।

বঙ্গানুবাদ ।

৯ । ধনিয়া ।

আছে গাভী দুগ্ধবতী, আছে  
বৎস কত,  
গরুদের গাত্রবস্ত্র—তাও আছে  
হেথা,  
বৃষভ গোপতি, আছয়ে তেমতি,  
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন ।

১০ । বুদ্ধদেব ।

নাহি গাভী দুগ্ধবতী, না আছে  
বাছুর,  
গরুদের গাত্রবস্ত্র—তাও নাহি  
মোর ;  
নাহিও তেমতি, বৃষভ গোপতি,  
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন ।

১১ । ধনিয়া ।

সুদড়-নিখাত খীলা কিছুতে  
না টলে,  
নব এই মুঞ্জদাম এমনি কঠিন,  
বাছুরে ছিঁড়িতে নারে  
কোনরীতে,  
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন ।

(৬) বসা = বৃষা, গাভী ।

(৭) ধেনুপা = বৎসগণ ।

(৮) গোধরনিয়ে পবেনিয়ে = গরুর ধারণ বা আচ্ছাদনের অস্ত্র প্রবেশি  
অর্থাৎ আগরণ বা কবল । ফজ্‌বোল সাহেব অর্থ করিয়াছেন—*I have*  
*cows in calves & heifer*, ইহার কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না ।

পালি।

১২। ভগবাঃ।

উসভোরিব ছেহা বন্ধনানি,  
নাগো পৃতিলতম্ ব দালয়িত্বা,  
নাহম্ পুন উপেস্সম্ গবু সেয়াম্,  
অথ চে পথয়সি পবস্স দেব।

১৩ \* \* \* \* \*

নিম্নঞ্চ খলঞ্চ পূরয়ন্তো,  
মহামেঘো পাবস্সি তাবদেব,  
সুত্বা দেবস্স বস্সতো,  
ইমম্ অথম্ ধনিয়ে অভাসথঃ—

১৪

লাভাবত নো অনপ্পকা,  
যে ময়ম্ ভগবন্তুম্ অদসাম,  
শরণম্ তম্ উপেম চখ্খুম্  
সথা না হো হি তুবম্ মহামুনি।

১৫

গোপী চ অহঞ্চ অস্সবা,  
ব্রহ্মচরিয়ম্ সুগতে চারমসে,

বঙ্গানুবাদ।

১২। বুদ্ধদেব।

বৃষভ বন্ধন কাটি পলায় যেমতি,  
যেমতি বিহরে নাগ বিদলি  
লতিকা,  
প্রমুক্ত উদাস, কাটি গর্ভবাস,  
যত চাও দেব তুমি বরিষ এখন।

১৩ \* \* \* \* \*

উচ্চ নীচ সর্ববস্থল করিয়া প্লাবন  
বরষিল মহা মেঘ উঠিয়া তখন ;  
দেখিয়া ধনিয়া, বিগলিত হিয়া,  
বুদ্ধদেবে এই ভাবে করে  
নিবেদন,—

১৪। ধনিয়া।

সামান্য এ লাভ নহে, ওহে  
ভগবন্,  
পাইলু যে ইথে মোরা তব  
দরশন ;  
রাখ হে সুগতে, শরণ-আগতে,  
ও পদে আশ্রয় আজি দেহ  
মহামুনি।

১৫

আমি ও গৃহিণী মম, ধরি  
ও-চরণ,  
ব্রহ্মচর্য্য আচরিব করিলাম পণ ;

পালি ।

বঙ্গানুবাদ ।

জাতি মরণস্‌স পারগা,  
দুঃখস্‌স অন্তকরা ভবামসে ।

জনম মরণ, কাটিয়ে বন্ধন,  
তরি যাব, হবে সব দুঃখ  
বিমোচন ।

১৬ । মারো পাপিমাঃ ।  
নন্দতি পুত্তেহি পুত্তিমা,  
গোমিকো গোহি তথেব নন্দতি,  
উপধী (৯) হি নরস্‌স নন্দনা,  
ন হি সো নন্দতি যো নিরুপধী ।

১৬ । পাপবুদ্ধি মার ।  
পুত্রবান্ পুত্রলাভে হয়  
• পুলকিত,  
গোপাল গোধন লাভে তেমনি  
হর্ষিত ;  
আসক্তি হইতে হয় নরের নন্দন,  
অনাসক্ত নিরানন্দে কাটায়  
জীবন ।

১৭ । ভগবাঃ ।

১৭ । বুদ্ধদেব ।

সোচতি পুত্তেহি পুত্তিমা,  
গোমিকো গোহি তথেব সোচতি,  
উপধী হি নরস্‌স সোচনা,  
ন হি সো সোচতি যো  
নিরুপধীতি ।  
ইতি ।

পুত্রবান পুত্রশোকে সদাই  
কাতর,  
গোপাল গোধন তরে বাথিত  
অন্তর ;  
আসক্তিই মানবের দুঃখের  
কারণ,  
অনাসক্ত জনে দুঃখ না হয়  
কখন ।  
ইতি ।

(৯) উপধি নিরুপধী :—

উপধি—বৌদ্ধ-দর্শনের ইহা একটি প্রয়োজনীয় শব্দ—ইহার অর্থ সংসার সম্পদ, ভেদক দ্রব্য, মারা, আসক্তি ।

উপধি = আসক্তি ।

নিরুপধী = অনাসক্ত ।

## ২। তেবিজ্জ সূত্র।\*

( ব্রাহ্মণ যুবকের প্রতি বুদ্ধদেবের উপদেশ। )

একদা বুদ্ধদেব বহুশিষ্য সমভিব্যাহারে কোশলরাজ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে 'মনসাকৃত' গ্রামে উপনীত হইলেন; গ্রামে পুষ্করসাতী, তারুখ্য প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী খ্যাতনামা ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর বসতি। তথায় তিনি অচিরাবতী নদীতীরস্থ এক আশ্রমবনে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন।

সেই সময়ে দুইজন ব্রাহ্মণযুবক তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা উভয়ে সত্যাস্থেষী; ধর্ম্যালোচনায় অনেক তর্ক বিতর্কের পর তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছে। তাঁহাদের একজনের নাম বশিষ্ঠ ও অপরের নাম ভরদ্বাজ। বশিষ্ঠ যিনি, তিনি বুদ্ধদেবের চরণে প্রণত হইয়া নিবেদন করিলেন :—

মহাত্মন, সত্যপথ কি, এ বিষয় লইয়া আমাদের মহা তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, আমরা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। আমি বলি—যে পথ দিয়া ব্রহ্মের সহিত মিলন হয়, পুষ্করসাতী ব্রাহ্মণ ষাহার উপদেশ দিয়াছেন, সেই সত্যপথ; ইনি বলেন, ব্রহ্মবাদী তারুখ্য ব্রহ্মলাভের যে পথ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাই ঠিক। হে শর্ম্মণ, লোকে আপনাকে জগদ্গুরু বুদ্ধ বলিয়া জানে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, এই উভয় পথের মধ্যে কোন পথ ঠিক? এই ভিন্ন ভিন্ন পথ কি সকলি সত্য? এই মনসা-

\* ত্রয়ীবিজ্জা সূত্র, Buddhist Suttas. Sacred Books of the East—Rhys Davids.



কৃত গ্রামে নানাধিক হইতে নানান্ রাস্তা আসিয়া মিলিয়াছে, সেইরূপ ঐ সমস্ত ধর্মপথ কি সকলি আমাদিগকে গম্যস্থানে আনিয়া পৌঁছাইয়া দেয় ? সকলি কি সরল সত্য পথ বলিয়া অনুসরণ করা যাইতে পারে ?

বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের বিবেচনায় এ সমস্ত পথই কি সোজা পথ ? ঠিক পথ ?

তুজনেই উত্তর করিলেন—হাঁ, আমরা তাহাই মনে করি ।

বুদ্ধদেব কহিলেন—আচ্ছা, বল দেখি, সেই বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের মধ্যে কি এমন কেহ আছে, যিনি ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছেন ?

উত্তর—না ।

প্রশ্ন—তাহাদের গুরুর মধ্যে কি কেহ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন ?

উত্তর—না ।

প্রশ্ন—অনেকানেক বেদরচয়িতা ঋষির নাম শ্রবণ করা যায়—যথা অম্বিক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গীরস ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, ভৃগু—তাহারা কি বলিয়াছেন—আমরা ব্রহ্মকে জানি, আমরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি ?

ব্রাহ্মণেরা পুনর্বার ইহার উত্তরে 'না' বলায়, বুদ্ধদেব দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু'একটি কথা পাড়িলেন—

মনে কর, এই চৌরাস্তার মাঝখানে কোন এক ব্যক্তি একটা সিঁড়ি নির্মাণ করিতেছেন—কিসের জন্ত, না সেই সিঁড়ি দিয়া

কোন এক বাড়ীতে উঠিতে হইবে। লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কৈ, বাড়ী কোথায়? যাহাতে চড়িবার জন্য এই সিঁড়ি নিশ্চিত হইতেছে, সেই বাড়ী কোথায়? পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণে কি উত্তরে? ইহা ছোট, বড়, মাঝারি, কি আকারের বাড়ী? ইহা প্রাসাদ কি কুটীর? ইহার উত্তরে যদি নিশ্চিন্তা বলেন, আমি তা জানি না, তখন লোকে কি তাহাকে উপহাস করিয়া বলিবে না, যে বাড়ীতে উঠিতে চাহ সে বাড়ী কোথায় তাহা জান না, সে বাড়ী কখন দেখ নাই, অথচ তাহার সিঁড়ি নিশ্চিন্তা করিতে এত বাস্তব—এ কি কথা? ইহা কি বাতুলের প্রলাপ-বাক্য বলিয়া ধার্য হইবে না?

ব্রাহ্মণেরা উত্তর করিলেন—তাহার সে কথা পাগলামী ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। বুদ্ধদেব কহিলেন, যে ব্রাহ্মণ বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, যাহাকে তাহারা জানেন না, যিনি তাহাদের প্রত্যক্ষগোচর নহেন, ব্রাহ্মণেরা সেই ব্রাহ্মণের সহিত মিলন করাইয়া দিতে চান—সেই মিলনের পথ দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত। তাহাদের কথা কি বাতুলের প্রলাপবাক্য তুল্য অগ্রাহ্য নহে? তাহাদের ব্রাহ্মণপদের কি কোন অর্থ আছে?

অন্ধ কর্তৃক অন্ধ নীয়মান হইলে যাহা হয়, এও তাহাই। যে অগ্রগামী সেও কিছু দেখিতে পায় না, যে পশ্চাতে চলিয়াছে, সেও দেখিতে পায় না—ইহারাও সেই অন্ধের দল। বক্তাও অন্ধ, শ্রোতাও অন্ধ। এই সকল বেদবিৎ ব্রাহ্মণের উপদেশ সারহীন, অর্থহীন, তাৎপর্যশূন্য—কথাই সর্বদম্ব, তাহার কোন অর্থ নাই।

শোন বশিষ্ঠ, আর এক ব্যক্তি বলিতেছেন—এই নগরীর মধ্যে একটী পরমা সুন্দরী রমণীর জন্য আমার চিত্ত বড়ই চঞ্চল হইয়াছে । তাহার প্রতি আমার যে কি প্রগাঢ় প্রেম, কি অগাধ ভালবাসা, তাহা কি বলিব ? লোকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, এই পরমাসুন্দরী রমণী, যাহার জন্য তোমার মন এমন চঞ্চল, এতই উতলা হইয়াছে,—এই রূপসী কিরূপ ? ইনি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—কোন জাতীয় ? ইনি কালো কি গৌরবর্ণ, ইহার নাম কি, নিবাস কোথায় ?

ইহার উত্তরে যদি তিনি অন্ধকার দেখেন আর বলেন—আমি তা কিছুই জানি না, তখন লোকে কি তাঁহাকে উন্মাদ ভাবিয়া উপহাস করিবে না ? তাঁহার কথা কি কিছুমাত্র বিশ্বাসযোগ্য মনে করিবে ? কখনই না । পুনশ্চ মনে কর,—এই অচিরাবতী নদী বন্যার জলে ভরিয়া গিয়াছে—তুই পাড়ের উপর পর্য্যন্ত জল উঠিয়াছে—এমন সময়ে একজন কোন কার্য্যবশতঃ পরপার যাইবার ইচ্ছা করে । সে যদি নদীকে ডাকিয়া বলে, “হে নদী, তোমার ও পারটা উঠাইয়া আমার কাছে নিয়ে এস”—তাহা হইলে কি তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে ?

ব্রাহ্মণেরা বলিল, “হে গৌতম, তাহা কখনই হইতে পারে না ।”

বুদ্ধদেব কহিলেন,—তোমাদের উপদেষ্টা ব্রাহ্মণদেরও এই দশা । যে সকল সুদৃগুণ যথার্থ ব্রাহ্মণ-লক্ষণ, তাহা তাহাদের অঙ্গে নাই, যে সমস্ত অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব, তাহা হইতে তাহারা বিরত, অথচ তাহারা হে ইন্দ্র, হে সোম, হে

সকল—ইন্দ্র সোম বরুণকে ডাকিয়া চীৎকার করে ! এইরূপ প্রার্থনা, এই কাকুতি মিনতি, স্তবস্তুতির কি ফল ? তাহাতে কি তাহাদের ইহলোকে ব্রহ্মলাভ হইবে, না মৃত্যুর পরে পরলোকে ব্রহ্মের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে ? এরূপ কি সম্ভব ?

হে বশিষ্ঠ, আরো ভাবিয়া দেখ, এই নদী জলপ্লাবনে প্লাবিত হইয়াছে, পাড়ের উপর পর্য্যন্ত জল ছাপাইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় কোন এক ব্যক্তি নদী পার হইতে চাহে, কিন্তু তার হাত পা কঠোর শৃঙ্খলে বাঁধা, সে যদি এইরূপে শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়া এ পাড়ে দাঁড়াইয়া ভাবে আমি নদী পার হইব, তাহা হইলে কি মনে কর তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ?

উত্তর—হে গৌতম, তাহা কখন হইতে পারে না ।

বুদ্ধদেব কহিলেন—

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে পাঁচটি শৃঙ্খলের কথা আছে, পঞ্চপাশ, পঞ্চবন্ধন, পঞ্চ আবরণ ;—সে পাঁচটি কি কি ?

কাম ।

দ্বेष, হিংসা ।

অহঙ্কার, আত্মাভিমান ।

আলস্য ।

বিচিকিৎসা—ধর্মের প্রতি সংশয় ।

এই পঞ্চ মোহপাশ—পঞ্চ বন্ধন । এই বন্ধনে বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা আবদ্ধ, এই পঞ্চপাশে জড়িত হইয়া তাঁহারা চলৎশক্তি রহিত । হে বশিষ্ঠ, আমি সত্য বলিতেছি, এই ব্রাহ্মণেরা যতই

বেদাভ্যাস করুন না কেন, কিন্তু যে সকল গুণে, যে সমস্ত অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব, সে সকল গুণ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত,—সে সমস্ত অনুষ্ঠানে বিমুখ, তাঁহারা সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ । মোহপাশে জড়িত তাঁহাদের আত্মা দেহত্যাগানন্তর ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবে, ইহা কদাপি সম্ভব নহে ।

হে বশিষ্ঠ, তোমরা ত অনেকানেক বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপদেশ শ্রবণ করিয়াছ, ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বিষয়ে তাঁহারা কি উপদেশ দেন ?

ব্রহ্মের কি ধন-সম্পত্তি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আছে ?

উত্তর—না ।

ব্রহ্ম কি কাম ক্রোধে বিচলিত ?

উত্তর—না ।

তিনি কি দ্বেষ হিংসা পরবশ ?

তিনি কি মদমাৎসর্য আলস্যের অধীন ?

উত্তর—না ।

তিনি সংযমী না ব্যসনী ?

উত্তর—সংযমী ।

তিনি পবিত্রস্বরূপ কি অপবিত্র ?

উত্তর—পবিত্রস্বরূপ ।

কিন্তু হে বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-চরিত্র কি ইহার বিপরীত নহে ?

তাঁহারা কি স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ঐশ্বর্য সম্পন্ন নহেন ?

উত্তর—হাঁ ।

তাঁহারা কি কামাসক্ত ক্রোধপরায়ণ নহেন ?

উত্তর—হাঁ।

তাঁহারা কি ঘেঁষা হিংসা বর্জিত ?

উত্তর—না।

তাঁহারা সংযমী অথবা বিলাসী ?

উত্তর—বিলাসী।

তাঁহাদের অন্তরাত্মা পবিত্র না পাপ-কলুষিত ?

উত্তর—কলুষিত।

বুদ্ধদেব—ব্রাহ্মণেরা যখন সংসারাসক্তি হইতে বিমুক্ত হয় নাই, বিষয়বাসনা বিসর্জন করিতে সক্ষম হয় নাই, তাহারা যখন ইন্দ্রিয়সেবায় অহোরাত্র নিমগ্ন, কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি মোহবন্ধনে আবদ্ধ—আর ব্রহ্ম, যিনি ইহার বিপরীতধর্মী, তাঁহার সহিত মরণাস্তুর তাহারা মিলিত হইবে—ইহা কি কখন সম্ভব মনে কর ? তাহাদের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য কোথায় ? আমি সত্য বলিতেছি এই সকল ব্রাহ্মণের উপদেশ বার্থ, তাহাদের ত্রয়ীবিদ্যা পঞ্চশূণ্য অরণ্য, নির্জলা নিষ্ফলা মরুভূমি সমান। তাহাদের লক্ষ্য এক, কার্য অগুরূপ। তাহারা তাহাদের গম্য স্থানে পৌঁছবার প্রকৃত সরল পথ ছাড়িয়া বিপথে পদার্পণ করে, ও পথহারা পথিকের ন্যায় দিগ্ভ্রষ্ট হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

বুদ্ধদেব এইরূপ উপদেশ করিলে পর বশিষ্ঠ কহিলেন—

হে শর্ম্মণ, আমরা শুনিয়াছি—শাকামুনি সেই ব্রহ্ম-মিলনের পথ সম্যক্রূপে অবগত। আপনার নিকট হইতে আমরা সেই উপদেশ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি—আমাদের উপর অনুগ্রহ করিয়া মুক্তিমার্গ প্রদর্শন করুন, ব্রহ্মকুল উদ্ধার করুন।

## বৌদ্ধধর্ম ।

বুদ্ধদেব कहিলেন—

যে ব্যক্তি এই মনসাকৃত গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যিনি এখানে আজীবন বাস করিতেছেন, তিনি কি এই গ্রামের ভাষা পথঘাট বলিয়া দিতে পারেন না ?

উত্তর—অবশ্যই পারেন ।

এই পৃথিবীতে সেইরূপ তথাগত বুদ্ধ সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন—তিনি বিজ্ঞানময়—মঙ্গল নিকেতন । তিনি পৃথিবীর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছেন—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, ব্রহ্ম শর্মান্ ব্রাহ্মণ—সুর, নর, মার, ভূত, প্রেত—সর্ব চরাচর তিনি জানিতেছেন—সত্য তিনি নিজে জানিতেছেন এবং অন্যকে উপদেশ দিয়া থাকেন । তিনি জগদ্গুরু—সেই সত্য ধর্ম তিনি জগতে প্রচার করেন—যে ধর্মের আদি মধুর, অন্ত মধুর—মধুর যাহার গতি—যাহার উন্নতি মধুময় ।

যখন কোন গৃহস্থ উচ্চবংশীয়ই হউন আর নীচকুলজাতই হউন—তথাগত-কথিত সত্য যখন তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়—সে সত্য শ্রবণ করিয়া তিনি তথাগতের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক মনে মনে চিন্তা করেন—

সংসার কেবলই দুঃখময়—সংসারী ব্যক্তি মোহ-পাশে আবৃত, বাসনাগন্ধে নিমগ্ন—যিনি সংসারাসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছেন, বায়ুর ন্যায় তাঁহার মুক্ত জীবন । সংসারের মধ্যে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারে পরিবৃত হইয়া, তিনি মহন্তর পবিত্রতর জীবনের স্বাদ-গ্রহে অক্ষম । অতএব অস্ত্র হইতে আমার প্রতিজ্ঞা এই যে



শিরোমুগুন ও গৈরিক বসন পরিধান করিয়া, গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসব্রতে জীবন উৎসর্গ করিব ।

এইরূপে ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া, তিনি প্রাতিমোক্ষের নিয়মানুসারে আত্মসংযম অভ্যাস করেন । ইনি সত্যোতে রমণ করেন—ধর্ম ইহার জীবনের ব্রত । ইনি পাপের কুটিল পথ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে ধর্ম-নিয়মে নিয়মিত করেন—প্রত্যেক কথায় প্রতি কার্যে ইনি ধর্মের আদেশ পালন করেন—ধর্মপথ হইতে কদাপি বিচলিত হইবেন না । সাধু ইহার সঙ্কল্প—সাধু ইহার চরিত্র—ইন্দ্রিয়দ্বারের আটেঘাটে শত শত প্রহরী নিযুক্ত—আত্মনির্ভর ইহার নির্ভর-যষ্টি—আত্মপ্রসাদে ইনি সদাই সুপ্রসন্ন—ইহার বিশুদ্ধ চিন্তাক্ষেত্রে আনন্দের উৎস নিয়ত উৎসারিত হইতে থাকে ।

সুগভীর ভেরীনিবাদ আকাশে উগ্ধিত হইয়া যেমন সহজে দিগ্ধিক্ প্রতিধ্বনিত করে, ইহার প্রেম ও সেইরূপ বিশ্বব্যাপী ; ক্ষুদ্র, বৃহৎ, উচ্চ, নীচ কাহাকেও ইনি অবহেলা করেন না—কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না । ইহার প্রীতি, মৈত্রী, মমতা সর্বভূতে সমভাবে বিস্তৃত । সর্ব জীবে ইহার দয় বাৎসল্য । ইহার চক্ষে উচ্চ নীচে প্রভেদ নাই, আত্মপর সমান । ব্রহ্মলাভের এই একমাত্র পথ ! যিনি সত্য অবলম্বন করিয়াছেন, কাম, ক্রোধ, লোভ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, যিনি বিষয়-বাসনা বিসর্জন দিয়াছেন—দেষহিংসা ইহার স্রদয়ে স্থান পায় না—পবিত্র ইহার চরিত্র—কায়মনোবাক্যে যিনি ধর্মের অষ্টবিধ মহামার্গ অবলম্বন করিয়া চলেন—সেই যে ভিক্ষু

সাধু পুরুষ, ব্রহ্মের সহিত তাঁহার জীবনের সাদৃশ্য আছে কি না ?

উত্তর—অবশ্যই আছে ।

এই ভিক্ষু সাধু পুরুষ দেহত্যাগানন্তর ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইবেন, ইহা স্বর্কবতোভাবে সম্ভব ।

বুদ্ধদেবের উপদেশ সমাপ্ত হইলে বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া নিবেদন করিলেন—

হে প্রভো ! আপনার এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমরা ধন্য হইলাম, যাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাহা আপনি গড়িয়া তুলিলেন—যাহা প্রচ্ছন্ন তাহা প্রকাশ করিলেন—যে বিপথগামী তাহাকে সৎপথ প্রদর্শন করিলেন—অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালিয়া অন্ধকে চক্ষু দান করিলেন । প্রভো ! আমরা বুদ্ধের শরণাপন্ন হইতেছি—ধর্মের শরণাপন্ন হইতেছি—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধর্মং শরণং গচ্ছামি সজ্জং শরণং গচ্ছামি—বৌদ্ধভ্রাতৃবর্গের শরণাপন্ন হইতেছি । অতঃ হইতে আমাদিগকে আপনার চিরভক্ত শিষ্যরূপে দীক্ষিত করিয়া কৃতার্থ করুন, এই আমাদের প্রার্থনা ।

ব্যাখ্যা—

বৌদ্ধধর্মের অনুশীলন করিতে করিতে সহজেই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়—ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মত ও বিশ্বাস, কি ছিল ? তৎকালে প্রচলিত ধর্মের সহিত তাঁহার সম্বন্ধই বা কে রূপ ছিল ? উল্লিখিত সূত্র হইতে এই প্রশ্নের উত্তর কিয়দংশে প্রাপ্ত হওয়া যায় । ব্রাহ্মণ যুবকেরা মৃত্যুর পরে ব্রহ্মের সহিত

মিলনের উপায় অন্বেষণ করিতেছেন, অর্থাৎ বৈদান্তিক মতে জীবাঞ্জার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গিয়া, সে ব্রহ্মেতে কিসে লয় প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার সরল পথ তাঁহারা জানিতে চাহেন—গৌতমের প্রতি তাঁহাদের প্রশ্নও তদনুযায়ী। বুদ্ধদেব যে উপায় বলিয়া দিলেন, যে পথ প্রদর্শন করিলেন, তাহা ধর্ম্মনীতিসূচিত সহজমার্গ। আত্মসংযম—বিষয়বাসনা বিসর্জন—সন্ন্যাসগ্রহণ—চরিত্রশোধ—সার্বভৌম মৈত্রী মমতা—এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মলাভের কোন ঐন্দ্রজালিক উপায় নির্দিষ্ট হয় নাই।

এই সূত্রে ব্রহ্মের সহিত মিলনের কথা, যাহা প্রশ্নোত্তরে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার অর্থ কি? বৌদ্ধধর্ম্মমতে তাহার অর্থ ঠিক করা সহজ নহে। ইহা মনে রাখা কর্তব্য যে, বুদ্ধের সময় পৌরাণিক ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন নাই। বেদান্ত ও উপনিষদের ব্রহ্ম আর বৌদ্ধ ব্রহ্মা যে একই, এমনও মনে করিবেন না। নাম এক হইতে পারে, কিন্তু ভিন্নার্থে প্রয়োগ সন্দেহ নাই। আর্ধ্যধর্ম্ম প্রকৃতি-পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ মঞ্চে এক ব্রহ্মের উপাসনায় বিশ্রাম লাভ করিয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে এই বৈদান্তিক ব্রহ্মোপাসনার ভাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ব্রহ্মবিচার কথা দূরে থাকুক, বৌদ্ধধর্ম্ম দেহাভ্যন্তরে আঞ্জার পৃথক সত্তাই স্বীকার করেন না, অথচ দেখিতে গেলে হিন্দুধর্ম্মের দেবদেবীর নাম, দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস তাহার মধ্যে কতক অংশে স্থান পাইয়াছে—এই দুই ভিন্ন জিনিস, বিভিন্ন ভাবে সামঞ্জস্য করা এক বিষম সমস্যা।

বৈদিক দেবতাগণ বৌদ্ধধর্ম্মে সাধুপুরুষের স্থান অধিকার

করিয়া বসিয়াছেন, তাহার উর্দ্ধে পদনিক্ষেপ করেন না।—বড় জোর তাঁহারা বৌদ্ধ-ভিক্ষুর সমকক্ষরূপে পরিগণিত হইতে পারেন। এই সকল দেবতার আরাধনা পূজাচ্চনা বৌদ্ধধর্মে আদিষ্ট হয় নাই। দেবতারা অমর নহেন, অন্যান্য জীবের ন্যায় তাঁহারাও মরণধর্মশীল। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা নিজ নিজ কর্মগুণে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিয়া ক্রমে নির্বাণরাজ্যে—হয়ত বৌদ্ধ অর্হৎমণ্ডলীর মূখ্য স্থান পাইতে পারেন। ব্রহ্মাও সেইরূপে কল্পিত। অপর জীবের ন্যায় তিনিও মৃত্যুর অধীন—তিনিও বুদ্ধনির্দিষ্ট সম্মার্গ অবলম্বন করিয়া, কালক্রমে নির্বাণমুক্তি লাভের অধিকারী।

সে যাহা হউক, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বৌদ্ধমতে ব্রহ্মা ইতরজীব অপেক্ষা বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া পরিগণিত, সুরবৃন্দের মধ্যে যেমন সুরপতি দেবেন্দ্র। কথিত আছে যে, তাঁহার পূর্বজন্মে যখন কাশ্যপবুদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা সাহক নামক পরম ভক্ত ভিক্ষু বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। জাতক টীকাকার বলেন যে, ব্রহ্মা বুদ্ধদেবের ভবিষ্যৎ জন্মধারণ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহবান ছিলেন, এবং তৎপরে বোধিসত্ত্বের জীবনে 'মার' রাক্ষস যখন তাহাকে অশেষ প্রলোভন ও বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া ঘোরতর বিপদে ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল, সেই 'মার' দমনে ব্রহ্মা দুইবার সহায়তা করেন। 'মার' বিজয়ের পর যখন বুদ্ধদেব তাঁহার উপাধিচ্ছিত সত্য প্রচারে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মাদেব তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া, সে সংশয় ভঞ্জন করত, তাঁহাকে সত্য

ধর্ম প্রচারে উৎসাহিত করেন । আবার কথিত আছে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুকালে যে গগনভেদী গভীর শোকধ্বনি সমুৎপিত হয়, ব্রহ্মা সহস্রাবতার কণ্ঠ হইতে প্রথমে সে বাণী উদগীরিত হইয়াছিল, ও পরবর্তী কালে একবার বৌদ্ধধর্ম-সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বৌদ্ধনেতৃবর্গের মধ্যে সন্তাব ও শান্তি স্থাপনপূর্বক সে বিপ্লব প্রশমন করেন ।

এই সংস্কৃত উদাহরণ হইতে বৌদ্ধজগতের সহিত ব্রহ্মার কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা সহজেই উপলব্ধি হয় । শুধু এই মর্ত্যালোক নয়, কিন্তু অনন্ত আকাশের স্থানে স্থানে যে লোক-পুঞ্জ অবস্থাপিত, এক একজন ব্রহ্মা তাহার অধিপতিরূপে কল্পিত দেখা যায় ।

এই ব্রহ্মার সহিত মিলন আর বৈদান্তিক ব্রহ্মোতে জীবাত্মার বিলীন হইবার ভাব যে একই, তাহা কে বলিবে ? বৌদ্ধমতে সে মিলনের অর্থ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সহিত একত্র সহবাস ভিন্ন আর কিছুই কল্পনা করা যায় না । কিন্তু এই সহবাস-লাভ বৌদ্ধধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শ নহে ; বৌদ্ধমতে মনুষ্যজীবনের পরম গতি—চরম লক্ষ্য স্বতন্ত্র . বৌদ্ধধর্মের সার উপদেশ এই যে, প্রত্যেক মনুষ্য নিজ কর্মগুণে, নিজ পুণ্যবলে, আত্মপ্রভাবে, স্বার্থবিসর্জনে, সত্যোপার্জনে, প্রেম, দয়া, মমতা বর্ধনে, ইহজীবনে অথবা পরলোকে নির্ব্বাণরূপ পরমপুরুষার্থ সাধনে সমর্থ ।

এই নির্ব্বাণমুক্তি কি—আলো কি অন্ধকার—জাগরণ কি মহানিদ্রা—অনন্ত-জীবন কিম্বা চিরমৃত্যু—শান্ত-অনন্দ অথবা চেতনাশূন্য মহানির্ব্বাণে জীবাত্মার অস্তিত্বলোপ ;—এই নির্ব্বাণ-

